বিজ্ঞানে মুসলমানের দান

দ্বিতীয় খণ্ড

অঙ্কশাস্ত্র

(একাদশ শতাব্দী—অষ্টাদশ শতাব্দী)

এম. আকবর আলি এম্, এস্-সি

"I am sure that no Subject loses more than Mathematics by any attempt to dissociate it from its History"—J. W. L. Glashier.

দি মালিক লাইব্রেরী
১১ সি দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দি মালিক লাইব্রেরী
২১ সি দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৯৪৬

মূল্য পাঁচ টাকা

নালন্দা প্রেস, ১৫৯-১৬০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কল্যানীয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

এম্, এস্-সিকে দিলুম

পুরাতনের স্মৃতি নিয়ে নূতন গড়ে উঠুক—সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থ
লেখা, সে তুমি ভালভাবেই জান। কিন্তু শুধু স্মৃতি নিয়েই ত
কোন জাতি চলতে পারে না, নূতন উদ্দীপনা নূতন
আলো তার অবশ্যই চাই। তুমি তোমার প্রারব্ধ
সাধনায় সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি কর, সেই আলো
বয়ে নিয়ে এস; তোমার কাছে এই
আশাই আমরা করছি। বাধা, বিঘ্ন,
অসাফল্যের উপহাস কিছুই যেন
তোমাকে দমিয়ে না দেয়;
ধীর স্থির চিত্তে অগ্রসর
হও, খোদার দয়ায়
জয়যুক্ত হবেই—

তোমার সাধনা সফল হোক, সুন্দর হোক—সে সাধনার সিদ্ধি
জাতির ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক, আল্লার কাছে সেই প্রার্থনাই করি।

গোপালপুর
১০ই মে, ১৯৪৬

মেজ ভাই

ভূমিকা

"উৎলুব-অল্-'ইলমা, ওঅ লও কানা বি-স্-স্বীন্"

জ্ঞান অন্বেষণ করো, এমন কি যদি চীনেও থাকে—হাদীস।

জনাব মৌলবী মুহম্মদ আকবর আলী সাহেব এম্-এস্-সি অতি উচ্চকোটির সাংস্কৃতিক সাহিত্য রচনার কার্য্যে আত্ম-নিয়োজিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠক সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইঁহার "বিজ্ঞানে মুসলমানের দান", যাহার প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং গুণজ্ঞ সমালোচকগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছে, ও প্রস্তুত গ্রন্থ যাহার দ্বিতীয় খণ্ড, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনিস। গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও নাটক ছাড়া অন্য প্রকারের রচনার প্রতি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের মনে আকর্ষণ নাই। ইহার একটি কারণ অবশ্য এই যে, যে-সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় মানসিক ব্যায়াম অপেক্ষিত, শিক্ষার ব্যাপক ও গভীর প্রচারের অভাবে সে প্রকার মানসিক ব্যায়ামে, সে প্রকার জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসায় বাঙ্গালী পাঠক অভ্যস্ত নহে। কিন্তু আর একটি কারণ হইতেছে যে, জিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠকের মনের খোরাক জোগাইবার চেষ্টা কোনও দিক্ হইতে তেমন হয় নাই—মানসিক উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্য প্রকারের তথ্য ও

তত্ত্বময় বই লিখিবার গরজ এবং বই লিখাইবার তাগিদ—এই দুইয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। গভীর বিষয়ে বাঙ্গালায় বই পড়িবার লোক নাই—সেইজন্য এইরূপ বই লিখিবার লোকেরও অভাব। এতদিন ধরিয়া এই অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কিছুকাল হইতে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য আহারণের চেষ্টা বাঙ্গালী জনসমাজে দেখা দিয়াছে। এই জন্য নিছক সুকুমার সাহিত্য ভিন্ন বিজ্ঞানাত্মক সাহিত্যের তথ্যমূলক রচনার প্রসার কিছু কিছু বাড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন ও অন্য পরীক্ষায় মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করাকে ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা এই প্রকার সংস্কৃতিবর্ধক কার্য্যে হাত দিয়াছেন, মুসলমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের কথা বিচার করিলে মৌলবী আকবর আলী সাহেব তাঁহাদের মধ্যে স্বীয় বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছেন, একথা স্বীকার করিতে হয়। মৌলবী সাহেব নিজে বৈজ্ঞানিক, গণিতের বিশেষজ্ঞ: এই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানদৃষ্টি লইয়া তিনি বিশেষ করিয়া গণিত-বিদ্যায় যে সমস্ত মুসলমান মনীষী মধ্যযুগে মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃতিত্বের আলোচনা করিয়াছেন। "বিজ্ঞানে মুসলমানের দান" পুস্তকের প্রথম খণ্ডে তিনি খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান গণিতজ্ঞ, যাঁহারা মুখ্যত আরবী ভাষার মাধ্যমে নিজেদের উপলব্ধ বিদ্যার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের আবিষ্কার

প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে একাদশ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত যে সমস্ত জ্ঞানতপস্বী গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় ও গ্রন্থগুলির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমি নিজে গণিত বিষয়ে বিশেষ ভাবে অজ্ঞ—গ্রন্থকার আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্মত জ্যামিতি ও বীজগণিত এবং অন্য উচ্চ গণিতের সহিত মিলাইয়া প্রাচীন ইসলামীয় জগতের এই সমস্ত গণিতবিৎ ও জ্যোতির্বিৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ এমন কি আংশিক রসগ্রহণ আমার শক্তির বাহিরে। কিন্তু আমি এই প্রকার আলোচনার মূল্য বুঝি এবং গণিতে যাঁহাদের অল্পমাত্রও প্রবেশ হইয়াছে তাঁহাদের মনে এইরূপ আলোচনা, তুলনামূলক আলোচনার অন্যতম সুফল স্বরূপ ঐতিহাসিক কৌতূহলকে যে জাগাইয়া দিতে পারিবে, ইহাও বুঝি। সাধারণ অব্যবসায়ী পাঠক এই বই থেকে প্রচুর নূতন জ্ঞান লাভ করিবেন। আমরা সকলেই আল্-বেরূনী, ইবনে সিনা, আল্-হাইসাম, ওমর খয়্যাম, ইব্‌নে বাজ্জা প্রভৃতির নাম জানি। আল্‌বেরুনীর "ভারত-পরিচয়" গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে, ওমর খয়্যামের রুবা'ই কবিতার সঙ্গে, আমরা অনেকেই পরিচিত কিন্তু গণিত ও জ্যোতিষে তাঁহারা কি করিয়া গিয়াছেন, তাহার অণুমাত্র জ্ঞান আমাদের নাই। মৌলবী আকবর আলী সাহেবের বইয়ের কল্যাণে আমরা তাহার

কিছুটা ধারণা করিতে সমর্থ হইব—এবং এইজন্য তাঁহার নিকট আমারা ঋণী থাকিব।

পাশ্চাত্য খণ্ডে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-সূত্র ইসলামী আরব জগতের হাতে গিয়া পড়িবার পরে, সিরীয় ইরাকী, ইরাণী, মিসরী, মগরেবী ও হিস্পানী মুসলমানগণ সানন্দ উৎসাহে এই উত্তরাধিকাব গ্রহণ করিলেন, এবং আরবী ভাষা তখনকার দিনে ইসলামীয় জগতের মুখ্য আন্তর্জাতিক ভাষা হইয়া দাঁড়ানোর ফলে এই আরবী ভাষাকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডারের সংরক্ষণ ও পরিপোষণে অবহিত হইলেন। একাধারে তাঁহারা বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইলেন। ভারতের গণিত ও রসায়ন, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক, ভারতের উপাখ্যান ভাণ্ডার, আংশিকভাবে ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তাঁহাদের করায়ত্ত হইল। বিশ্বমানবের সভায় তাহাকে তাঁহারা উপস্থাপিত করিলেন। যবন বা গ্রীক, হিন্দু বা ভারতীয়, ইরাণী, মিসরী, শামী, ইরাকী জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া, আব্বাসী খলিফাদের যুগে তাঁহারা এক অপূর্ব জ্ঞানের মধুচক্র রচনা করিলেন। সমগ্র জগতের মনীষী এখনও যে মধুচক্র হইতে রস পান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। "যোগ" এবং "ক্ষেম"—প্রাপ্ত কৃতির পরিবর্ধণ এবং তাহার সন্ধারণ —উভয় ক্ষেত্রেই আরব, ইরাণী ও অন্য মুসলমান মনীষীরা বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-মিত্র হইয়াছিলেন। একটী বিশেষ বিজ্ঞানে তাঁহাদের এই যোগ-ক্ষেম বহনের কথা, তাঁহাদের

কল্যাণ-মিত্রতার কথা, প্রস্তুত গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার স্বদেশবাসী এবং স্বভাষাভাষী স্বজাতীয়দের সমক্ষে পুণ্য অবদানের মত শুনাইয়াছেন।

স্বীকার করিতেই হইবে যে আলোচ্য বিষয়টি জটিল, অনন্য সাধারণ; সকল পাঠক যে ইহার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইবেন, সে সম্ভাবনাও কম। কিন্তু বিজ্ঞানের গ্রন্থকেও যে সুখপাঠ্য করা যায়, মৌলবী আকবর আলী সাহেব তাঁহার প্রাঞ্জল রচনা-শৈলী দ্বারা তাহা পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছেন। বিষয়টী নিজে ভাল করিয়া না বুঝিলে, বিষয়টীর প্রতি দরদ না থাকিলে, অপরকে তাহা ভাল করিয়া বুঝানো যায় না, অপরের মনেও তাহার সম্বন্ধে অনুরাগ বা কৌতূহল জাগরিত করা যায় না। গ্রন্থকার নিজে জিনিসটী ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার প্রতি তাঁহার প্রাণের টান আছে; এবং তিনি সহজ সরল চল্‌তি বাঙ্গালায় নিজের বক্তব্য সোজাসুজি বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ বই যে সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইবে, ইহার মধ্যে যে একটা রস থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা, একাধারে বিজ্ঞান ও ইতিহাস, গ্রন্থকার সরস করিয়া লিখিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার রচনার সার্থকতা; এবং এই জন্যই তাঁহার পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২৫ শে বৈশাখ ১৩৫৩।

পূর্বাভাষ

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার তিন বৎসর পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হোল। যুদ্ধের দরুন প্রেস, কাগজ ইত্যাদির দুর্লভতাই এ বিলম্বের কৈফিয়ৎ। প্রথম খণ্ডে দশম শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম অঙ্কশাস্ত্রবিদদের জীবনী ও কার্যাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ খণ্ডে তারই জের টানা হয়েছে। এ গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত মুসলিম অঙ্কশাস্ত্রবিদ অঙ্কশাস্ত্রের কোন না কোন বিভাগে কিছুমাত্র মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদেরই জীবনী ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জের টানলেও, প্রকৃত পক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে মৌলিকতার দিকে দিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান খুব বেশী নয়, উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিকের সংখ্যাও নগণ্য এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা নেই বললেও চলে।

বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা বিপত্তি এসে দেখা দেয় প্রথমে তার পরে আস্তে আস্তে দেখা দেয় জটিলতর গ্রন্থি, কঠিনতর বাধা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের চন্দ্র সূর্য্যের গতির মধ্যে যে বিশেষ কোন জটিলতা থাকতে পারে এ হয়ত প্রথম শিক্ষার্থীর মনে কোন দিনই উদিত হয় না কিন্তু শিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর জটিলতাও তার উপলব্ধি হয়। অন্যান্য বিষয়েও তেমনি প্রথমের সাধারণ সূত্র সাধারণ গণনা অতি স্বাভাবিক ভাবেই আস্তে আস্তে জটিল আকার ধারণ করে।

এ গ্রন্থের মধ্যেও বিজ্ঞানের সাধারণ স্বাভাবিক ক্রমবর্ধনই পরিলক্ষিত হবে।

টলেমি ও ইউক্লিডের অনুসরণই মুসলিম অঙ্কশাস্ত্রবিদদের প্রথম বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত। প্রথম দিককার বৈজ্ঞানিকগণ অতি মাত্রায় এঁদের অন্ধভক্ত ছিলেন বলা চলে। হয়ত এ স্বাভাবিক। সমস্ত তথ্য বিশেষ ভাবে অবগত না হয়ে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত না করে পূর্বেকার মনীষীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অহমিকার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ধীর স্থিরভাবে সমস্ত কিছু জেনে নিলে পর পূর্বেকার জ্ঞান বিজ্ঞানের গলদ বের করে তার সংশোধন করা সম্ভবপর। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই ধীর স্থির পর্যালোচনার মনোভাব বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

দশম শতাব্দী থেকেই টলেমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয়। Solar system এর বর্তমান মতবাদের প্রথম সূত্রপাত দেখা দেয় একাদশ শতাব্দীতে। আলবেরুনী, আলজারকালি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের কাজ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ Geo Centric মত ছেড়ে দিয়ে Helio Centric মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। বস্তুত কোপার্নিকাসের তিন শত বৎসর পূর্বে Helio Centric মতবাদ বিজ্ঞান জগতে দেখা দেয়। কিন্তু তখনই এ দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে নাই। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কোন বিজ্ঞানসূত্রই একদিনে বিজ্ঞানে স্থান পায় না। অনেক হাত ঘুরে, অনেকের সাধনার

সমষ্টির রূপ নিয়ে তবে এ একদিন সত্যিকার রূপ লাভ করে। বিজ্ঞানে অবদান কারুর একক সাধনার জিনিস নয়। বহু জীবনের বহু বৎসরের সাধনাই তার প্রাণ। তেমনি ভাবেই বিজ্ঞান আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে গড়ে উঠে। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ Helio Centric মতবাদের সূত্রপাত করলেও এ তখনই কেন বিজ্ঞানজগতে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারে নাই তার কৈফিয়ৎ পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের এই স্বাভাবিক গতির মধ্যেই। আইনষ্টাইনের Theory of Relativity নিউটনের বিজ্ঞান আলোচনার সাধারণ পরিণতি কিন্তু নিউটনের হাতে এ ধরা পড়ে নাই। কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করবার পর এ বিজ্ঞান জগতে স্থান লাভ করেছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার মাত্রেই একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে কোন বড় আবিষ্কারের কথা এমনিতেই হঠাৎ কারুর মাথায় আসে না। এর পিছনে থাকে বহুদিনের সঞ্চিত সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের নানারূপ প্রচেষ্টা। উদাহরণ স্বরূপ Law of Gravitationএর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর আবিষ্কারের জন্য নিউটন বিশ্ববিখ্যাত। কি ভাবে এ আবিষ্কারের সূত্র তাঁর মাথায় আসে সে সম্বন্ধে একটা মনোহর ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মত মনমাতান গল্পও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যি এযে গল্পের কাহিনীর মত আপেল পড়ার জন্যই হঠাৎ তাঁর মাথায় ঢুকে পড়ে নাই দার্শনিক Gauss এর উক্তিতেই সে বেশ বোঝা যাবে। “Silly!” he (Gauss) exclaimed, “believe the story

if you like but the truth of the matter is this. Some stupid efficious man asked Newton how he discovered the Law of Gravitation. Seeing that he had to deal with a child in intellect and wanting to get rid of the bore, Newton answered that the apple fell and hit him on the nose. The man went away fully satisfied and completely enlightened'. আসল কথা হোল নিউটনের বহু পূর্বে থেকেই এ বিষয়ে নানা গবেষনা চলে আসছিল, নানা সমস্যা সমাধানের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। মধ্যযুগে বহু মুসলিম বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁরা নানা ভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করতেও চেষ্টা করেন। এমন কি মিসরের দ্বাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আলহাইছামের কার্যাবলীতে Law of Gravitationএর সুস্পষ্ট পরিকল্পনাও দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এর বিশ্বব্যাপীরূপ তাঁর হাতে ধরা পড়ে নাই। সে রূপ ধরা পড়ে নিউটনের হাতে। নিউটনই একে স্পষ্ট রূপ দেন। সে হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব হোল পূর্বেকার সমস্যাগুলির সমাধান করে এটিকে বিশ্বের সর্বত্র প্রয়োগ করা। Non-Euclidean Geometryর বেলায়ও এই কথাই বলা চলে। Non-Euclidean Geometry আজ আর কারুর অপরিচিত নয়। Euclidean Geometryর নাগপাশ ছেদ করে এ বিজ্ঞানকে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে। এর আবিষ্কর্তা

হিসাবে জিরোলামো সাকেরীর নামই পরিচিত কিন্তু এও জিরোলামোর হঠাৎ আবিষ্কার নয়। এর পিছনেও রয়েছে বহুবিধ প্রচেষ্টা, বহু বৈজ্ঞানিকের সাধনা। বহু পূর্বেই ইউক্লিডের জ্যামিতির দুর্বলতা ধরা পড়ে। তাঁর পঞ্চম Postulate নিয়ে বহু বাদানুবাদ চলতে থাকে। নাসিরউদ্দিন তুসী সর্বপ্রথম এ বিষয়ের সমাধান পন্থার দিকে বিজ্ঞান জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জিরোলামো সাকেরী তাঁরই প্রবর্তিত যুক্তিবাদকে আরও সুবিস্তারিত করে তোলেন—Non-Euclidean Geometryর উদ্ভব হয়।

বিজ্ঞানের অনেক মূলসূত্রের আবিষ্কারের গৌরব মুসলিম বৈজ্ঞানিকদেরই প্রাপ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের কার্যাবলী বিষয়ে অজ্ঞতা বশত, অনেক সময় বা বিদ্বেষ বশত তাঁদের প্রাপ্য আসন তাঁদিগকে দেওয়া হয় নি। Non-Euclidean Geometryর মত আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। Analytic Geometry এবং Binomial Theorem এর মধ্যে অন্যতম। কবি বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়ামের কার্যাবলীর মধ্যে Analytic Geometryর সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সেনা গণিতবিদ Des Cartes এর পূর্ণ অবয়ব দান করেন। Cartesian Co-ordinateএ Des Cartes অমরত্ব লাভ করেছেন কিন্তু Analytic Geometryর ইতিহাস থেকে ওমর খৈয়ামের নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। Binomial Theorem নিউটনের আবিষ্কার

বলে পরিচিত—তাঁর কবরের উপর Binomial Theorem আঁকা রয়েছে। কিন্তু Binomial Theoremএর সূত্রপাত করেন ওমর খৈয়াম। তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে Binomial Theorem এর স্পষ্টরূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিউটনের কবরে Binomial Theorem রয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসেও ওমরের নামও নেই। মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলে প্রচার করার ফলেই যে এমনি ভ্রম প্রমাদ ঢুকে গিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এমনি অপপ্রচারের অপচেষ্টায় ব্যস্ত না থেকে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান প্রতিভা ও সত্যিকার স্বরূপ ধরা পড়বে ; মধ্যযুগের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে উজ্জ্বল আলোস্নাত অমল আভা দেখা দিবে।

এই গ্রন্থেই মুসলিম বিজ্ঞান জগতের উন্নতি ও অবনতির চরম অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এ ধাপের পর ধাপ এগিয়ে গেছে ; কোন দিকে কোন গ্লানি, কি কোন দিকে কোন কালিমার একটু রেখাও দেখা দেয় নাই। এ যেন ভরা ভাদরের ভরা নদী। কিন্তু তার পরেই এসেছে ভাটার টান। সে টান এত বেশী, তার বিপরীত গতি এত প্রখর, যে এতদিনকার সাজান গোছান কুলভরা নদী একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইসলামের ইতিহাসে এই বোধ হয় সব চেয়ে বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী দৃশ্য। দুর্বার জল স্রোতের মত তারা ফুলে ফেঁপে বেয়ে উঠেছিল কিন্তু

ভাটার শেষ স্রোতের পর কাদা আর বালি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

এই উন্নতির সময় কিন্তু তারা সারা বিশ্বে একক উজ্জল ও ভাস্বর। পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন আলোক রশ্মির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। এই সময়কার পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের সঙ্গে মুসলিম জাতির কার্যকলাপের তুলনা করলেই একথা ভাল ভাবে উপলদ্ধি হবে। মুসলিম জাতি যখন টলেমির বিরুদ্ধে নীরব বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর আলমাজেষ্টের অবৈজ্ঞানিকত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন, ইউরোপ তখন আলমাজেষ্ট শুধু পড়া সুরু করেছে—বহু পূর্বের আরবী অনুবাদের লাটিন অনুবাদ থেকে। শুধু পাশ্চাত্যের নয় প্রাচ্যেরও সেই অবস্থা। ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে এক ভাস্করাচার্য ছাড়া অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই সময়কার সমস্ত পৃথিবীকে culture এর দিক দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ থেকে সুরু করে ইউরোপের শেষ পর্যন্ত রয়েছে Arabo Greeco Latin culture আর পূর্বাংশে রয়েছে Indo Sino Japanese culture. ইউরোপে তখন আরবী জ্ঞান বিজ্ঞানের বই অনুদিত হচ্ছে অতি দ্রুতভাবে। চার্চের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যাঁরাই সত্যিকার জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে মন দিচ্ছেন তাঁরাই চোখে ফেরাচ্ছেন মুসলিম জাতির অবদানের প্রতি। আরবীতে লিখিত গ্রন্থগুলির অনুবাদ করাই তাঁদের

সর্বপ্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবী গ্রন্থগুলি অনুদিত হচ্ছে কিন্তু সেও ধারাবাহিক তারিখ অনুসারে নয়। নূতনতম বিজ্ঞানের নব অবদান সম্বলিত গ্রন্থাবলীর চেয়ে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পূর্বেকার গ্রন্থাবলীই বেশী অনুদিত হতে থাকে। এর কারণ অনুধাবন করা শক্ত। হয়ত তাঁরা নূতনতমগুলির সন্ধান পান নাই অথবা এগুলির জটিলতা তাঁদিগকে স্বভাবতই দমিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণই সমীচীন বলে মনে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবলগুলির অনুবাদের তারিখের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যেতে পারে। নবম শতাব্দীর আলখারেজামির টেবল অনুদিত হওয়ার পর একাদশ শতাব্দীর আলজারকালির টেবল অনুদিত হয়। কিন্তু তার পরে অনুদিত হয় দশম শতাব্দীর আলবাত্তানীর টেবল। আবার এরও পরে অনুদিত হয় নবম শতাব্দীর আলফারগাণির টেবল। খৃষ্টান জগতে সর্বপ্রথম দ্বাদশ শতাব্দীতে মারসেইলসের Raymond (১১৪০ খৃঃ অব্দ) Toledean Table অনুযায়ী নূতন স্থান ও কালে প্রযোজ্য Merseilles Table প্রণয়ন করেন। এর কিছু পরে রবার্ট (Robert of Chester) আলবাত্তানী ও আলজারকালির টেবল অনুসরণ করে London Table তৈরী করেন (১১৪৯ খৃঃ অব্দ)। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবার Toledean Tableএর দিকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ঝোঁক দেখা দেয়। নৃপতি আলফানসোর (Alfanso el Sabio) পৃষ্ঠপোষকতায় জুদা বিন মোজেস এবং আইজাক ইবনে সিদ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Toledean

Table অনুযায়ী টেবল তৈরী করেন। অর্থাৎ যখন মারাঘায় Ilkhani Table পূর্বেকার সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ঘুচিয়ে বিজ্ঞানের নব প'থ প্রদর্শন করছে ইউরোপে তখন ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ টেবলের পাঠ সবে মাত্র সুরু হয়েছে।

Indo Sino Japanese culture এ যাই থাকুক না কেন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির দিক দিয়ে এ বিশেষ কোন সহায়তাই করে নাই।* ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবধারার আমদানী হোলেও এখানকার মনীষীদের মধ্যেএ কোনও পরিবর্তনই আনয়ন করতে পারে নাই। গোঁড়া রক্ষণশীলতাই যে এর জন্যে দায়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। চীনে কিন্তু এর বিপরীত ভাব দেখা যায়। বহু চীনা বৈজ্ঞানিক মারাঘার মানমন্দিরে বিজ্ঞান আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। ফলে চীনের বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে আরবী ভাবধারাও ঢুকে পড়ে। এই অনুপ্রেরণাই চীনের বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতির সূচনা করে। চিন চিও শাও (chin chiu shao), লি ইয়েহ (Li yeh), ইয়ং হুই (yong Hui), চু শিহ চিয়েহ (chu

* The study of Hindu Sino Japanese elements whatever their intrinsic importance may be some what neglected without falsifying the picture. This is very fortunate because it is impossible to tell the history of Asiatic science with any completeness and with any great accuracy (Introduction to the History of Science. Sarton, vol II. p. 3)

shih chieh), কু শো চিং (kuo shou ching) প্রভৃতির কার্যাবলীতে আরবী প্রভাবের মধ্যে স্বাধীন মতবাদের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

অঙ্কশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগেই এই সময়ে বিশেষ উন্নতি দেখা দেয়। পূর্বেকার গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে মুক্ত বুদ্ধির স্ফুরণ সব দিক দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। নূতনতম যন্ত্রপাতি, টলেমির ভ্রমপ্রমাদের সংশোধন, নূতন নূতন থিওরী জ্যোতির্বিজ্ঞান শাখাকে উন্নততর করে তুলেছে, Quadratic, Cubic Equation এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর Equation এর সমাধানের জন্য নব নব পন্থা, Binomial theory প্রভৃতি বীজগণিতের উন্নতির সূচনা ঘোষনা করছে। ত্রিকোণমিতিতে বহু নব উদ্ভাবিত থিওরী স্থান পেয়েছে। এ পূর্বেকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংস্রব এড়িয়ে স্বাধীন সত্বা পায়। ত্রিকোণমিতির বেলায় একটি জিনিস অতি সহজেই চোখে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মরক্কোতে এর বেশী আলোচনা হয়েছে কিন্তু শেষভাগে স্থান একেবারে পাল্টে গিয়েছে। মরক্কো ছেড়ে এ স্থান পেয়েছে সুদূর প্রাচ্যে উরমিয়া হ্রদের অনতিদূরে আজারবাইজানে। এখানে আলোচনা চলেছে অতি নিপুণ ভাবে। ১২২৯ খৃঃ অব্দে মরক্কোর আলহাসান আলমাররাকুশী Practical Astronomy সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর অধিকাংশই ব্যয়িত হয় ত্রিকোণমিতিতে। এতে অর্ধডিগ্রীর সাইন, Versed sines, Arc sines, Arc co-tangent এর

টেবলও দেওয়া রয়েছে। ১২৫৯ খৃঃ অব্দে নাসির উদ্দিন তাঁর "কিতাবু শাকলোল কাত্তা" গ্রন্থে ত্রিকোণমিতিকে নূতন জীবন দান করেন বলা চলে। Plane এবং Spherical উভয় প্রকারের ত্রিভূজের বিস্তারিত আলোচনা এর মুখ্য অবদান। Spherical ত্রিভূজের আলোচনার মধ্যে Polar triangle এর সুন্দর পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। নাসির উদ্দিনের শিষ্য মহীউদ্দিন আলমাগরিবী শিক্ষকের কার্যাবলীর উপর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ত্রিকোণমিতি নবযৌবন পায়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ত্রিকোণমিতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান আলোচনা কোন পর্যায়ের ছিল তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে।*

চীনা বৈজ্ঞানিকগণ মারাঘা থেকেই বিশেষ অনুপ্রেরণা পান। খুব সম্ভব কু শাউ চিং এর ত্রিকোণমিতি আরবী ত্রিকোণমিতি থেকেই উদ্ভূত। ইউরোপীয় ত্রিকোণমিতি তখনও শৈশবাবস্থায়; আরবী ত্রিকোণমিতির সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হতে পারে নাই। প্রতিদিন নূতন নূতন আলোপাত হচ্ছে, পুরাতন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হয়ে বৈজ্ঞানিকদের নূতন কার্যাবলী চোখে পড়ছে,

* "...Outline of trigonometry, in the twelfth and thirteenth centuries, can not but give the reader a very high idea of the Muslim science." Introduction to the History of Science—Sarton, Vol. II, P. 12

তাই একে সুসম্পূর্ণ করা সম্ভবপর নয়। ছাপা হওয়ার পরেও বহু নূতন জিনিসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত যেগুলো জানা গিয়েছে এখানে শুধু সেইগুলিরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। পারতপক্ষে জটিলতর এবং Technical জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে সর্বসাধারণের উপযোগী করার জন্যে।

গ্রন্থখানি প্রণয়নে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার এম এস্-সি। আধুনিক গণিতের ধারা ও মতবাদ সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই পিছিয়ে পড়েছি, আধুনিক গণিতের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা প্রধানত অধ্যাপক আবদুল জব্বারের সহায়তাতেই করা হয়েছে। Non-Euclidean Geometryর পঞ্চম Postulate সম্বন্ধে প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে মিঃ সাখাওয়াত হোসেন এম্ এ, প্রণীত বৈজ্ঞানিকের "তাহরিরে উকলিদাস" গ্রন্থের অনুবাদ থেকে। মিঃ হোসেন তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দেখতে দিয়ে এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক সাইদুর রহমান এম্-এ, পুস্তকাদি সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেছেন। কল্যাণীয় আবুল কাসেম ফসিউল আলম প্রুফ সংশোধন এবং সূচীপ্রণয়ন করে দিয়েছেন। এঁদের সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

গোপালপুর, পাবনা
১০ই মে ১৯৪৬

এম আকবর আলি

Bibliography

History of Mathematics—Smith, D. E.

A History of Mathematics—Cajori, F.

A Short account of the History of Mathematics—Ball, W. W. Rouse

A brief History of Mathematics—Fink, karl.

A History of Mathematical Notations—Cajori, F.

A bit of Mathematical History—Baiher Maxime.

Introduction to the History of Science—Sarton, G.

A History of Elementary Mathematics—Cajori, F.

A History of Science—Dampier whetham, W. C. D.

The Hindu Arab Numerals—Smith-Karpinski

Historical Introduction to Mathematical literature—Miller, G. A.

The Legacy of Islam—Edited by Arnold, Sir T.

A literary History of the Arabs—Nicholson, R. A.

A literary History of Persia—Browne, E. G.

History of the Arabs—Phillip, K. Hitti.

Spirit of Islam—Ali, Syed Ameer
A Short History of the Saracens—Ali, Syed Ameer
The Arab civilization—Hell, J.
AlBeruni's India—Sachau, E.
Ancient Nations by AlBeruni—Sachau, E.
Kitabut Tafhim. by AlBeruni—Wright, Ramsay
Encyclopædia of Pure Mathematics
Encyclopædia of Islam
Encyclopædia Britanica.
Education in Muslim India—Jafar, S. M.
Ancient Accounts of India & China.—Two Mahammdens
Outlines of Islamic Culture—Shushtery, A. M A.
Biographical Dictionary—Ibn Khallikan—De Slane.
The History of Philosophy in Islam—De-Boer, T. J.
A History of Spanish Civilization—Altamira
Oriental Biographical Dictionary—Beale.
The Algebra of Omar Khayyam—Kasir, Daud. S.
Mussalman Culture—Bartold.

Arabic Thought and its place in History
—O'Leary
The Intellectual Development of Europe
—Draper, J. W.
A History of Egypt—Lanepoole.
Tarikh-al-Hukama—Ibn-al-kift
Mukadamat— Ibn Khaldun
AlFihrist—Ibn-al-Nadim.
Encyklopadie der Mathematishen—
Wissenschaften
Geschichte der Mathematik—Gunther & Wieleitner
Zur Geschichte der Mathematik in Altertum and Mittelalter—Hankel. H.
Histoire des Sciences Mathematiques et Physiques—Marie, M.
Histoire des Mathematiques—Montoucla, J. E.
Histoire des Sciences Mathematiques en Italie—Libri, G.
Recherches Sur L' Histoire des Sciences Mathematiques chez les orientaux—
Woepke F.
Geschichte der Elementar Mathematik in Systemetischer Darstellung—Tröpfke. J.
Histoire des Mathematiques dans L'Antiquite et la Moyen Age—Zonen, H. G.

La Grande Encyclopedie

La Science Arabe—Aldo Mieli

Vorlesungen über Geschichte der Mathematik—Cantor

Geschichte der reinen Mathematik—Arneth, A.

Grundzüge der Antiken und Modernen Algebra der litteralen Gleichungen—Matthilessen Ludig.

Geschichte der Mathematischen Wissenschaften—Suter Hinrich

Geschichte der Astronomie—Wolf Rudolf.
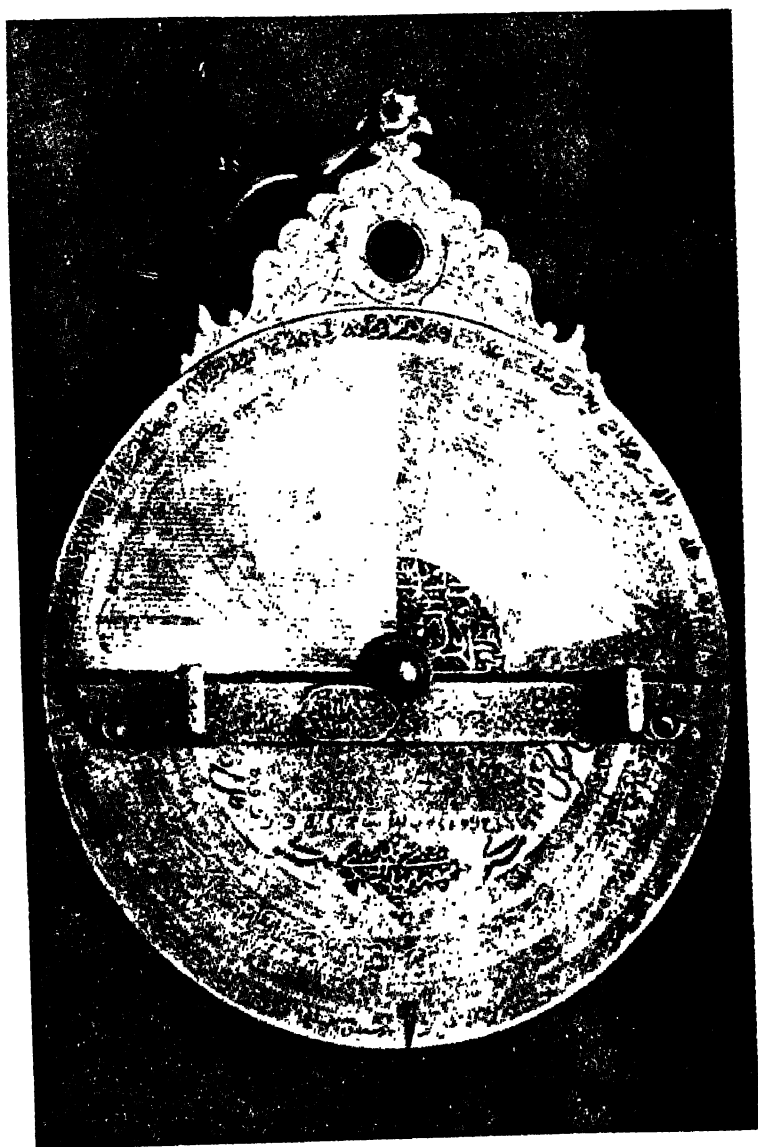
স্তারলবের পৃষ্ঠদেশ

বিজ্ঞানে মুসলমানের দান

একাদশ শতাব্দী

মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাসে একাদশ শতাব্দী এক অভিনব স্থান অধিকার করে রয়েছে। যে কৃষ্টি সপ্তম শতাব্দী থেকে গড়ে উঠেছিল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এক কথায় সভ্যতাবাহক বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে, একাদশ শতাব্দীতে তার উন্নতির হয়েছে চরম পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এখানেই এসে সে থমকে দাঁড়িয়েছে—তারপরে আরম্ভ হয়েছে তার পতন এবং সে পতন চলেছে অনেকটা দ্রুতগতিতে।

ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস তখন ঝঞ্ঝাবাত্যায় পরিপূর্ণ। বাগদাদ নামে মাত্র পারস্যের তথা মুসলিম রাজ্যের রাজধানী। তার গৌরবসূর্য তখন অস্তপথে। পারস্যের বিভিন্ন স্থানে তখন নানা বংশের নানা শাখাপ্রশাখা রাজ্য বিস্তার করেছে। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সামানীয় বংশীয় নৃপতিগণ বুখারায় রাজ্য স্থাপন করে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে

আসছিলেন, তাঁদের প্রতাপও এই সময় ক্ষুণ্ণ হয়ে এসেছে। বুয়াইহ দেলামাইয়ী রাজগণ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম পারস্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন। বাগদাদও বাস্তবপক্ষে তাঁদের করতলগত। খলিফা নামে মাত্র, কার্যত তিনি তাঁদের হাতের পুতুল। নিজেরা খলিফা না হয়ে তাঁরা নামকাওয়াস্তে যাকে ইচ্ছা খলিফা পদে অভিষিক্ত করছেন। এ ছাড়া অন্য দুইটি বংশও এই সময়ে আপনাদের কিছু কিছু প্রাধান্য স্থাপন করতে সুরু করেছে। জিয়ার বংশীয় নৃপতিগণ তাবারিস্তানে তাঁদের রাজ্য স্থাপন করেছেন। হাসানীয় বংশীয়গণ কুর্দিস্তান করতলগত করে নিজেদের শৌর্যের মহিমা প্রকাশ করছেন।

পারস্যের পশ্চিমপ্রান্তে গৌরবসূর্য যখন অস্তমান প্রায়, তার পূর্বদিকে তখন নবোদ্ভাসিত অরুণ আলোক সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। মুক্ত ক্রীতদাস নিজের অসামান্য শৌর্যবীর্যের প্রভাবে আফগানিস্তানে নূতন এক রাজ্য স্থাপন করেছেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সঙ্গে সামানীয়দের বিবাদ বাধতেও দেরী হয়নি। এতদিন তাঁরা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে আসলেও, এই সময়েই তাঁরা আস্তে আস্তে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমেই সুলতান মাহমুদ খোরাসানকে নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। শুধু শৌর্যবীর্যেই নয় তাঁর অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে গজনী হয়ে উঠে সমস্ত পৃথিবীর কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। বাগদাদের এতদিনকার প্রতিপত্তি গজনীতে স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। পারসী ভাষা, পারসীক আচার ব্যবহার ধীরে ধীরে

আরবী ভাষা এবং সভ্যতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এ অবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নাই। গজনীর গৌরব শিখা দপ্ করে জ্বলে উঠে কিছুদিন দাউ দাউ করে জ্বলে, পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাহমুদ তনয় মাসউদ তুর্ক সেলজুকদের হস্তে পরাজিত হন এবং সেলজুক বংশ ধীরে ধীরে সমস্ত মুসলিম রাজ্যের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে।

রাজনৈতিক ইতিহাসে এমনি ভাঙ্গাগড়া চললেও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে কোন বাধা পড়ে নাই। তার গতি এই ভাঙ্গাগড়ার আবর্তে পড়েও অব্যাহত রয়েছে নিজের পথে। নৃশংস বীভৎস যুদ্ধকাণ্ডের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান শিখা অম্লানভাবেই প্রজ্বলিত, যোদ্ধা নৃপতিদেরই অনুকম্পায় ; এ সত্যিই এক অপূর্ব ব্যাপার। যিনি সব চেয়ে বড় যোদ্ধা তিনিই জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সব চেয়ে বড় পৃষ্টপোষক। সুলতান মাহমুদের অমিতপরাক্রমশালী সৈন্যের ভয়ে সমস্ত পারস্য তখন থরহরি কম্পমান—ভারতবর্ষের নৃপতিদের অবস্থা অতীব শোচনীয়, মন্দিরধংসকারী হিসাবে সুলতান মাহমুদ সেখানে প্রতিদিন মন্দিররক্ষকদের অভিসম্পাতগ্রস্ত হচ্ছেন, কিন্তু তাঁর রাজধানী গজনী তখন বিদ্বানগণের সমাবেশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাইরের অমিতবিক্রমশালী যোদ্ধা নিজের রাজধানীতে রয়েছেন ছুই শতাধিক বিদ্বান ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয়ে, সেখানে রয়েছেন আলবেরুনী, ফেরদৌসী, আবু নসর খাম্মার, আবু নসর আর্‌রাক প্রভৃতি জগতের পূজ্য মনীষিগণ। সুলতান মাহমুদের ভয়েই

তাঁরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন না ভালবাসায় সে বিষয়ে তন্ন তন্ন করে বিচার করার চেয়ে তাঁরা যে সুলতানের প্রেরণায়ই নিজেদের মনীষার স্ফূরণের সুযোগ পেয়েছিলেন সেইই বেশী বিবেচ্য।

রাজনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও এক দশ শতাব্দীর অভিনবত্ব আপনিই চোখে পড়ে। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে একটা ক্লান্তির ভাব এসে পড়ে—সবই যেন কেমন মিইয়ে আসে—শেষভাগে আবার কাজ চলতে থাকে পরিপূর্ণ তেজে। এরই জের চলে সারা একাদশ শতাব্দী ধরে। একাদশ শতাব্দী মধ্যযুগের ভাদ্রমাস। যেখানকার যত প্রবাহ সব এক সঙ্গে মিশে একত্রিত হ'য়ে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছে পূর্ণতার দিকে। এই শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যক মুসলিম মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে যে সে সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার; অন্য কোন শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যক মনীষার আবির্ভাব দেখা যায় না। এই অদ্ভুতকর্মা মনীষীদের কৃতিত্ব এই ধারা পরিবর্তনের মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ রেখা ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁদের অসামান্য প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত মুসলিম জগৎ হয়ে উঠে উদ্ভাসিত, সমস্ত পৃথিবী হয়ে পড়ে সচকিত। চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার আগে দপ করে জ্বলে উঠা প্রদীপের মত তাঁদের কার্য কলাপও অসামান্য ঔজ্জ্বল্যে বিভূষিত। তাঁদের বিস্ময়কর সৃষ্টিতে পৃথিবীর মোহমুগ্ধ একটানা গতানুগতিকতার পথে এক

নব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পূর্ব শতাব্দীতে যে ঝিমিয়ে ধরা ভাব সমস্ত মুসলিম জগৎকে ছেয়ে ফেলেছিল তার সেই আলস্য-বিজড়িত তন্দ্রার মাঝে এসে পড়ে চোখ ধাঁধান আলোর উচ্ছাস —তার বুকের উপর দিয়ে বয়ে যায় এক নূতন আন্দোলনের ঢেউ। মুসলিম জগৎ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশ তখন একেবারে ঘুমন্ত, নীরব, নিস্পন্দ—এ ঢেউ কিন্তু তাদেরও স্পর্শ না করে ছাড়ে নাই, তারাও চোখ মেলে চাইতে সুরু করে।

যে সকল মনীষীর অপূব মনীষায় এই সাড়া জেগে উঠে তাঁদের মধ্যে ইবনে ইউনুস, ইবনোল হাইছাম, আলকারখি আলবেরুনী, ইবনে সিনা, আলি এবনে ইসা প্রধানতম।

আলকারখি

উৎসের আপন তেজস্বিতা কমে গেলেও সে যেমন উৎসই থাকে, শাখাপ্রশাখা তার সঙ্গে যুক্ত না থেকেই পারে না, মুসলিম জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বাগদাদও একাদশ শতাব্দীতে সেই অবস্থায়ই উপনীত হয়। বাগদাদের সিংহাসনে তখন খলিফা উপবিষ্ট থাকলেও কার্যত তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না। রাজকীয় প্রভাব কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় বিদ্যোৎসাহিতা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের অনুপ্রেরণাও কম হয়ে আসে, তবুও পূর্বের জের টেনে চলার মতই বিজ্ঞানের অনুশীলন চলে অনেকটা আগের মতই। এই সময়ের

বাগদাদকে যিনি বিজ্ঞান জগতের মানসচক্ষের উপর প্রতিভাত করে রেখেছেন, তিনি হোলেন আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে হোসায়েনোল হাসিবুল কারখি।

আলকারখি নাম হয় কারখের অধিবাসী হিসাবেই। কারখ বাগদাদের একটি অংশবিশেষ। তবে বাগদাদ স্থাপনের বহু পূর্বেই কারখ প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল বাণিজ্যিক সুবিধার জন্যে। চতুর্থ শতাব্দী থেকেই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এর উল্লেখ দেখা যায়। শাসানীয় নৃপতি দ্বিতীয় শাহপুর এর প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদ স্থাপনের পর, অন্যান্য ক্রম বর্ধমান সহরের উপকণ্ঠের মত, কারখও বাগদাদের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। তখন থেকেই এর ইতিহাস বাগদাদের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। বাগদাদের চেয়েও এ একদিক দিয়ে তৎকালে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে, সে হোল শিয়া সুন্নীর বিবাদ। ধর্মের উন্মাদনায় মানুষ যে কতখানি জ্ঞানশূন্যভাবে কাজ করতে পারে কারখ তার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। কারখ ছিল শিয়াদের আবাসস্থল। ধর্মমত সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী বরং শিয়াদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বুয়াইদ নৃপতিদের আমলে, এই উন্মাদনা বেশী করে জেগে উঠে। পূর্বেকার সাময়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষের পরিবর্তে এই সময়ে অনবরত সংঘর্ষ চলতে থাকে। সুলতান জালালউদ্দৌলার সময়ে এই খণ্ড ধর্মযুদ্ধ বৃহৎ যুদ্ধেই পরিণত হয় এবং সুলতান কারখের দুর্গে তাঁর শিয়া প্রজা সহ আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ১০৫৩ খৃঃ অব্দে কারখ পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় এই বিবাদের

ফলেই। কারখ একদিকে যেমন শিয়া সুন্নীদের বিবাদের প্রধানতম স্থল হয়ে বাগদাদের অন্যান্য অংশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, স্থিতিস্থাপকতায়ও এ তেমনি অন্যান্য অংশকে ছাড়িয়ে গেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কারখের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু এর আশে পাশের অন্যান্য অংশগুলি তার অনেক আগেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কারখ হারুন-অর-রশিদের প্রিয়তমা পত্নী জুবায়দার কবরস্থান হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এই ইতিহাস বিখ্যাত স্থানেই বৈজ্ঞানিক আবুবকরের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় এবং উত্তরকালে তিনি আলকারখি নামেই পরিচিত হন। আলকারখির পূর্বপুরুষ বা জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কোন কিছুই জানা যায় না। তিনি কারখেই জন্মগ্রহণ করেন কি অন্য কোন প্রদেশ তাঁর জন্মস্থান হিসাবে গৌরব করতে পারে সে সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নি। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নীরব এমন কি কোন ইতিহাসেই আলকারখির ধারাবাহিক জীবনীটুকুও লিখিত হয় নি। এর সঙ্গে আবু আলি সিনা এবং আলবেরুণীর জীবনী কথার তুলনা করলে স্বতই মনে হয়, হয়ত আলকারখি কোন অভিজাত বংশের বংশধর নন। এ কালের মত সে কালেও যে যাঁরা ধনে মানে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন তাঁদেরই জীবনী কথা লিখিত হোত, কবি ঐতিহাসিক তাঁদেরই গুণ গানে মত্ত হতেন সে কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই। হয়ত সেই জন্যেই মুসলিম জগতের

অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হোলেও আলকারখির জীবন ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু তাঁর কীর্তিই তাঁকে অমর করে রেখেছে, অন্য কারও লেখনীর কৃপায় অমরত্ব লাভ করা তাঁর ভাগ্যে ঘটে উঠে নি। জন্ম তারিখের মত মৃত্যু তারিখও সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নি। শুধু জানা যায় যে তিনি ৪১০ থেকে ৪২০ হিজরীর (১০১৯—১০২৯ খৃঃ অব্দ) মধ্যে দেহত্যাগ করেন। খলিফা আলকাদির বিল্লাহ ও আলকিয়াম-বি-আমারিল্লাহর খেলাফত কালে বুয়াইদ সুলতান বাহাউদ্দৌলা ও তৎপুত্র সুলতান-উদ্দোলা আবু সুজার আমলেই আলকারখির প্রতিভার বিকাশ ঘটে। যতদূর মনে হয় আবু আবদুল্লাহর মন্ত্রী আবু গালিব মোহাম্মদ বিন খালাফ ফখ্‌রুল্ মুলক্, আলকারখির বিজ্ঞান আলোচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিলেন অথবা হয়ত তাঁর বীজগণিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন ব্যাপারে কোন ভাবে বিজড়িত ছিলেন এবং তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আলকারখি তাঁর বীজগণিত গ্রন্থখানির নাম রাখেন "আলফাখ্‌রি"। জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে আলকারখি যে বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্বীয় ব্যবহৃত নাম "আলহাসিব" থেকেই। আলকারখি নিজে থেকেই এ নাম ব্যবহার করেন। "আলহাসিব" অর্থ হোল "অঙ্কশাস্ত্রবিদ"।

অঙ্কশাস্ত্রে নূতন প্রেরণা উদ্ভাবনকারী হিসাবে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হয়ে রইবার অধিকারী হোলেও, আলকারখির জীবনীর মতই তাঁর সম্পূর্ণ কার্যাবলীও এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

তিনি কি কাজ করেছিলেন, অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর দান কোন স্তরের সে আলোচনা করবার মত মাল মশলা এখনও সংগৃহীত হয় নি। যাঁর জীবনের সম্পূর্ণ কার্যাবলীরই পরিচয় পাওয়া যায় নি তাঁকে সমালোচনা করবার চেষ্টা করলে ন্যায় বিচার বুদ্ধি প্রকাশ পাবে না, তাই অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে তাঁর সমালোচনা করাও ন্যায়সঙ্গত হবে না। এ পর্যন্ত আলকারখির মাত্র দুইখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে একখানা হোল "আল কাফি ফিল হিসাব" আর অন্য খানা হোল "আল ফাখ্‌রি"। এগুলোরও মূল আরবী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। প্রথমখানার এক খণ্ড গোথাতে বিদ্যমান। দ্বিতীয়খানা প্যারিস, অক্সফোর্ড এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বিদ্যমান আছে। এ হোচিয়ম (A Hochchiem) নামক জনৈক জার্মান পণ্ডিত ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে "আল কাফিফিল্ হিসাব" এর "Kafi fil Hisab des Abu Bekr. Mohammad b. Al Hossein Al Karkhi' নামে তিন খণ্ডে জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। মঁসিয়ে এফ উপেক (F. Woepke) প্যারিস থেকে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে আলফাখ্‌রির একখানা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হয়েছে বলে জানা যায় নি।

বিশুদ্ধ অঙ্ক (arithmetic) হিসাবে, "কাফি ফিল্ হিসাব" অঙ্কশাস্ত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এতে তদানীন্তন প্রচলিত অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী ও অঙ্কের নানা বিষয়

সম্বন্ধে বিবিধ উদাহরণ সন্নিবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার তাঁর নিজের উদ্ভাবিত পন্থাগুলিও যোগ করে দিয়েছেন। এই নূতন উদ্ভাবিত পন্থাগুলিই গ্রন্থকারের অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। অন্য সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের গ্রন্থের মতই গ্রন্থকার প্রথমে এতে প্রাথমিক বিষয়গুলির অবতারনা করে ক্রমশ জটিলতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এই ক্রম জটিলতার মধ্যে অঙ্কের সঙ্গে বীজগণিতকে মিশ খাইয়ে দেওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল পুরণ। অঙ্কশাস্ত্রের এ বহু পুরাতন বিষয় হোলেও, আলকারখি এর পুরাণত্বকে ঢেকে ফেলেছেন তাঁর মৌলিকতা দিয়ে। এতে তিনি বীজগণিতকে কেমন ভাবে খাটিয়ে নেওয়া যায় সে বেশ ভাল ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছোট পুরণে এগুলো বিশেষ উপযোগী হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

২২ × ৪৪ = (২২ × ৪ + ৮)১০ + ২ × ৪ = ৯৬৮

২৩ × ২৭ = (২৩ + ৭) × ২ × ১০ + ৩ × ৭ = ৬২১

২৩ × ১৮ = (২৩ — ২) × ২ × ১০ — ৬ = ৪১৪

বীজগণিতের চিহ্ন অনুবর্তনে ফরমূলা দাঁড়াবে

$$(10a+a)(10b+b)=[(10a+a)b+ab]10+ab$$

$$(10a+b)(10a+c)=[10a+b+c]a.\ 10+bc$$

$$(10a+b)(10a-c)=100a^2+10ab-(10ac+bc)$$

$$=(10a+b-c)a.\ 10-bc$$

পুরণের অন্যতম প্রণালী—বামদিক থেকে পুরণও আলকারখি অনেক সময় ব্যবহার করেছেন তবে এ প্রথাকে তিনি বিশেষ

স্নেহের চোখে দেখতেন বলে মনে হয় না। ফলে মধ্যে মধ্যে দুই একটি ব্যবহার ছাড়া একে প্রচলিত করবার কোন প্রয়াসই তাঁর পুস্তকে দেখা যায় না। ভগ্নাংশের পুরণের নিয়ম, গরিষ্ঠ-সাধারণ গুণীয়ক, প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মাবলী "কাফি ফিল্ হিসাবে" দেখা যায়, তার অনেকগুলিই অদ্যাবধি প্রচলিত। ভগ্নাংশের পুরণ সম্বন্ধে কারখির অন্যতম নিয়ম বেশ উপভোগ্য। আজকালকার প্রচলিত চিহ্নে এটি দাঁড়াবে

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{\frac{a.c}{b}}{d} = \frac{\frac{a.c}{d}}{b}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{\frac{10}{3}}{7} = \frac{\frac{10}{7}}{3}$$

পুরণ ঠিক হয়েছে কিনা সে দেখবার অন্যতম প্রণালী—৯ বাদ দিয়ে দেখার সন্ধানও "কাফি ফিল্ হিসাবে" পাওয়া যায়। এ প্রণালী প্রথম কোথায় উদ্ভূত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কারুর কারুর মতে ভারতীয়েরা এ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাঁদের ধারনার কারণ আলখারেজ্মি যে গুণন পদ্ধতির প্রচলন করেন সে অনেকটা ভারতীয়দের অনুসরণ করেই। কেউ কেউ এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আরবীয়দের উদ্ভূত বলেই মত প্রকাশ করেছেন।*

১১ বাদ দিয়ে ফল নির্ণয় করবার প্রণালীও "আল কাফি

---

* Legacy of Islam, p. 394.

ফিল্ হিসাবে" স্থান পেয়েছে। এর পূর্বে আর কেউ এ প্রথা ব্যবহার করেছেন কিনা জানা যায় না।

বস্তুত "কাফি ফিল্ হিসাবে" অঙ্কশাস্ত্রের নানা নিয়মাবলী, সেগুলোর ব্যবহার প্রণালী ও নূতন নিয়ম উদ্ভাবন, প্রভৃতির সমাবেশ, রচয়িতার বিশেষ জ্ঞান ও প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় দেয়। Quarter Square, বর্গমূল নির্ণয় প্রণালী, সমতল ভূমির পরিমাপ বিশেষত যে গুলোতে Surd number ব্যবহার করাও আবশ্যক হয়ে পড়েছে, সে সবও আলকারখির দৃষ্টি এড়ায় নেই। এ সমস্তই বৈজ্ঞানিকের প্রগাঢ় অনুসান্ধিৎসা ও চিন্তাশীলতার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর ব্যবহৃত নিয়মাবলী এখনও সর্বত্রই প্রচলিত।

Quarter Square এর ফরমুলা :—

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-\left(\frac{a-b}{2}\right)^2=ab$$

বর্গমূল নির্ণয়ের মধ্যে

যখন $m=a^2+r$, তখন $\sqrt{m}=a+r/(2a+1)$;

যখন $r=$ অথবা $<a$ তখন $\sqrt{m}=a+r/2a$

যখন $r<(2a+1)$, তখন $\sqrt{(a^2+r)}\sim a+r/(2a+1)$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় প্রসঙ্গে Surd number

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

প্রভৃতি আলকারখির উদ্ভাবিত। শেষোক্তটিতে অবশ্য গ্রীক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ বর্গমূল নির্ণয় প্রণালীর

কথা বাদ দিলে অন্যগুলো—r যেখানে a এর সমান বা a র চেয়ে ছোট সেখানে m নির্ণয় করবার প্রণালীকে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রণালীও বলা চলে। উন্নত বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিতেই এই সমস্যাগুলির বিশেষ দরকার দেখা দেয়। একাদশ শতাব্দীকে বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময়ে এই সমস্ত উন্নত পরিস্থিতির কল্পনা করা, উন্নত চিন্তানায়ক ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

"আল কাফি ফিল্ হিসাবে" ব্যবহৃত ও উল্লিখিত সমস্ত নিয়মাবলীর পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে কিছু কিছু উল্লেখ করেই এ বিষয় শেষ করা যাবে। Arithmetical Progression এবং Geometrical progression সম্বন্ধেও আলকারখি তাঁর পুস্তকে আলোচনা করেছেন। যতদূর জানা যায় এ সম্বন্ধে তিনি সূত্রবদ্ধ কতকগুলি নিয়মও উদ্ভাবন করেছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর (series) যোগফল নির্ণয় করবার সুন্দর প্রণালীও "কাফি ফিল্ হিসাবে" সমাবিষ্ট হয়েছে। Summation of power series বা একই শক্তির ক্রমিক সংখ্যা রাশির যোগফল নির্ণয় ব্যাপারে আলকারখি শুধু আরবীয়দের মধ্যেই সর্বপ্রথম নন, এদিকে তাঁকে সর্বাগ্রগণ্যও বলা চলে। তাঁর নির্ণীত ফল এখনও সঠিক বলেই বিবেচিত হয়। আজকালকার সংখ্যা লিখন অনুসারে এ দাঁড়াবে

$$1^3+2^3+3^3........=(1+2+3........)^2$$

$$1^2+2^2+3^2+n^2=(1+2+3........)\frac{2n+1}{3}$$

সংখ্যার উন্নতধারা (Higher series) অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পাঠ্য। উন্নততর ভাবধারার কথা বিবেচনা করেই এগুলোকে নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই Higher series-এও আলকারখির হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। এ হস্তক্ষেপ আনাড়ীর হস্তক্ষেপ নয় এতে সুকৌশলী বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান জ্ঞানই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রবর্তিত Higher serics এর নিয়মাবলী বর্তমানে প্রচলিত আঙ্কিক চিহ্ন অনুসারে দাঁড়ায়

$$\sum^{10} 1 \qquad 10 \times (10+1) \times \left(\frac{10}{3} + \frac{1}{6}\right) = 385$$

$$\sum n \qquad \left.\sum^{10} n \right|$$

$$\sum_{1}^{n} i^{2} = \sum_{1}^{n} i \quad \frac{2n+1}{3}$$

$$\sum_{1}^{n} i^{3} = \left[\sum_{1}^{n} i\right]^{2}$$

শুধু অঙ্ক দিয়েই নয় জ্যামিতির সাহায্যেও তিনি এগুলোর সমাধান করেছেন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ওয়াফার মত আলকারখিও কুত্রাপি ভারতীয় সংখ্যাপদ্ধতি

ব্যবহার করেন নাই ; তিনি সমস্ত সংখ্যা ও অঙ্ক অক্ষরে লিখে প্রকাশ করেছেন। এ ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়কর। অন্যান্য আরব বৈজ্ঞানিকগণ যখন ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তখন আবুলওয়াফা ও আলকারখির মত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ কেন যে সে পদ্ধতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অন্য পথে চললেন সে বোঝা খুবই দুষ্কর। ক্যাণ্টরের মতে সেই সময়ে আরব বৈজ্ঞানিকগণের দুইটি বিভিন্ন দল ছিল। একদল গ্রীক প্রথাকে অনুসরণ করে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা চালাতেন, অন্য দল ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। সত্যি সত্যিই এমনি দুইটি বিভিন্ন দল ছিল কিনা তার প্রামান্য কোন সাক্ষ্যই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবুও মনে হয় এ ধারণার মূলে অনেকটা সত্য নিহিত আছে। তবে শুধু আবুলওয়াফা ও আলকারখিই নন, তাঁদের অনেক পরে, যখন ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি বিজ্ঞান মহলে গৃহীত হয়ে গেছে বলা চলে তখনও সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস অনেক সময় অক্ষরের দ্বারাই সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। এ থেকেই স্বতই ধারণা হয়, হয়ত নিজেদের অঙ্কগুলি যাতে পরে ভ্রম প্রমাদের মধ্যে না পড়ে সে জন্যেও বৈজ্ঞানিকগণ এমনি সংখ্যা ব্যবহার না করে অক্ষর ব্যবহার করে থাকবেন।

"আল কাফি ফিল্ হিসাব" ছাড়া যে পুস্তকখানি আলকারখিকে শ্রেষ্ঠতম অঙ্কশাস্ত্রবিদদের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে হোল তাঁর বীজগণিত গ্রন্থ "আলফাখ্রি"। আলখারেজিমির

"আলজাবর ওয়াল মুকাবেলা" গ্রন্থের পরে বীজগণিতে আর কোন গ্রন্থের এমন প্রভাব দেখা যায় না। অনেকের মতে বীজগণিতের অধুনিক নাম "Algebra" হওয়া অনেকটা কাল ও স্থানের পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করেছিল। ইউরোপীয় অনুবাদকদের হাতে এসে পড়ে প্রথম আলখারেজিমির "আলজাবর ওয়াল মুকাবেলা" গ্রন্থখানি এবং এইখানিই লাটিন ভাষায় প্রথম অনুদিত হয়। এই অনুবাদে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদের এর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁরা এ নিয়েই মেতে থাকেন। আলকাখ্রির প্রতি আর কারুর দৃষ্টি পড়ে নি, এটি অনেকদিনই ইউরোপে অজ্ঞাত থেকে যায় ফলে বীজগণিতের Algebra নামই প্রচলিত হয়ে পড়ে। বস্তুত আলকাখ্রির যদি কোন ক্রমে "আলজাবর ওয়াল মুকাবেলার" পূর্বে বা সমসময়েই অনুদিত হোত, তা হোলে ইউরোপীয়ানরা বীজগণিতকে "কাখ্রি" নামেই অভিহিত করতেন এবং সেই নামই প্রচলিত হয়ে পড়ত। হয়ত আজ আমরা যাকে Algebra বলে অভিহিত করছি তাকে আলকাখ্রি নামেই অভিহিত করতুম।

গ্রন্থখানি বিজ্ঞানের দিক থেকে উন্নত চিন্তার পরিচায়ক হোলেও এর নামকরণে গ্রন্থকার বিজ্ঞানের চেয়ে হৃদয়ের প্রবৃত্তিরই বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসাবে বৈজ্ঞানিক নামই এর বেশী উপযোগী হোত কিন্তু তা হয় নি। বোধ হয় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপই গ্রন্থখানির নামকরণ হয়। এই সময়

মন্ত্রী ছিলেন আবুগালিব মোহাম্মদ ইবনে খালাফ ফখ্রুল্ মুল্ক। হয়ত তাঁরই চেষ্টায় এবং অনুগ্রহে, আলকারখি তাঁর এই গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হন এবং ঐ স্মরণীয় কার্যের স্মরণার্থেই গালেবের জনসাধারণে প্রচলিত "ফখ্রুল মুল্ক্" নামের প্রথম অংশ বীজগণিতের নামকরণে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থের ভূমিকাতেই গ্রন্থকর্তা তাঁর কৃতজ্ঞতা ভাল করে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথম পৃষ্ঠায়ই রচয়িতা তাঁর কার্যের বিলম্বের কৈফিয়ত স্বরূপ সাধারণের অত্যাচার ও অনাচারের কথা উল্লেখ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে খোদার অপার মহিমায় যে তিনি তৎকালীন রাজকর্মচারীদের মধ্যে পূর্ণ ভদ্রলোক, মহামহিমান্বিত মন্ত্রী আবুগালিবের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছেন সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন।

আলকাফি ফিল্ হিসাবের মত আলফাখরিতেও প্রথমে তৎকালীন প্রচলিত বীজগণিতিক চিহ্ন সমূহ, তাদের ব্যাখ্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের অনুশীলনের সমাধান, বিশ্লেষণ (analysis) প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণ (Quadratic Equation) নূতন আকারেও যে চলতে পারে সে হিসাবে $x^4+5x^2=156$ প্রভৃতি অনুশীলনের সমাবেশ গ্রন্থকারের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের মত তৃতীয় মাত্রার সমীকরণ প্রভৃতির সমাধানেও আলকারখির বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। আলখারেজিমির মত তিনিও বীজগণিতিক সমাধানে জ্যামিতির সাহায্য নিয়েছেন এবং সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে

সমাধানগুলি সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য করে তুলেছেন। তবে শুধু জ্যামিতিক সমাধান দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েও যে এগুলোর সমাধান হতে পারে সেও সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান প্রচলিত চিহ্নগুলি ব্যবহার করলে আলফাখরির Quadratic Equation এর সমাধানের রূপ দাঁড়াবে

$$ax^2+bx=c$$

$$x=[\sqrt{(\tfrac{b}{2})^2+ac}-b/2]\div a$$

বীজগণিতের অঙ্কের সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলির শক্তি (powers of the unknown quantity) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের সমাধানও জটিল হয়ে উঠে। তা ছাড়া যেখানে দুই তিনটি অনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে এবং তাদের শক্তির বহরও বেশী, সেখানে সমাধান হয়ে উঠে জটিল হতে জটিলতর। আলকারখি এই জটিলতর সমস্যাগুলির বেশ সহজ সুন্দর সমাধান করে বীজগণিতকে উন্নত স্তরে উন্নীত করেছেন। আলফাখরিতে যে সমস্ত বীজগণিতিক সমস্যার উদ্ভাবনা ও সমাধান হয়েছে তার সবগুলোই প্রামাণ্য এবং আধুনিক Algebra-তেও প্রচলিত।* আলকারখি যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার কতকগুলো বর্তমানে প্রচলিত চিহ্নসংযোগে উধৃত করা গেল।

* [Fakhri contains various problems which form part of the general stock materials of Algebra—History of Mathematics. Smith, Vol. II, P. 382.]

যেমন
$$x^3+y^3=z^2$$
$$x^2-y^2=z^3$$
$$x^2y^3=z^2$$
$$x^3+10^2=y^2$$

সমীকরণগুলির পূর্ণ সংখ্যায় x, y, z এর মান বের করা

এবং
$$x^2-y^3=z^2$$
$$x^3+y^2=z^2$$

সমীকরণগুলির ভগ্নাংশে x, y, z এর মান বের করা

এর সবগুলোই যে বীজগণিতের উন্নত স্তরের সমস্যা আধুনিক অঙ্কশাস্ত্র আলোচনাকারিগণ সে কথা নির্বিবাদেই স্বীকার করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে $x^{2n}+ax^n=b$ শ্রেণীর সমীকরণের n এর বহু উর্ধতন মূল্য বিশিষ্ট অনেক সমীকরণের সমাধানই তাঁর হাতে হয়েছে। তিনি প্রত্যেক দ্বিমাত্রিক সমীকরণের দুইটি করে সমাধান বের করেছেন, তবে Negative ফলের দিকে আলখারেজ্মির মত তাঁরও খেয়াল ছিল না। উর্ধতন শক্তির সমীকরণগুলিকে দ্বিমাত্রিক সমীকরণে পরিণত করাও তাঁর অন্যতম কাজ। ডাওফেন্টের নামে যে সমীকরণটি প্রচলিত আছে সেটিরও তিনি সমাধান করেন, তবে শুধু এই একটি সমীকরণেই তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ রয়নি তিনি অনুরূপ আরও পঁচিশটি সমস্যার উদ্ভাবনা ও সমাধান করেন।* আজকাল অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে যেমন সাধারণত x ধরে নেওয়া হয় পূর্বে

* Introduction to the History of Science, Sarton, Vol. I, P. 719.

অনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য তেমন কোন সর্ববাদীসম্মত চিহ্ন প্রবর্তিত ছিল না। যাঁর যেমন খুসী তিনি তেমনিই চিহ্নাদি ব্যবহার করতেন। গ্রীক বৈজ্ঞানিক ডাওফেন্ট গ্রীক অক্ষর s এর উপর একটি চিহ্ন (ś,) বা একটি বিন্দু ও চিহ্ন (ś°) ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করতেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বাখসালী (Bakhshali) সাধারণত (i) লম্ব লাইনের উপর একটি বিন্দু দিয়ে অনির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য ব্যবহার করতেন, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর কিন্তু কোন একটি চিহ্নের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ না রেখে নানা বর্ণের আশ্রয় নেন। তাঁরা সাধারণত বর্ণের নামের প্রথম অক্ষর ব্যবহার করতেন—যেমন কা—কাল দ্বিতীয় অনির্দিষ্ট সংখ্যা, নী—নীল তৃতীয় অনির্দিষ্ট সংখ্যা, পী—পীত চতুর্থ অনির্দিষ্ট সংখ্যা, পা—পাণ্ডু পঞ্চম অনির্দিষ্ট সংখ্যা, লো—লোহিত ষষ্ঠ অনির্দিষ্ট সংখ্যা, য্যা—(yavat Tavat) প্রথম অনির্দিষ্ট সংখ্যা। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত মিশরীয় বৈজ্ঞানিক আবু কামিল অনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার নাম ব্যবহার করেন। আলকারখি কিন্তু এর কোনটিকেই গ্রহণ করেন নি। তিনি অনির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য কোন চিহ্নই ব্যবহার করেন নি। এমনি তাঁর গণিতের মধ্যে সংখ্যা ব্যবহার না করে যেমন শব্দের সাহায্য নিয়েছেন, এখানেও সেই পন্থাই অবলম্বন করেন। তবে প্রথম অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে "বস্তু" এবং দ্বিতীয় অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে "পরিমাপ বা অংশ" বলে ব্যবহার করেছেন।*

* History of Mathematical Notations, Cajori P. 379.

বীজগণিতিক পুরণে সংখ্যাগুলির শক্তির যোগ (in multiplications powers are added) বীজগণিতের সর্ব প্রথম সংজ্ঞা। সমস্ত বীজগণিত এই সংজ্ঞার উপরেই নির্ভর করে বলা চলে। গ্রীক বৈজ্ঞানিক ডাওফেণ্টই সর্বপ্রথম এ প্রথা প্রচলন করেন বলা যেতে পারে। তবে এর জন্যে তিনি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করেন নাই এবং বীজগণিতেও এ সমাদর লাভ করেন নাই। তাঁর পরবর্তী আর কোম বৈজ্ঞানিকই এ প্রথাকে আমল দেন নাই। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু শক্তির সমষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা সংখ্যার পুরণের সঙ্গে সঙ্গে, শক্তিরও পুরণ হয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে কোন সংখ্যার ঘনকে সেই সংখ্যার বর্গ দিয়ে পুরণ করলে ফলটি সেই সংখ্যার পঞ্চম শক্তি না হয়ে ষষ্ঠ শক্তিই হবে। আজকালকার প্রচলিত চিহ্ন দিয়ে ব্যক্ত করলে এ দাঁড়ায় $x^3 \times x^2 = x^6$ তেমনি $x^3 \times x^3 = x^9$ কিন্তু বীজগণিতিক নিয়ম অনুসারে এগুলি হওয়া উচিত x^5 এবং x^6। শুধু বিজ্ঞানের প্রারম্ভেই নয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও ভাস্কর এই প্রথাই অবলম্বন করেছেন। আলকারখির পূর্ববর্তী মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের মত শক্তির পুরণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মতই তাঁদের প্রণীত বীজগণিতে প্রচলন করে গেছেন। আলকারখি এই প্রচলিত মতবাদ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজস্বভাবেই শক্তির যোগ হওয়াকেই বৈজ্ঞানিক সত্য বলে সিদ্ধান্ত করেন এবং সেই প্রথাই ফাখরিতে

প্রচলন করেন। ফাখরিতে "মাল" x^2 এর প্রতিশব্দ হিসাবে এবং "কাব" x^3 এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে হিসাবে মাল মাল $(x^2 \times x^2) = x^4$ অবশ্য মালে মালে শক্তির যোগ বা পুরণে কোন পার্থক্য হয় না, কিন্তু এ পার্থক্য ফুটে উঠবে "মাল কাবে।" পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের মতানুসারে "মাল কাব" $(x^2 \times x^3)$ হওয়া উচিত x^6, অধুনাতম মতবাদে x^5, আলকারখিও মাল কাবকে x^5 হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তেমনি কাব কাব $(x^3 \times x^3) = x^6$ এবং মাল মাল কাব $(x^2 \times x^2 \times x^3) = x^7$ হিসাবেই তাঁর গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে x^9 এবং x^{12} হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। আলখারেজিমি প্রথমে root এর প্রতিশব্দে "জিদর" এবং বর্গের (square) প্রতিশব্দে "মাল" শব্দ ব্যবহার সুরু করেন। সাধারণত জিদর ج অক্ষর দ্বারা লিখিত হোত। আলফাখরিতে ত্রিমাত্রিক শক্তির (cube) প্রতিশব্দ হিসাবে "কাব" ব্যবহৃত হয়েছে। হয়ত বর্তমানের cube শব্দটি, আলফাখরির "কাব" এরই বৈদেশিক রূপান্তর। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আলখারেজিমির সময় থেকে "মাল" দ্বিমাত্রিক শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হোলেও কোন কোন আরব বৈজ্ঞানিক শুধু একক শক্তি হিসাবেও এর ব্যবহার করেছেন। ক্যাণ্টর (Cantor)ই আরব বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেকার এই দ্ব্যর্থবোধকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই দ্ব্যর্থবোধকতা পরবর্তী ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে পড়ে। কারণ অবশ্য অন্ধ অনুকরণ ছাড়া

আর কিছুই নয়। এই অন্ধ অনুকরণের ফলেই লাটিন গ্রন্থ সমূহেও এই দ্ব্যর্থবোধকতা স্থান পায়। লাটিনে "মাল" এর প্রতিশব্দ হোল census. এই census কোন কোন সময়ে শুধু x এর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যা হোক কোন একটি প্রচলিত মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নিজস্ব একটি মতবাদকে ব্যবহার করা শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। সে হিসাবে আলকারখির স্থান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক উচ্চে বলেই স্বীকার করতে হবে।

আলকারখি ছোট ছোট সংখ্যাগুলির বর্গমূল বের না করে সাধারণত এমনি সেগুলো ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অন্যতম জটিল বিষয় Indeterminate analysis এবং Indeterminate equation সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করেছেন। Indeterminate equation এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায় আর্কিমেডিসের Cattle problem বা পশুগণনায়। সমস্যাটি বেশ মজার। এখানে উল্লেখ করা গেল।

সূর্যের বিভিন্ন রংএর কতকগুলি বলদ এবং গাভী ছিল, গাভীগুলির মধ্যে সাদা গাভীর সংখ্যা, কাল বলদ এবং কাল গাভীর সংখ্যার $(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$ অংশের সমান, সাদা বলদের সংখ্যা, কাল বলদের সংখ্যার $(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})$ অংশ এবং ধূসর বর্ণের বলদের সংখ্যার সমষ্টির সমান। কাল বলদের সংখ্যা, ধূসর বর্ণের বলদ এবং চিত্রবিচিত্র বর্ণের বলদের সংখ্যার $(\frac{1}{4}+\frac{1}{5})$ অংশের সমষ্টির সমান, চিত্রবিচিত্র বর্ণের বলদের সংখ্যা সাদা বলদের সংখ্যার

$(\frac{1}{6}+\frac{1}{7})$ অংশ এবং ধূসর বর্ণের বলদের সংখ্যার সমষ্টির সমান। কাল গাভীর সংখ্যা চিত্র বিচিত্র বর্ণের বলদ এবং গাভীর $(\frac{1}{4}+\frac{1}{5})$ অংশের সমান, চিত্র বিচিত্রবর্ণের গাভীর সংখ্যা ধূসরবর্ণের গাভীর এবং বলদের $(\frac{1}{5}+\frac{1}{6})$ অংশের সমান, ধূসর বর্ণের গাভীর সংখ্যা সাদা বলদ এবং সাদা গাভীর সংখ্যার $(\frac{1}{6}+\frac{1}{7})$ অংশের সমান, সাদা বলদ এবং কাল বলদের সংখ্যা হবে একটা বর্গ, ধূসর এবং চিত্রবিচিত্র বর্ণের বলদের সংখ্যা হবে একটা Triangular number। বিভিন্ন রং-এর বলদ এবং গাভীর সংখ্যা বের করতে হবে। যদি সাদা বলদকে W, কাল বলদকে X, ধূসর বলদকে Y, এবং চিত্রবিচিত্র বর্ণের বলদকে Z, এবং সাদা গাভীকে w, কাল গাভীকে x, ধূসর গাভীকে y ও চিত্রবিচিত্র বর্ণের গাভীকে z ধরা হয় তা হোলে অঙ্কটি দাঁড়ায়

$$W=(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3})\,X+Y \qquad X=(\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{5})\,Z+Y$$

$$Z=(\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{7})\,W+Y \qquad w=(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{4})\,(X+x)$$

$$x=(\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{5})\,(Z+z) \qquad z=(\tfrac{1}{5}+\tfrac{1}{6})\,(Y+y)$$

$$y=(\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{7})\,(W+w) \qquad W+X=n^2$$

$$Y+Z=\frac{m^2+m}{2}$$

তবে ডাওফেন্টই এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনার উদ্ভব করেন বলা যেতে পারে। তিনি কিন্তু এই সমীকরণগুলির সমাধান করতে অখণ্ড সংখ্যা না নিয়ে শুধু মূলদ (rational) সংখ্যা ব্যবহার করেছেন কুত্রাপি negative সংখ্যা ব্যবহার

করেন নি। এই মূলদ সংখ্যা p/q আকারের, কিন্তু p এবং q দুইই positive সংখ্যা। যতদূর বোঝা যায় ডাওফেন্ট এদিকে সাধারণ নিয়ম মেনে চলবার প্রয়াস করেন নি। তিনি শুধু কতকগুলি বিশেষ সমস্যা নিয়ে সুচতুরভাবে সেগুলোর সমাধান করেই বিষয়টি শেষ করে দিয়েছেন।* আলকারখিই সর্বপ্রথম এই জটিল বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। এগুলির সমাধানে তিনি অখণ্ড সংখ্যা এবং ভগ্নাংশও ব্যবহার করেছেন তবে এতে তিনি অমূলদ (irrational) সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে গিয়েছেন। এ বাদ দেওয়ার কোন কারণ বোঝা যায় না। অমূলদ সংখ্যা নিয়ে এমনিতে তিনি অনেক আলোচনাও করেছেন। $mx^2+nx+p=y^2$ এই ধরণের Indeterminate equation এর সমাধান করতে তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে এতে m বা p অবশ্য একটা বর্গ হবে। তা ছাড়া yএর বদলে তিনি $\sqrt{mx^2}$ বা $\sqrt{p}$ ধরণের binomial সংখ্যা ব্যবহার করে তার সমাধানেও অগ্রসর হয়েছেন। এ অবশ্য ডাওফেন্টের অনুসরণ করেই। যতদূর জানা যায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আর্যভট্ট Indeterminate equation নিয়ে প্রথম কিছু আলোচনা করেন তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

Indeterminate সমীকরণে অমূলদ সংখ্যা ব্যবহার না করলেও surd এর যোগ বিয়োগ আলকারখির হাত এড়িয়ে

* History of Mathematics, Fink, P. 84.

যায় নি। তিনি যোগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে $\sqrt{8}+\sqrt{18}=\sqrt{50}$ তাঁর অন্যতম অঙ্ক $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{16}$ বেশ উপভোগ্য।

জ্যামিতির দিকে আলকারখি বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তবে ত্রিভূজের পরিমাপ করবার জন্য surd ব্যবহার করে একটি ফরমূলার প্রবর্তন করেন। এই ফরমূলা অনুসারে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল হোল $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c}$ এটি তার স্বপ্রবর্তিত, কিম্বা তিনি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ করে তঁাদের প্রবর্তিত ফরমূলাকে জাগিয়ে তুলে পুনরায় অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্থান দেন সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। সাধারণত ফরমুলাটি হীরোনের ফরমূলা নামে পরিচিত। কিন্তু সত্যি সত্যিই এটি হীরোনের উদ্ভাবিত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যতদূর মনে হয় এটি আর্কিমেডিসের প্রবর্তিত হওয়াই বেশী সম্ভব। স্মিথের মতে আলকারখি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ করেছেন তাঁর অঙ্কশাস্ত্র আলোচনায়।* স্মিথের কথা সত্য হোলে ফরমুলাটিকে আলকারখির স্বপ্রবর্তিত বলেই মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু ক্যাণ্টর এর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁর মতে আলকারখি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদেরই অনুসরণ করেন। সে হিসাবে এই আরব বৈজ্ঞানিকের জ্যামিতির আলোচনার উপর হীরোনের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। এই উভয় মতের কোনটি সত্য সে সঠিক নির্ণয় করবার উপায় নেই। যদি আলকারখির সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যেত তা হোলে এর

* History of Mathematics, Smith, Vol. I, p. 283.

মীমাংসাও সম্ভবপর হোত। হয়ত তিনি কোন বিশিষ্ট মতবাদকেই অনুসরণ করেন নাই। যেটিকে যেখানে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেছেন সে জায়গায় সেইটেই আঁকড়ে ধরেছেন।

একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে আলকারখির সমসাময়িক অন্যান্য অঙ্কশাস্ত্রবিদদের মধ্যে আবুল জুদ, হামিদ ইবনে আলখিদর, মনস্থর ইবনে আলি, আন্‌নাসাভি, আলহাজেন সমধিক বিখ্যাত। আলহাজেন প্রথমে বসরাতে বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর অলৌকিক বিজ্ঞান প্রতিভার খ্যাতি তৎকালীন মিশরের ফাতেমীয় খলিফাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি মিশরে নিমন্ত্রিত হন। নীলনদের বাৎসরিক জলপ্লাবনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি মিশরেই অতিবাহিত করেন, তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার পূর্ণ বিকাশও মিশরেই হয়। মিশরের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গেই আলহাজেনের আলোচনা করা যাবে।

আবুল জুদ

আবুল জুদ একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লোক। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ এবনোল্ লায়ছোচ্ছানী আবুল জুদ। তাঁর জন্মমৃত্যুর বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে সে সময়ে অন্যতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন সে স্পষ্ট বোঝা যায় পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে তাঁর

উল্লেখেই। এর মধ্যে বিখ্যাত কবি বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়ামের বীজগণিতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবুল ওয়াফার এবং আলকারখির সমসাময়িকতার জন্যেই আবুল জুদের নিজস্ব মৌলিকতার কথা অনেকটা চাপা পড়ে গেছে বলা যেতে পারে; অন্তত তখনকার প্রচলিত লোকপ্রিয় অঙ্কশাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বীজগণিতে। তিনি প্রধানত জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করেন। আবু কামিলের অনুসৃত পন্থায় তিনিও বহুভূজের নানারূপ সমস্যা ও সমাধান জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত করে তোলেন। বহুভূজের মধ্যে সপ্তভূজ এবং নবভূজই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী করে এবং এইগুলি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাও বিস্তারিত আকার ধারণ করে। এর মধ্যে সুষম সপ্তভূজের (Regular Heptagon) বাহুর পরিমাণ নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে $x^3-x^2-2x+1=0$ এমনি একটি সমীকরণের সমাধান দরকার। আবুল জুদের পূর্বে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে নানা আলোচনা করলেও এর সঠিক সমাধান হয়ে উঠে নাই। আবুল জুদই সর্বপ্রথম এই সমীকরণটির সমাধান করে সুষম সপ্তভূজের বাহুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এমনি বহুভূজের আলোচনা ছাড়া অন্য যে সমস্যাটি নিয়ে তিনি বেশী আলোচনা করেছিলেন সে হোল কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা। এই বিষয়ে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের নিষ্ফলতার ইতিহাস তাকে দমিয়ে দেয় নি বরং তাঁর গবেষণা উদ্‌ভ্রান্ত অন্তঃকরণকে আরও উদ্দীপ্ত করে

তোলে। এ শুধু তাঁর পূর্ণ বৈজ্ঞানিকমন বলেই সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি কনিকসের (Conics) সাহায্যে এর সমাধান করেন। প্যারাবোলা (Parabola) এবং সমবাহু হাইপারবোলার (Equilateral Hyperbola) ছেদন দ্বারাই সমস্যাটির সমাধান হয়।*

জ্যামিতি নিয়েই বেশীর ভাগ আলোচনা করলেও অঙ্কের অন্যান্য শাখাকে যে তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নাই সে বোঝা যায় তাঁর বীজগণিতে হস্তক্ষেপ থেকেই। তিনি প্রথমত বিভিন্ন মাত্রার সমীকরণগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন এবং কনিক্‌সের সাহায্যে সেগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করেন। এগুলির মধ্যে তৃতীয় মাত্রা এবং চতুর্থ মাত্রা সমীকরণের সমাধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান এর পূর্বেই হয়ে গেছে ; চতুর্থ মাত্রার সমীকরণগুলিও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়ায় নেই কিন্তু আবুলজুদের বিশেষত্ব হোল কনিকস্ এর সাহায্যে এগুলির সমাধান। ওমর খৈয়ামের বীজগণিতে আবুল জুদের বহু উল্লেখ দেখা যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থের সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদে আবুল জুদের কতকগুলি কার্যের সমালোচনা করেছেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের বৈজ্ঞানিক হোলেও যাঁর কাজের সমালোচনা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কর্তব্যে পরিগণিত হয়, তিনি যে নিতান্ত সাধারণ বৈজ্ঞানিক

* A History of Mathematics, F. Cajori, P. 111.

ছিলেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। ওমর খৈয়ামের সমালোচনা এখানে উধৃত করা গেল :—

আমার এই গ্রন্থখানি (বীজগণিত) লেখার পাঁচ বৎসর পরে আমাকে জ্যামিতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ নন এমনি কোন এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে প্রসিদ্ধ জ্যামিতিক আবুল জুদ মোহাম্মদ এবনোল্ লায়েছ (খোদা তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন) এই শ্রেণীর সমস্যাকে কনিক্সের সাহায্যে সমাধান করে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তবে তিনি এতে সব শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন নাই কিম্বা সম্ভব ও অসম্ভব সমস্যার মধ্যেও পার্থক্য দেখিয়ে দেন নাই, শুধু কয়েকটি শ্রেণীকে কেন্দ্র করে সেই ধরণের সমস্যাগুলিরই সমাধান করেছেন। কথাগুলো আমার অসত্য বলে মনে হয় না, কেননা আমি যে দুই শ্রেণীর সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি এর এক শ্রেণী নিয়ে আমার বহুপূর্বে অন্য একজন বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন এই শ্রেণীর সমস্যাও আবুল জুদের গ্রন্থের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি হোল ত্রৈমাত্রিক সমীকরণ। এই ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের একটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। সমস্যাটি হোল একটি ঘন এবং একটি সংখ্যা কতকগুলি বর্গের সমান ($x^3+a=cx^2$) এই সমীকরণ নানা ধরণের হতে পারে। আমার গ্রন্থে আমি সে বিষয়ে বহু উদাহরণ দিয়েছি। যা হোক আবুল জুদ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এর অবস্থার কথা উল্লেখ করেন নাই বরং তিনি একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে

ঘনক্ষেত্রের (Cube) একটি বাহু যদি কোন প্রদত্ত সংখ্যার সমান কিন্তু বর্গের সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হয় তা হোলে সে সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে আসলে তা ঠিক নয়। এমনি ধরণের সমস্যায় যে তুইটি কনিক্স্ একটি বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে বা ছেদ করতে পারে সে কথা তিনি ভাবেন নাই এবং তাতেই এই ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় সমস্যা হোল, একটি ঘন ক্ষেত্র (Cube) একটি সংখ্যা এবং বাহুর বর্গগুলির সমান। আবুল জুদের পূর্বে অনেক বৈজ্ঞানিকই এই ধরণের সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন; কিন্তু কেউই সমাধান করে উঠতে পারেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম এর সমাধান করেন তবে তিনি শুধু আংশিক সমাধান করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এই শ্রেণীর সমীকরণে বহু প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তাদের অনেকগুলির কোন সমাধানই হতে পারে না। তিনি সমস্তগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। যদি কেউ আমার এই গ্রন্থ এবং তাঁর গ্রন্থ এক সঙ্গে পাঠ করেন, তা হোলে তিনি যাতে এগুলি ঠিক ভাবে ধরতে পারেন সেই জন্যেই আমি এ বিষয়ের উল্লেখ করছি। অবশ্য এই সুপ্রসিদ্ধ জ্যামিতিকের সম্বন্ধে আমার কাছে যা বলা হয়েছে সে যদি সত্য হয়।

বস্তুত আমার বিশ্বাস আমার আলোচনাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে আমি কোন ত্রুটিই করি নাই, তবে বিরক্তির ভয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা বাদ দিয়েছি। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক শ্রেণীর সমস্যার নানা উদাহরণ দিতে পারতুম কিন্তু

দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে দিলুম না। আমি এগুলোকে সাধারণ থিওরির (theory) মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। ছাত্রেরা আপন বুদ্ধি দ্বারা নিজেরাই বিস্তারিত ঠিক করে নেবে। যে আমার এই গ্রন্থ ঠিক মত বুঝতে পারবে তার পক্ষে যুক্তিতর্কদ্বারা অন্যগুলো বের করে নেওয়া কঠিন হবে না।

আমাদের একজন বন্ধু প্রস্তাব করেছেন যে আমরা যেন আবুল জুদের ভুল দেখিয়ে দিয়ে সঠিক সমাধান সাধারণে প্রকাশ করে দেই। সমস্যাটি হোল একটি ঘন ক্ষেত্র (cube) এবং একটি সংখ্যা কতকগুলো বর্গের সমান ($x^3+a=cx^2$) আবুল জুদ যে ভাবে এর সমাধান করেছেন সে এখানে দেওয়া গেল। বর্গের সংখ্যা যেন AB লাইনের সমান। AB থেকে প্রদত্ত সংখ্যার সমপরিমাণ ঘনক্ষেত্রের বাহুর সমান করে BC অংশ কেটে নেওয়া যাক। এখন BC হয় CA এর সমান হবে অথবা CA থেকে বড় বা ছোট হবে। BC যদি CAর সমান হয় তা হোলে BCর উপর CE আয়তক্ষেত্রটি অঙ্কন করে নেওয়া যাক। তা হোলে AB ও BE asymptote সম্পন্ন হাইপারবোলা D বিন্দু দিয়ে যাবে। A বিন্দুকে শীর্ষবিন্দু করে এবং ABএর উপর axis নিয়ে BCএর সমান প্যারামেটার সম্পন্ন একটি প্যারাবোলা অঙ্কন করা যাক। এটি যেমন দেখান হয়েছে, D বিন্দু দিয়ে যাবে।
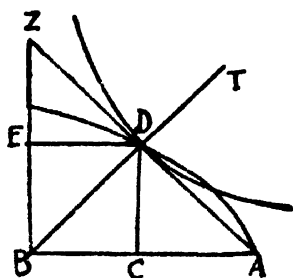
আবুল জুদের মতে এই দুইটি কনিক্‌স্‌ D বিন্দুতে স্পর্শ করবে কিন্তু এইটি হোল ভুল। এরা D বিন্দুতে স্পর্শ করবে না বরং পরস্পরকে ছেদ করবে। রীতিমত উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝা যাবে।

BZ কে BA এর সমান করে নেওয়া যাক। AZ যোগ কর। এই রেখাটিও D বিন্দু দিয়ে যাবে এবং প্যারাবোলার মধ্যেই অবস্থিত থাকবে। ADB কোণটি হবে এক সমকোণ, এবং ABD কোণ ZBD কোণের সমান হবে। কিন্তু পূর্বেই জানা আছে যে হাইপারবেলোর axis, তার asymptote এর মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। অতএব BDT রেখাটি যে হাইপারবোলা D বিন্দু দিয়ে যায় তারই axis কিন্তু AD রেখাটি হাইপারবোলার ordinate এর সমান্তর; অতএব প্যারাবোলার ট্যানজেণ্ট হবে। এ থেকে আপনিই দাঁড়িয়ে যায় যে, প্যারাবোলাটি হাইপারবোলাকে ছেদ করবে, কেননা হাইপারবোলা এবং হাইপারবোলার ট্যানজেণ্টের মধ্যে এর স্থান হতে পারে না। যদি প্যারাবোলাটি ট্যানজেণ্টকে শুধু স্পর্শ করে যায় তা হোলে D বিন্দু থেকে যে সমস্ত রেখা প্যারাবোলার AD arc এর উপরে টানা যাবে সেগুলি প্যারাবোলা এবং ট্যানজেণ্টের মধ্যে পড়বে। কিন্তু সে অসম্ভব। অতএব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে প্যারাবোলাটি হাইপারবোলাকে A এবং Dর মধ্যবর্তী অন্য কোন স্থানেও ছেদ করবে। এইই আমরা দেখাতে চেয়েছিলুম। সুবিখ্যাত জ্যামিতিক দুইটি

কনিক্‌স্ D বিন্দুতে স্পর্শ করার কথা বলে অন্য সম্ভাব্যটিকে দেখতে পান নি।

$$x^3 + a = cx^2$$

$$AB = c \qquad BC = a \qquad BC < AB$$

$BC =$ বা $>$ বা $< AC$,

অথবা $\sqrt[3]{a} =$ বা $>$ বা $< \frac{c}{2}$—BCDE Square

AB, BE যে Equilateral হাইপারবোলা D বিন্দু দিয়ে যায়, তার asymptotes.

যখন BC = AC. কনিক্‌স্ দুইটি D বিন্দুতে ছেদ করবে।

তার পরে তিনি যে বলেছেন যে যদি BC, CA এর থেকে বড় হয়, তা হোলে সমস্যাটির কোন সমাধানই হতে পারে না কেননা তখন কনিক্‌স্ দুইটি কোথাও ছেদ করবে না,—সেও ভুল। বরং কনিক্‌স্ দুইটি পূর্বে যেমন দেখিয়েছি তেমনি এক বা একাধিক বিন্দুতে স্পর্শ বা ছেদ করবে। সাধারণ ভাবে এর উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে।

AB কে বর্গের সংখ্যার সমান এবং BC কে ঘনক্ষেত্রের একটি বাহুর সমান করে নেওয়া যাক (ঘনক্ষেত্র অবশ্য প্রদত্ত সংখ্যার সমান) BC যেন ABর অর্ধেকের চেয়ে বড় হয়। CE আয়তক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ কর। তারপর পূর্বকার জ্ঞাত প্রণালীতে কনিক্‌স্
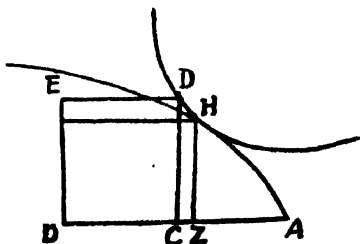
দুইটি অঙ্কন কর। AB কে দশ এবং ZB কে ছয় এর সমান করে নাও। তা হোলে ZB র বর্গের সঙ্গে ZA এর গুণ ফল হবে একশ চুয়াল্লিশ এইটি হোল প্রদত্ত সংখ্যা। অতএব BC, পাঁচ এর চেয়ে বেশী হবে কেন না BC হোল ঘন ক্ষেত্রটির একটি বাহু আর 5 এর ঘন হোল 125। যে ঘন বস্তুর (solid) তল হোল ZB বর্গ এবং উচ্চতা ZA, সেটি BC, ঘনক্ষেত্রের সমান। তা হোলে দাঁড়াচ্ছে যে তাদের তল, উচ্চতার বিপরীত অনুপাতিক (reciprocal proportion) হবে অর্থাৎ BCর সঙ্গে ZAর যে অনুপাত ZBর বর্গের সঙ্গে BCর বর্গেরও সেই অনুপাত। Z বিন্দুতে একটি লম্ব টান, লম্বটি হাইপার--বোলাকে H বিন্দুতে ছেদ করবে। এখন HB আয়তক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ কর। HB ক্ষেত্রটি CE আয়তক্ষেত্রের সমান হবে। অতএব তাদের বাহুগুলিও বিপরীত অনুপাতিক দাঁড়িয়ে যাবে অর্থাৎ BCর সঙ্গে ZHর যে অনুপাত ZBর সঙ্গে BCরও সেই অনুপাত। অতএব ZBর সঙ্গে ZHর যে অনুপাত, ZBর বর্গের সঙ্গে BC র বর্গেরও সেই অনুপাত। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে BCর সঙ্গে ZAর যে অনুপাত, ZBর বর্গের সঙ্গে BCর বর্গেরও সেই অনুপাত। অতএব BCর সঙ্গে ZAর যে অনুপাত ZBর সঙ্গে ZHরও সেই অনুপাত, এবং অন্য পক্ষে ZHর সঙ্গে ZAর যে অনুপাত ZBর সঙ্গে BCরও সেই অনুপাত। এথেকে আমরা পাচ্ছি যে ZB, BC, ZH, ZA রেখাগুলি continuous proportionএ বিদ্যমান এবং

ZHর বর্গ BC এবং ZAর গুণফলের সমান। কিন্তু Aকে শীর্ষবিন্দু এবং ABকে axis করে যে প্যারাবোলা অঙ্কিত হয়েছে BC তারই প্যারামিটার (parameter) তা হোলে ZH এই প্যারাবোলার ordinate দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং H বিন্দুটি সব সময়েই এই প্যারাবোলার উপরেই অবস্থিত থাকবে। কিন্তু H বিন্দুটি হাইপারবোলার উপরেও অবস্থিত। অতএব দুইটি কনিক্‌স্‌ পরস্পর ছেদ করবে এবং আবুলজুদ যে বলেছেন যে কনিক্‌স্‌ দুইটি পরস্পর ছেদ বা স্পর্শ করবে না সে ঠিক নয়।

$$BC > AC \quad \text{or} \quad BC > \frac{AB}{2}$$

$$AB = c = 10 \qquad ZB = x = 6$$

সমস্যাটি হোল $x^3 + a = cx^2$

$$\therefore \quad a = x^2(c - x) = ZB^2.\ ZA = 144$$

$$BC = \sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{144} > 5 \quad \text{or} \quad BC > \frac{AB}{2}$$

$BC^3 = ZB^2.\ ZA \ \therefore$ (1) $ZB^2 : BC^2 = BC : ZA$

যদি হাইপারবোলাটি Z থেকে অঙ্কিত লম্ব দ্বারা H বিন্দুতে ছেদিত হয় তা হোলে HB আয়তক্ষেত্র = EC বর্গক্ষেত্র।

$$ZB : BC = BC : ZH \quad (2)$$

$$ZB^2 : BC^2 = ZB : ZH \quad (3)$$

(1) এবং (3) থেকে $ZB : BC = ZH : ZA$ (4)

(2) এবং (4) থেকে $BC : ZH = ZH : ZA$ বা

$$ZH^2 = BC.\ ZA \quad (5)$$

(4) এবং (5) থেকে ZB : BC = BC : ZH = ZH : ZA.

(5) থেকে প্রমাণিত হয় যে যদিও $BC > \frac{AB}{2}$ বা BC > AC হয়েও থাকে, তবুও H বিন্দুটি প্যারাবোলার উপর অবস্থিত থাকবে। এই সমস্যাটির অন্য একটি positive root হোল

$$x = 2 + \sqrt{28}$$

ওমর খৈয়াম এখানেই ক্ষান্ত হন নি। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদে আবুল জুদের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়েও তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। মনে করা যাক্ AB যেন আশী, এবং BC যেন ঘনক্ষেত্রের একটি বাহু, ঘনক্ষেত্র একটি প্রদত্ত সংখ্যার সমান এবং BC হোল একচল্লিশ। অর্থাৎ BC, ACর চেয়ে বড়। যে প্যারাবোলাটি L বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে D বিন্দু তার বাইরে পড়বে অতএব LC রেখাটি হবে 1599 এর বর্গমূলের সমান অর্থাৎ 40 এর চেয়ে কম। এখন TC কে CB এবং BH কে BTর সমান করে নেওয়া যাক। TH যোগ করা যাক তা হোলে TH হাইপারবোলার ট্যানজেণ্ট হবে (আমরা পূর্বে যেমন দেখিয়েছি)। AC থেকে, ACর $\frac{1}{4}$ অংশের সমান করে AK অংশ লওয়া যাক্। Kর উপরে একটি লম্ব টানা যাক্। এই লম্বটি যেন প্যারাবোলাকে M বিন্দুতে ছেদ করে। এখন ACর সঙ্গে AKর যে অনুপাত LCর উপরিস্থ বর্গের সঙ্গে KMর উপরিস্থ বর্গেরও সেই অনুপাত

হবে কেননা লাইন দুইটি হাইপারবোলার ordinate. এপোলোনিয়াস তাঁর প্রথম পুস্তকে উনবিংশ উপপাদ্যে এ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। KM তা হোলে LCর অর্ধেক হবে
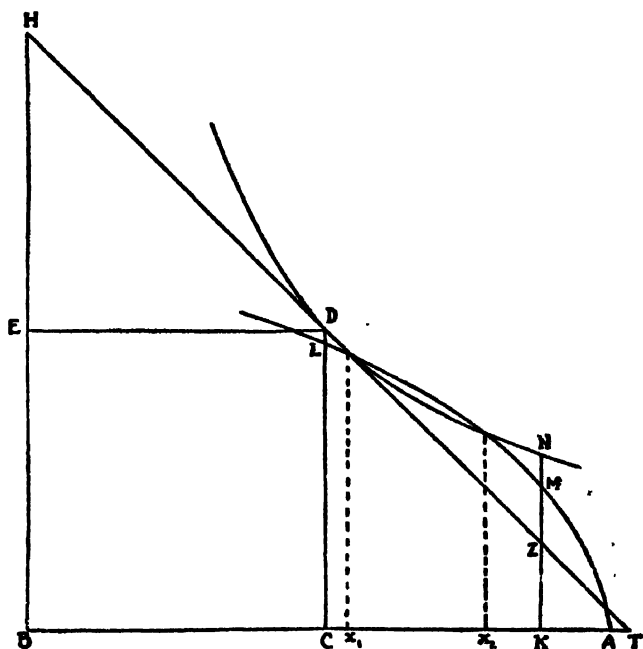
অর্থাৎ কুড়ির চেয়ে একটু কম হবে। কিন্তু CT হোল একচল্লিশ, AK হোল $9\frac{3}{4}$ এবং AT হোল 2 অতএব KZ হবে $11\frac{3}{4}$ কেননা HBর সঙ্গে BTর যে অনুপাত KZর এর সঙ্গে KTরও সেই অনুপাত। কিন্তু HB, BTর সমান অতএব ZM রেখাটি আটের চেয়ে বেশী হবে। এটি হোল কিন্তু ট্যানজেণ্ট থেকে হাইপারবোলার দূরত্ব গণনার ফল। তা হোলে দেখা যাচ্ছে যে

যদি BC, CA থেকে বড় হয় তা হোলে কনিকস দুইটি ছেদ নাও করতে পারে। কিন্তু সর্বদাই যে ঠিক এমনি হবে তেমন কোন কথাই নেই। এখানেও আবুল জুদ ভুল করেছেন। এইটি স্মরণ রেখে যত ইচ্ছা অঙ্ক করা যেতে পারে।

$AB = c = 80$; $BC = \sqrt[3]{a} = 41$;

$AC = AB - BC = 39, \; BC > AC$

$CD = BC$ তা হোলে $CD^2 > BC.\, AC.$

অতএব D প্যারাবোলার বাইরে অবস্থিত

$LC^2 = BC.\, AC = 1599, \quad LC = \sqrt[2]{1599} = 40 - e$

বা $e < \frac{1}{80}$

$TC = BC = 41, \quad AT = 2, \quad HB = BT$

$\therefore$ HT হাইপারবোলার ট্যানজেন্ট

$AK = \frac{AC}{4} = \frac{39}{4} = 9\frac{3}{4}$; MK, AKর উপর লম্ব

$LC^2 : MK^2 = AC : AK = 4, \quad MK = \frac{LC}{2}$

$= 20 - \acute{e}$ বা $\acute{e} \angle \frac{1}{160}$

$KZ : KT = HB : BT$

তা হোলে $KZ = KT = KA + AT = 11\frac{3}{4}$

$ZM = MK - KZ = 8\frac{1}{4} - \acute{e} \angle 8$

KM এর অনুরূপ হাইপারবোলার abscissa KN হবে

$$KN = \frac{BC^2}{BK} = \frac{BC^2}{AB - AK} = 23{\cdot}93$$

অতএব $KN > KM$

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে কণিকস দুইটি ছেদ করবে না।

বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম এমনি ভাবেই আবুলজুদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত যে ওমর খৈয়ামের এই প্রতিবাদের ভিত্তি হোল অন্য একজন তৃতীয় বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে শোনা কতকগুলি বিষয়। এই তৃতীয় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যতদূর মনে হয় ওমর খৈয়াম নিজে আবুলজুদের গ্রন্থ দেখবার সুযোগ পান নাই। এমতাবস্থায় এই প্রতিবাদের মধ্যে ওমর খৈয়ামের নিজের বিজ্ঞান বুদ্ধির কৃতিত্ব প্রকাশ পেলেও, আবুলজুদ যে সত্যিই এরূপ ভুল করেছিলেন সে স্থির নিশ্চয় করে বলা চলে না।

দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হামিদ ইব্‌নোল্‌ খিদরও আলকারখির অনুসরণ করেন। হামিদের পূর্ণ নাম হোল হামিদ ইব্‌নোল্‌ খিদর আবু মোহাম্মদ আল খুজান্দী। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনেকের মতে তিনি ১০০০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। যতদূর মনে হয় হামিদ, বুয়াইদ নৃপতি ফখরউদ্দৌলার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি যে sextant প্রস্তুত করেন তার নামকরণ করেন নৃপতির নামানুসারেই। অবশ্য এই নামকরণ থেকেই বিষয়টি স্বতসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয় না; হয়ত বা দেশের নৃপতির সন্তোষ বিধানের জন্যই বৈজ্ঞানিক তাঁর সাধের যন্ত্রের

আলখুজান্দী

নাম নৃপতির নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। এই sextantটির নাম হোল "আস্ সুদ আল ফাখ্‌রী।" এটির নির্মাণ কৌশল বেশ বিজ্ঞতার পরিচায়ক। এতে দুই দিকে ১২ ফিট অন্তর দুইটি সমান্তরাল লম্ব দেওয়াল ছিল। দেওয়াল দুইটি মাটীর উপরে ৩০ ফিট এবং নীচে ৩০ ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত। (এই ফুটের পরিমাপ অবশ্য এক "এল" ১৮" ইঞ্চির সমান ধরে নিয়ে) দাক্ষণের দেওয়ালের দক্ষিণ কোণে এবং খুব সম্ভব উত্তর কোণেও রন্ধ্র বিশিষ্ট গম্বুজ ছিল। এই গম্বুজের চারিদিকে ৬০ ফিট ব্যাসার্ধ পরিশিষ্ট sextant তৈরী করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী দুইটি দেওয়ালের মধ্যে অতি সাবধানের সঙ্গে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে পালিশ করা একটি তল দ্বারাই sextant এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। মাটীর নীচে ৩০ ফিট থেকে দেওয়াল পর্যন্ত sextant এর প্রত্যেক ১০ ইঞ্চি পর পর চিহ্নিত করা হয়। রন্ধ্র দিয়ে যে আলোর রশ্মি প্রবেশ করত, সে এমনিতে একটি সাদা প্লেনের উপর পড়ত। এই সাদা প্লেনটি আবার একটি বৃত্তের ভিতরে ঘুরত। এমনি করেই সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা ঠিক করা হয়েছিল। ৯৯৪ খৃঃ অব্দে এই sextant দ্বারাই রাইতে আলখুজান্দি সূর্যের সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা নির্ণয় করেন। কিন্তু যে সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সেই সময়ে দিনগুলি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সেইজন্যে সৌর আয়নমণ্ডল (ecliptic) গণনা করতে তিনি সূর্যের কর্কট রাশিতে (cancer) এবং মকর রাশিতে (capricorn) অবস্থানের সময়ে নানা

পর্যবেক্ষণের ফল অনুপাত করে নেন। অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ফলে এই জটিল বিষয়েও তিনি কৃতকার্য হন। তাঁর গণনা অনুসারে সৌর আয়ন মণ্ডলের তীর্যকতার পরিমাণ হোল ২৩° ৩২′ ২১″। তখনকার দিনে গণনাকৃত ও স্বীকৃত সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ফলের থেকে এর $1\frac{3}{4}''$ পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য দেখে যে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন সে বুঝা যায় আলখুজান্দীর কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকেই। অনেকেই হয়ত এটিকে নির্ভুল বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এমন কি আলবেরুণী তাঁর "কানুনে মাসুদী" গ্রন্থে আলখুজান্দীর এই গণনা নির্ভরযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে আলখুজান্দীর দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণের সময় যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যায় তাই তাঁর গণনাও নির্ভুল হতে পারে নি। আলখুজান্দী নানাভাবে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন ফলই সব সময়ে এক রকম থাকে না, সময় অনুসারে এগুলি অল্প বিস্তর কম বেশী হবেই। সৌর আয়নমণ্ডলতলের (the plane of the ecliptic) ব্যাপারেও যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে এমন মনে করবার কোন কারণই নেই।

"আস্ সুদ আলফাখরী" ছাড়া "আল আলা আস্ সামিলা" নামে অন্য একটি যন্ত্রও আলখুজান্দী নির্মাণ করেন। এটিকে বলা চলে সার্বভৌমিক যন্ত্র! এ দ্বারা আস্তারলব এবং কোয়াড্রাণ্ট উভয়েরই কাজ চলে। প্রথমে একে শুধু একই অক্ষরেখায়

(Latitude) ব্যবহার করা চলত, পরে হিবালাল্লাহ বিন আল হুনায়েন আলবদি আবুল কাসেম আল আস্তারলবি একে সমস্ত অক্ষরেখায়ই ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। এমনিতে কতকগুলি যন্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ ছাড়া, জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিভাগেও তাঁর বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেকার জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রীতি এই সময়ে অনেকটা মিইয়ে আসলেও একেবারে নির্বাপিত হয়নি। দুই একজন খ্যাত অখ্যাত বৈজ্ঞানিক মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন তবে আলোচনায় যে অনেকটা ভাঁটা পড়ে এসেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এই ভাঁটা পড়ার মধ্যেও আলখুজান্দী একে অনেকটা জাগিয়ে তুলেন তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায় ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা। তিনি সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করবার প্রণালী সম্বন্ধে গ্রন্থও প্রণয়ণ করেন। এতে তিনি নিজের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বেশ করে খাটিয়ে নিয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া অন্য যে বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সে হোল বীজগণিত। তিনি বীজগণিতে বিভিন্ন প্রকারের সমীকরণের নানাবিধ সমস্যার অবতারণা করে তাদের সমাধান করবার প্রচেষ্টা করেন। বীজগণিতের কার্য কলাপের মধ্যে তাঁকে যেটি অমরত্ব দিয়েছে সে হোল ত্রৈমাত্রিক সমীকরণ (cubic equation) সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ। তাঁর এই মতবাদটি এখন স্বতসিদ্ধ ভাবেই গৃহীত হয়ে থাকে। তিনিই প্রথমে দেখিয়ে দেন যে মূলদ সংখ্যার (rational

numbers) প্রকল্প (Hyphothesis) অনুসারে দুইটি ত্রৈমাত্রিক সংখ্যার যোগফল অন্য একটি ত্রৈমাত্রিক হতে পারেনা। $x^3+y^3=z^3$ এই অনির্দিষ্ট ত্রৈমাত্রিক তিনটি সংখ্যার সম্মিলনীতে উদ্ভূত সমীকরণে সংখ্যাগুলির নির্দেশ হওয়া সম্ভবপর নয়। $x^3+y^3=z^3$ এর কোন সমাধান পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Fermatএর last theoremএ নামে পরিচিত theoremএরই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখা যেতে পারে। আলখুজান্দি যে সত্যি সত্যিই এই মতবাদকে প্রমাণ করে খাড়া করতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ক্যাজোরী (Cajori) তাঁর "A History of Mathematicsএ এই প্রসঙ্গে বলেছেন "আলখুজান্দী মনে করতেন তিনি এই মতবাদটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আমরা শুনতে পাই যে তাঁর প্রমাণটি ঠিক বিশুদ্ধ নয়।" ক্যাজোরীর এই শুনতে পাওয়ার মূলে কি আছে এবং কেনই বা তিনি আটশত বৎসর পরে এই শুনতে পাওয়ার উপর নির্ভর করেছেন, সে বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখই করেন নাই। সুখের বিষয় আর কেউই তাঁকে সমর্থন করেন নি। আলখুজান্দী এই স্বতসিদ্ধপ্রায় মতবাদটিকে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে খাড়া করেছিলেন বলেই ফিঙ্ক (Fink) মত প্রকাশ করেছেন।

ত্রিকোণমিতিতেও আলখুজান্দীর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। সারটনের (Sarton) মতে তিনিই খুব সম্ভবত

Spherical Triangle থেকে Sine Theorem আবিষ্কার করেন কিন্তু সারটনের মত ঠিক বলে মনে হয় না। আলখুজান্দির বহু পূর্বেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক Spherical triangleএ Sine Theorem আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী না হোলেও অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের ফলে অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ যাঁদের দানে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, একাদশ শতাব্দীর মনসুর ইবনে আলি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মনসুর ইবনে আলি ইবনে ইরাক আবু নসর।

মনসুর ইবনে আলি

মনসুর খারিজমের রাজবংশসম্ভূত। বংশতালিকা থেকে বোঝা যায় তিনি খারিজম শাহ্ মোহাম্মদ বিন ইরাকের পিতৃব্যপুত্র। রাজবংশের মর্যাদা, আত্মম্ভরিতা ও আভিজাত্য তাঁকে বিন্দুমাত্রও মুগ্ধ করতে পারে নাই। তিনি সমস্ত অবহেলা করে জ্ঞানানুশীলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। পুত্রের জন্য পিতার, ছাত্রের জন্য শিক্ষকের যদি কোন সম্মান প্রাপ্য হয় মনসুরও সেই সম্মানের অধিকারী। মনসুরের বৈজ্ঞানিক জীবনীর অন্যান্য কার্যাবলী বাদ দিলেও শুধু ছাত্রের নামের জোরেই হয়ত তিনি পৃথিবীতে চির অমর হয়ে থাকতে পারেন। মুসলিম জগতের বরেণ্য প্রতিভাদীপ্ত সূর্য আলবেরুনী তাঁর ছাত্র। মনসুর ১০০৭—৮ খৃঃ অব্দে মেনিলসের "Spherica"কে নানা ভাবে উন্নত করে একটা উন্নত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ত্রিকোণমিতি, টলেমির আলমাজেষ্ট, জ্যোতিষবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের

যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রীক বৈজ্ঞানিক মেনিলসের প্রথাকে পরিহার করে মণ্ডলাকার ত্রিভূজের (spherical triangle) সঙ্গে শিঞ্জিনী প্রভৃতির সম্বন্ধ প্রথম কে স্থাপন করেন সে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে প্রধানত তিনজন বৈজ্ঞানিকের নাম কীর্তিত হয়ে থাকে—একজন হোলেন আবুল ওয়াফা, দ্বিতীয় হোলেন আলখুজান্দি এবং তৃতীয় ব্যক্তি হোলেন মনসুর ইবনে আলি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নাসিরুদ্দীন তুসী তাঁর "আশ্ শাক্কুল কত্তা" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন যে আলবেরুনীর মতে এই অধিকারের সম্মান আমীর আবুনসর আলি বিন ইরাকের প্রাপ্য। বিখ্যাত ইত্যালীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ C. A. Nallino এই আবিষ্কারকে আরবদের গণিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম বিশিষ্ট কার্য বলেই উল্লেখ করেছেন। এই কথাতেই বুঝা যাবে বৈজ্ঞানিক হিসাবে মনসুর নিতান্ত নগণ্য নন। যা হোক যতদূর মনে হয় আবুল ওয়াফারই এই সম্মান প্রাপ্য।

মনসুর গণিত নিয়েই বিশেষভাবে চর্চা করেন এবং এ সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। আলবেরুনীর পত্রেই তাঁর বার খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র "রিসালতু আবি নসর ওয়া আবি হায়ান ফি জদুলিদ্ দকায়িক" ব্যতীত অন্য কোনগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডে ও বডেলিয়ন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

বিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত থেকেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মনে অন্য দেশীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ অনুবাদ করবার আগ্রহ জেগে উঠে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই।

আন্নাসাভি

প্রায় তিন শতাব্দী ধরে অনুবাদ কার্য চলতে থাকে, স্বাভাবিক নিয়মেই পুনরায় এ আগ্রহ ঝিমিয়ে আসে। একাদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই এ ঝিমিয়ে আসা ভাবধারাটা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে! সাধারণত অন্য দেশীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ থেকে যা জানবার সে প্রায় জানা হয়ে গেছে। তাঁদেরই বৈজ্ঞানিক আদর্শের উপর ভিত্তি রচনা করে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তখন আপন প্রতিভায় প্রভূত উন্নতিসাধন করে ফেলেছেন। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের অপরিস্ফুট বিজ্ঞানপ্রথা তখন আর তাঁদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করতে পারে না। এই সাধারণ অনাগ্রহের ভিতরেও একদল লোক কিন্তু পূর্বের মোহ একবারে ছাড়তে পারেন নাই। বিংশ শতাব্দীতেও আমরা যেমন মান্ধাতার আমলের সত্যযুগের সুখের কল্পনায় বিভোর হই, তখনকার ঋষিদের অজ্ঞাত সাধনার অস্পষ্ট আভাসেই মুগ্ধ হয়ে বর্তমানের বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে তাঁদের অতি বড় বৈজ্ঞানিক বলে দাবী করতে পিছপাও হই না, কেউ কেউ বা সেই সনাতন আদর্শ পুন প্রবর্তন করতেও লেগে যাই; একাদশ শতাব্দীতেও ঠিক তেমনি একদল বৈজ্ঞানিক পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-প্রতিভার প্রতি একটা অহেতুক আবেগ দেখাতে কসুর করেন নাই। তাঁদেরই আগ্রহে একাদশ শতাব্দীতেও ভারত ও গ্রীক

বিজ্ঞানের অনুবাদ কার্য কিছু কিছু চলতে থাকে। কেউ কেউ বা অন্ধ ভক্তির বশবর্তী হয়ে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের অব্যবহার্য পন্থা পুনরায় প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। এই অন্ধ ভক্তদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীর আন্‌নাসাভী অন্যতম।

বুয়াইদ সুলতান মাজ্দউদ্দৌলার রাজত্বকালে আন্‌নাসাভী বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আলি ইবনে আহমদ আবুল হাসান আন্‌নাসাভী। খোরাসানের নাসায় তার জন্ম হয় সেই হিসাবেই তিনি আন্‌নাসাভী নামে অভিহিত হতেন। তাঁর জন্মতারিখ কিংবা বংশাবলীর সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নি।

আন্‌নাসাভী অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে শুদ্ধ অঙ্কতেই বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ে তিনি যে সুকৌশলী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সে সত্যই অপূর্ব। তিনি তাঁর অঙ্কগ্রন্থে ভগ্নাংশের ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয় প্রণালীগুলিকে সবিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত প্রণালীগুলি বর্তমানের অনুসৃত পন্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত যতদূর মনে হয় বর্তমানের অনুসৃত পন্থা তাঁর প্রবর্তিত নিয়মাবলী থেকেই উদ্ভূত। কালের পরিবর্তনে সামান্য যে রদবদল হয়েছে তা ছাড়া আর বেশী কিছু উন্নতির দরকার হয় নি। বর্তমানে যাই হোক একাদশ শতাব্দীতে ৩৬৫২২৯৬ এর ঘনমূল এবং ৫৭৩৪২ এর বর্গমূল নির্ণয় করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে বিশেষ সুখপ্রদ ছিল না বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

আন্‌নাসাভী তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে অতি সহজভাবেই এগুলির ঘনমূল ও বর্গমূল নির্ণয় করেন। তদবধি বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর পন্থাই অনুসরণ করে আসছেন। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হোল বৈজ্ঞানিকের sexagesimal এর পরিবর্তে দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার। দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হোলেও কার্যকারিতায় অত্যাবশ্যকীয়রূপে তখনও গণ্য হয়ে উঠে নি। বৈজ্ঞানিকগণ তখন পর্যন্ত এর দিকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টি দেন নেই বলেই মনে হয়। ভগ্নাংশ লিখন প্রণালীও তখন পর্যন্ত সঠিকভাবে স্থিরীকৃত হয় নি বলা চলে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও সুস্পষ্ট Sexagesimal কে বাদ দিয়ে দশমিক ভগ্নাংশের প্রচলন বৈজ্ঞানিকের অসম সাহসিকতার পরিচয়। আন্‌নাসাভী ১৭° ডিগ্রীর বর্গমূল বের করতে যে ভাবে দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার করেছেন তা থেকেই তাঁর এ সাহসিকতা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। বর্তমানের অনুসৃত লিখন প্রণালীতে তাঁর প্রবর্তিত পন্থাটি দাঁড়াবে :—

$$\sqrt{17^\circ} = 1/100 \sqrt{170{\cdot}000} = (\tfrac{1}{100})412^\circ = 4^\circ 7' 12''$$

যতদূর জানা যায় মাজদ্ উদ্দৌলার রাজত্বকালেই আন্‌নাসাভী ব্যবহারিক অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৈজ্ঞানিক নিজে খাঁটি পারস্যবাসী। তাই তদানীন্তন অভিজাত ও বৈজ্ঞানিক ভাষা আরবীতে সবিশেষ পারদর্শিতা সত্ত্বেও মাতৃভাষাকেই তিনি নিজের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করবার বাহনরূপে ব্যবহার করেন। খুব সম্ভব অভিজাত

বৈজ্ঞানিকগণের ভ্রূকুটি সহ্য করেও তিনি তাঁর প্রথম অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পারসীতেই লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর মাতৃভাষাপ্রীতি বিজ্ঞানপ্রীতির নিকট খাট হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। হয়ত রাজনৈতিক চাপও এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। মাজদ্ উদ্দৌলার পরবর্তী খলিফার আমলে আন্নাসাভী তাঁর গ্রন্থখানি আরবীতে অনুবাদ করেন এর নাম দেওয়া হয় "আলমুক্নী ফিল হিসাব আল হিন্দী" বা ভারতীয় গণনাবিধির সৌন্দর্য। পূর্বেই বলা হয়েছে আন্নাসাভী পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের অন্ধ ভক্ত। এই গ্রন্থখানি তাঁর সেই অন্ধ ভক্তিরই নিদর্শন বলা চলে। ভারতীয় গণিতবিদদের প্রবর্তিত প্রণালী তাঁকে অনেকটা মুগ্ধ করে রাখে। তিনি পূরণে ও ভাগে ভারতীয় পন্থা প্রচলন করবার প্রয়াস পান। প্রথাগুলি পূর্বকালে যতই আবশ্যকীয় এবং তদানীন্তন পারিশিষ্টতার যতই উপযোগী হোক না কেন, বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না। সাধারণ হিসাবেও এগুলি বিশেষ সুবিধাজনক নয় বলেই হয়ত এদের প্রচলনে বাধা পড়ে। সামান্য দুইটি দশকের সংখ্যার পূরণেই এ প্রথাতে অন্তত চার পাঁচ লাইনের আশ্রয় নিতে হয়। ৭৬ এবং ৪৩ এর পূরণে এ প্রথা কেমনভাবে ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখেই এর স্থূল অবৈজ্ঞানিক অপকর্ষতা ধরা পড়বে। প্রথমে দুইটি সংখ্যা পর পর নীচে লেখা হয় পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত (ক) চিত্র অনুযায়ী তার পর পূরণ আরম্ভ হয় (খ) চিত্র অনুযায়ী। এ প্রথায় প্রথমে গুণীতক ও গুণকের সর্বোচ্চ সংখ্যার পূরণ হয়।

গুণফল গুণকের সংখ্যার উপর লিখা হয় তারপর অন্যান্য সংখ্যাগুলির গুণফলের কিছু অংশ তার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। যে সংখ্যার পূরণের কাজ শেষ হয়ে যায় সে সংখ্যাটিকে কেটে দিয়ে তার জায়গায় অন্য একটির স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য কাগজ ও কালি আবিষ্কারের পূর্বে কেটে না দিয়ে

ক

৪ ৩
৭ ৬

খ

২ ৬
৩ ~~৪~~ ৫
~~১~~ ~~৮~~ ~~৪~~ ~~৮~~
৪ ৩
~~৭~~ ~~৬~~ ৬
৭

সংখ্যাগুলিকে একেবারে মুছে ফেলা হত। ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রে এর নাম হোল 'তস্থ'। ভাগের বেলায় ভাজক ভাজ্যের নীচে বসিয়ে দেওয়া হয় তারপর ভাগের সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলি দক্ষিনদিকে লেখা হয়ে যায়। এই প্রথা অনুসারে ৪৬১কে ১৬ দিয়ে ভাগ দিতে হোলে লিখন প্রণালী কেমন দাঁড়ায় সে নীচে দেখান গেল :—

১৩
১৪
২৮

$$\frac{৪৬১}{১৬} = ৪৬১ = ২৮\tfrac{১৩}{১৬}$$

১৬
১৬

যা হোক আন্‌নাসাভীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জবরজঙ্গ প্রথা প্রচলিত হতে পারে নি।

শুধু পূরণ এবং ভাগের বেলায়ই নয়, ভগ্নাংশ লিখনের বেলায়ও আন্‌নাসাভী ভারতীয় পন্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ভগ্নাংশ লিখতে মধ্যে কোন লাইন ব্যবহার করতেন না। শ্রীধর আচার্য ১/২, ১/৩, ১/৫ কে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৫}$ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আন্‌নাসাভী তার গণিত পুস্তকে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর জন (John of Seville) তাঁর তথাকথিত গণিত পুস্তকে (এই গণিত পুস্তকখানি আসলে আলখারেজমির গণিত পুস্তকের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত লাটিন অনুবাদ) এই পন্থারই অনুসরণ করেছেন। মিশ্র সংখ্যায় ভগ্নাংশীয় অংশ, অখণ্ড অংশের পরে লিখিত হত। আন্‌নাসাভী সর্বত্রই এই প্রথারই অনুসরণ করেছেন তবে যেখানে কোন অখণ্ড সংখ্যা নেই সেখানে তিনি শূন্যের ব্যবহার করেছেন। এটি তাঁর নিজস্ব অভিনবতা বলা চলে।

১/১১ আন্‌নাসাভীর প্রথায় $\begin{matrix}০\\১\\১১\end{matrix}$ ভাবে লিখিত হত।

পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অহেতুক অন্ধভক্তির ফলে নাসাভীর নিজের বিজ্ঞান সাধনা অনেকটা ব্যাহত হোলেও তাঁর ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞানের ব্যুৎপন্নতা একদিকে যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকদের মানসপটে সমুজ্জল রাখতে সাহায্য করেছিল অন্যদিকে পূর্বতন প্রথার উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা তদানীন্তন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদিগকে বিজ্ঞানের নবতম প্রণালী-সমূহের উদ্ভাবনেও বিশেষ সহায়তা করেছিল বলা চলে। ভারতীয় বিজ্ঞান প্রথা পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টার মধ্যেই যে নাসাভীর

সর্বশক্তি নিয়োজিত হয় নি সে তাঁর মৌলিক গবেষণা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রীক বিজ্ঞানের অন্যতম সৃষ্টিকর্তা আর্কিমেডিসের কার্যাবলী বিশেষত Lemanta এবং মেনিলসের উপপাদ্য বিষয় (Meneleoses Theorem) সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। গ্রন্থখানির নাম হোল "কিতাবুল ইশবা"। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক-বিজ্ঞানের আদর্শ এতে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করে তোলাই গ্রন্থকারের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

সম্ভবত ১০৩১ খৃঃ অব্দে এই যশস্বী বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

আলবেরুনী

গতানুগতিকতার পথ আগলে যাঁরা চলেন তাঁদের সততা ও অমায়িকতা প্রশংসনীয় হোলেও জাতির অগ্রগতির পথে তাঁদের দান যে বিশেষ কার্যকরী নয় সে নিঃসন্দেহ সত্য। দুইকূল বজায় রেখে চললে দুই কূলই ঠিক থাকে বটে কিন্তু কোন কূলেই চর বাঁধে না, ফল পুষ্প পরিশোভিত হয়ে কারুর উপকারেও আসে না। শ্যাওলা পানাপোরা ডোবার মত নিস্পন্দ স্থবির জীবনে ভয় করবার কিছুই নেই, কূল সে কোনদিনই ভাঙ্গবে না ভাঙ্গতেও পারে না কিন্তু সেই জন্যে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় মনও আপ্লুত হয়ে উঠে না। একটা ভাঙ্গাগড়াই চলুক পুরানকে বদলে নূতন তার জায়গায় স্থান নিক মানুষের স্বভাবত জড় প্রকৃতির মনে এই কথারই প্রতিধ্বনি হতে থাকে, প্রাকৃতিক

জীবনেও সে তাই দেখতে চায়। একঘেয়েমি একই জিনিসের পুনরুক্তি কোনদিনই তার ভাল লাগে না—নূতনের আস্বাদের জন্য তার মন থাকে সব সময়েই উদগ্রীব তাই প্রকাশ্যে নূতনের বিরোধিতা দেখালেও ভিতরে ভিতরে তার জন্যে একটু অনুকম্পা, একটু অনুরাগ সব সময়েই ফল্গুধারার মত বইতে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে নূতনের প্রতি এই মোহ সামাজিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে, সমাজেও আস্তে আস্তে ভাঙ্গা গড়া চলতে থাকে। নূতনের প্রভাব ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজকে ছেয়ে ফেলে। সমাজের জীবনের লক্ষণ হোল এই নূতনত্ব। যে সমাজে নূতনের আগমন সম্ভাবনা কম, সে সমাজ মৃত কঙ্কাল নিয়ে শুধু মহাকালের অনন্ত সাক্ষ্যরূপেই বিরাজমান থাকে।

কিন্তু পুরাতনকে ফেলে নূতন পথের সন্ধান দেওয়া সহজসাধ্য নয়। অধিকাংশ লোকই সাধারণত অনুকরণকারী। প্রত্যক্ষভাবে হোক কি পরোক্ষভাবে হোক, জ্ঞাতসারে হোক কি অজ্ঞাতসারে হোক অন্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করেই সবাই চলেছে। এই অনুসরণকারীদের মধ্যে থেকেই যিনি নিজের স্বতন্ত্র আদর্শ, স্বতন্ত্র পন্থা বেছে নিয়ে বাইরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনেই এগিয়ে যান তিনিই সর্বসাধারণকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেন, তাঁর কাছে নূতন আদর্শ পেয়ে লোক আবার মেতে উঠে।

সমাজের পক্ষে যে কথা প্রযোজ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বেলায়ও সেই কথাই প্রযোজ্য। একই পথে একই খাতে চলতে থাকলে জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যেও এসে পড়ে এক ঘেয়েমী—

বৈজ্ঞানিক মনকে আর সে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে না, আস্তে আস্তে সে মন অসার হয়ে পড়ে। কৃষ্টির পথে যখন নূতনের অভাব দেখা দেয়, তখনই সে তার সত্যিকার সত্বাকে হারিয়ে ফেলে ; তার স্থানে এসে বসে অন্ধ কুসংস্কার, পূর্বেকার জ্ঞানবিজ্ঞানকে নিষ্পেষিত সঙ্কুচিত করে কতকগুলো কাল্পনিক অবিদ্যা। নূতন কোন আবিষ্কার নূতন কোন আদর্শ দেখা না দেওয়া পর্যন্ত চলে তাদেরই তাণ্ডবনৃত্য। বস্তুত নূতনের সব চেয়ে বেশী দরকার জ্ঞানবিজ্ঞানের বেলায়। তার অগ্রগতির পথকে অব্যাহত রাখবার জন্যে সব সময়েই দরকার নূতন জ্ঞান, নূতন অভিব্যক্তি নূতন আদর্শ। যাঁরা প্রকৃতিদত্ত জড়তার বাধা ঘুচিয়ে অনিশ্চিত নূতনের পথে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে ব্রতী হন পৃথিবীর নীরব নিথর বুকে একটা সচকিত ঢেউ তুলে দিয়ে তাঁরাই স্থবির মনকে সচল ক'রে তোলেন—তাতেই পৃথিবীতে নূতন স্পন্দন জাগে নূতনের আভায় পুরাতন ম্রিয়মান হয়ে উঠে।

নূতন সূত্র নূতন তথ্য বা নূতন কোন থিওরী আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নব উদ্যমে কাজ সুরু হয়। আবার বিজ্ঞানের প্রাণ সঞ্চার হয়। এই নব আবিষ্কারকের নাম হয়ে উঠে চিরস্মরণীয়।

মুসলিম জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাড়া পড়ার পর থেকে এই নূতনের অভাব অবশ্য বিশেষ দেখা দেয় নাই। যখনই কোথাও এতটুকু ঝিমিয়ে পড়া ভাব দেখা দিয়েছে তখনই কারুর

প্রতিভায় সে নিশ্চলতার ভাব কেটে গিয়ে আবার দেখা দিয়েছে অপূর্ব কর্মকুশলতা। বস্তুত দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন এক নিশ্চলতার ভাব বিজ্ঞান জগতকে ছেয়ে ফেলতে প্রয়াস পায় তখন যাঁর একান্ত সাধনায় জ্ঞানবিজ্ঞান সে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় তিনি হোলেন প্রাচ্যপাশ্চাত্যে সুপরিচিত আলবেরুনী। তাঁরই অপূর্ব সাধনার বলে বিজ্ঞান আবার নব তেজে উজ্জীবিত হয়ে উঠে, দেশে দেশে বৈজ্ঞানিকগণ আবার মাথা নাড়া দিয়ে বিজ্ঞানের সাধনায় লিপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রায় অবরুদ্ধ গতি আবার তার চলমান তেজস্বিতা ফিরে পায়। একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান জগতে যে সমস্ত কীর্তিমান পুরুষ নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করে নব ধারায় বিজ্ঞানকে চালিত করেন, আলবেরুনী তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আভিজাত্যের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধই নেই। অভিজাত বংশীয় না হোলে কেউ জ্ঞানবিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারবেন না এমন ধারণা করবারও কোন কারণ নেই বরং সাধারণত দেখা যায় আভিজাত্যহীন দরিদ্র গৃহের সন্তানই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নব আলোকের সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সচকিত করে তোলেন। যতদূর জানা যায় আলবেরুনীও এই দলেরই একজন। তাঁর পূর্বপুরুষগণের আভিজাত্যের গর্ব করবার কিছু ছিল কিনা, উচ্চস্তরে তাঁদের কোন স্থান ছিল কিনা ঠিক জানা না গেলেও আলবেরুনীর কার্যকলাপ থেকে মনে হয় সত্যই তাঁদের এমন গর্ব করবার মত কোন কিছুই ছিল না। উত্তরকালে

যখন তিনি বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের জন্য সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত হচ্ছিলেন তখন জনৈক ঈর্ষাকাতর কবি তাঁর অজ্ঞাত কুলশীলতা নিয়ে বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করেন। আলবেরুনী এ বিদ্রূপে বিন্দুমাত্রও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে নিজেও কবিতাতেই তার উত্তর দিয়ে জানিয়ে দেন যে তাঁর পূর্বপুরুষদের অনভিজাত্যের জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নন। শুধু এই সামান্য কবিতাতেই নয়, সর্বত্রই তিনি এমনি উদার হৃদয় ও উন্নত মনের পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানে রত মন হয়ত পূর্বপুরুষগণকে অখ্যাতির হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করতে রাজী হয় নি। তিনি তাঁর কোন গ্রন্থেই পূর্বপুরুষের কথা টেনে আনেন নাই, এমন কি তাঁর পিতার পরিচয় ছাড়া অন্য কারুর পরিচয়ও দেন নাই।

নিজের পরিচয়কে যিনি এমনভাবে এড়িয়ে গেছেন তাঁর শৈশব জীবন বা পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ পাওয়া যে দুষ্কর হবে সে স্বাভাবিক। আলবেরুনীর বেলায় একথা পুরোপুরি ভাবেই খাটে। তাঁর শৈশব, শিক্ষা বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে সঠিক কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তাঁর লেখা থেকেই শুধু জানা যায় যে তিনি খারিজমের (বর্তমান খিভা) সহরতলীতে ৩৬২ হিজরী ৩রা জেলহজ্জ (৯৭৩ খৃঃ অব্দ ৩রা সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আহম্মদ সঙ্গতিসম্পন্ন না হোলেও পিতৃস্নেহে অন্য কারুর চেয়ে কম ছিলেন এমন মনে করবার কোন কারণ নেই কিন্তু এই

পিতৃস্নেহও আলবেরুনী বেশী দিন ভোগ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। মাতার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর জীবনী থেকে দেখা যায় তাঁর বাল্যকাল আইরাক বংশীয় নৃপতিদের বিশেষ করে আবু মনসুর বিন আলি বিন ইরাকের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়েছিল। এই রাজকীয় অনুগ্রহের কারণ বোঝা দুষ্কর। এ অনুগ্রহের ভিতর রক্ত মাংসের কোন সম্বন্ধ ছিল কিংবা শুধু নৃপতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিই প্রকাশ পাচ্ছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশে বাইরুন নামক নগরীতে আলবেরুনীর জন্ম হয় এবং এই বাইরুন নাম থেকেই তাঁর নাম হয় আলবেরুনী। এ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কোন্ প্রমাণ পাওয়া যায় না; আলবেরুনীর গ্রন্থাদিতেও এমন কোন আভাস দেখা যায় না। বর্তমানে অবশ্য এ মত ভ্রান্ত বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

যাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব তাঁর শিক্ষা দীক্ষার কথায়ও যে ইতিহাস ততোধিক নীরবতা প্রকাশ করবে সে স্বাভাবিক। আলবেরুনী কোথায় কি ভাবে কার নিকট শিক্ষালাভ করেন সে সম্বন্ধেও বিস্তারিত কোন কিছু অবগত হওয়া যায় না। তিনি আবুল ফতেহ্ বুস্তীর প্রশংসাত্মক যে কবিতা রচনা করেন তাতে ইরাক বংশীয়েরা তাঁকে বাল্যকালে প্রতিপালন করেছিলেন এবং মনসুর বিন ইরাক তাঁর মানসিক শক্তি পরিস্ফুরণে সহায়তা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া তাঁর শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই—কোন ইতিহাসেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে শিক্ষা ব্যাপারে যে তাঁর প্রতি কোন অবহেলা করা হয় নাই সে তাঁর পরবর্তী কালের কার্যকলাপ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এই রাজকীয় অনুগ্রহের মধ্যে তাঁর জীবনের প্রথম বাইশ বৎসর অতিবাহিত হয়, এর পরেই আসে ঝঞ্ঝাবাত। রাজকীয় অনুগ্রহে নিরুদ্বেগ জীবন রাজনৈতিক গোলযোগে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

আব্বাসীয় বংশের দুর্বলতার ফলে যে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্রপাত হয় তারই সুযোগ নিয়ে খারিজম প্রদেশেও দুইটি বিভিন্ন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এর উত্তরাংশে মামুন বিন মাহমুদ এবং দক্ষিণাংশে আলবেরুনীর প্রতিপালক আলইরাক বংশীয় আবু আবদুল্লাহ রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নামমাত্র বাগদাদের খলিফার অধীন। কিন্তু মামুনের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা এই নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করতেও শেষ পর্যন্ত রাজী রয় নি। তিনি ৯৯৪-৯৫ খৃঃ অব্দে আবু আবদুল্লাকে নিহত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। যুবক আলবেরুনী এই রাজনৈতিক পরিবর্তন সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর অভিভাবক বংশীয়দের এমনিভাবে ধ্বংস হওয়ায় তিনি স্বভাবতই বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং বিষণ্ণচিত্তে খারিজম ত্যাগ করেন। সংসারজ্ঞানহীন

বাইশ বৎসরের এক যুবকের পক্ষে এই ভাগ্যান্বেষণের প্রথম অংশ যে বিশেষ সুখের হবে না সে অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। আলবেরুনীর বেলায়ও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি পরে যখন জুরজানে রাজ অনুগ্রহে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে "আসারুল বাকিয়া" গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন তখনও এই সময়কার দুঃখ কষ্টের কথা ভুলতে পারেন নি। তাই স্মৃতির দংশন বিজ্ঞানের গ্রন্থেও স্থান পেয়ে বসেছে। চান্দ্রিক গণনায় নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের মতাবলী উধৃত করার প্রসঙ্গেই তিনি এ কথার উল্লেখ করেছেন। এ স্থানে তার পুনরুক্তি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না :—

"আরবেরা প্রাকৃতিক বিদ্যায় অজ্ঞতার জন্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনকে (meteorological change) নক্ষত্রের উদয় ও অস্তের উপর নির্ভর করে বলে মনে করে। গতিপথের বিভিন্ন স্থানে সূর্যের অবস্থানের জন্যেই যে এই সমস্ত পরিবর্তন হয় সে কথা তাঁরা চিন্তাও করে না। ফলে হিপোক্রেটস (Hippocrates) যেমন লুব্ধকের উদয়ের বিশ দিন পূর্বে গরম পানীয় পান, রক্তমোক্ষণ ইত্যাদি নিষেধ করে কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যান সৃষ্টি করেছিলেন এবং লোকের মনে নানা কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, আরবেরাও তেমনি নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘটনাটি কবি আহম্মদ বিন ফারেসের নিম্নের কবিতার প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। "পুরাকালের

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন যে মানুষের সম্মান দুইটি ক্ষুদ্র জিনিসের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁকে অনুকরণ করেই বলব যে মানুষের কদর নির্ভর করে দুইটি দিরহামের উপর। যদি তার অর্থ না থাকে তাহোলে তার স্ত্রীও তার দিকে ফিরে চায় না। তার দারিদ্রের জন্য সে সর্বত্র এমন হেয় বলে গণ্য হয় যে লোকের বিড়ালও তার উপর মূত্র ত্যাগ করতে সঙ্কোচ করে না" আমি যখন রাজ দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হই, তখন রাইতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভদ্রলোকটি একজন জ্যোতির্বিদ বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি যে সমস্ত নক্ষত্র Lunar station গঠন করে তাদের সংযোগ (conjunction) সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বানী করবার জন্যে এগুলির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেই যে তাঁর থিওরিটি ঠিক নয়, ভুল সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে বলেছিলুম যে প্রথম স্থানের প্রতি যে বৈশিষ্ট ও মৌলিকতা আরোপ করা হয় এবং হিন্দুগণ এই স্থানের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের সম্বন্ধের যে বর্ণনা দিয়াছেন সেগুলি মেষরাশির প্রথম অংশের বৈশিষ্ট। নক্ষত্র বা নক্ষত্রগুলো এই স্থান থেকে দূরে সরে গেলেও যেতে পারে কিন্তু এই সমস্ত বৈশিষ্টের স্থানচ্যুতি হয় না। ঠিক তেমনি ভাবে যদিও মেষরাশিমণ্ডল (constellation of aries) একই স্থানে স্থির থাকে না তবুও মেষরাশির বৈশিষ্ট স্থানচ্যুত

হয় না।* এতে ভদ্রলোক উদ্ধতভাবে আমার প্রতি নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার করেন। আসলে তিনি যে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন তা নয় কিন্তু তবুও তিনি আমার মতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে প্রচেষ্ট হন। শুধু তাই নয় তিনি আমাদের উভয়ের মধ্যকার আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে আমার প্রতি অপমানকর ব্যবহার করতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এর কারণ অন্য কিছুই নয়। তিনি ছিলেন বিত্তশালী আর আমি তখন নিঃসম্বল পথের ভিখারী, নানা দিক থেকে নানা ভাবে বিপন্ন। দারিদ্র মানুষের গুণকেও দোষে পরিণত করে। পরে যখন আমার অবস্থার উন্নতি হয় তখন এই ভদ্রলোকই আমার বন্ধুতে পরিণত হন।"

আলবেরুনী ঠিক কোন সময়ে জুরজানে উপস্থিত হন সে বিষয়ে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। শুধু তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে বুঝা যায় যে মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবুল ওয়াফার মৃত্যুর সমসময়ে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে

* The nature and pecularities which are attributed to the first station and all that which the Hindus relate of the connection of this station with others, are peculiar to the 1st part of the Aries and never leave this place, although the star (or stars which form the Lunar station) may leave it. In a similar way all that is peculiar to the Aries does not move away from the place of the Aries; although the constellation of the Aries does move away.

জুরজানে উপনীত হন। জুরজানের প্রতি তাঁর আকর্ষণের বিশেষ কোন কারণ ছিল কি না বোঝা যায় না। এই সময় জুরজানের অদৃষ্টেও রাজনৈতিক ভেল্কীবাজী নিজের কসরৎ দেখাতে ত্রুটি করে নাই। আলবেরুনী স্বদেশ ত্যাগ করবার পূর্বেই বিদ্বান হিসাবে বিখ্যাত হয়ে পড়লেও, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ জুরজান অধিবাসিগণ যে তাঁকে নিজেদের তরফ থেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব ভাগ্যচক্রের ক্রীড়াপুত্তলি হিসাবেই তিনি এখানে আগমন করেন।

যা হোক জুরজানে আলবেরুনী তাঁর প্রশান্তচিত্ততা ফিরে পান। শান্ত সমাহিত চিত্তে আবার জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নৃপতি কাবুস বিন ওয়াশম্‌গিরের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন। কাবুস ছিলেন অতীব বিদ্যোৎসাহী। এই বিদ্যোৎসাহিতার সুযোগে নৃপতির সহায়তায় আলবেরুনী একদিকে যেমন তাঁর জ্ঞান লিপ্সা চরিতার্থ করবার সুযোগ পান অন্যদিকে আর্থিক এবং পার্থিব সম্মানের ব্যাপারেও উত্তরোত্তর লোকচক্ষে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কাবুস তাঁর বিচক্ষণতায় এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে তাঁকে নিজ রাজ্যের অর্ধাংশ উপহার দেবার প্রস্তাব করেন। আলবেরুনী কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী হন নি। জ্ঞান তপস্বীর মনে জ্ঞান ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্যে কাবুসের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা বিরাজিত থাকলেও তাঁর নির্মমতা বেরুনীর কোমল মনে গভীর বিতৃষ্ণার

সৃষ্টি করে। এ বিতৃষ্ণার কথা তিনি প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুইখানা গ্রন্থ "আল আসারুল বাকিয়া" এবং "তাজরী দুশ্‌ শুয়াত" কাবুসের নামে উৎসর্গ করলেও, কাসিদাতে তাঁর নির্মমতার কথা উল্লেখ করে নিজের আন্তরিক বিতৃষ্ণার কথা জানিয়ে দিতেও ত্রুটি করেন নাই। জুরজানে অবস্থানকালেই যে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে সমর্থ হন তার নিদর্শন হোল তাঁর উপরোক্ত দুইখানি গ্রন্থ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা। এই স্থানে অবস্থানকালেই তিনি ভূগোলকের অক্ষরেখার (arc) পরিমাণ নির্ণয় করেন।

জুরজান সর্বদিক দিয়ে তাঁর স্বভাবের পরিপোষক হোলেও জন্মভূমি খারিজমের কথা তিনি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন নি। এক অজ্ঞাত চৌম্বিক আকর্ষণ যেন সব সময়েই তাঁকে খারিজমের দিকে আকৃষ্ট করে রাখত। রাজকীয় অনুগ্রহে সৌভাগ্যের শীর্ষতম স্থানে অবস্থান করলেও সামান্য সুযোগ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার খারিজমে যেয়ে উপস্থিত হন।

এই সময়কার একটি বিশেষত্ব অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে হোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতিদের বিদ্যোৎসাহ। বাগদাদ এবং কায়রোর রাজদরবারে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলত তার ঢেউ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও দোলা না দিয়ে ছাড়ে নি। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীকালে

ইসলামীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির পথ উজ্জ্বল করে তুলেছিল আলবেরুনীর সময় পর্যন্ত সেগুলো গড়ে উঠে নাই। তখন শুধু নৃপতির প্রাসাদের মধ্যেই তথা নৃপতির রুচির উপরেই জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি নিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক নৃপতির রুচি অনুযায়ী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গতি নির্ধারিত হোত, তাই সাধারণত রাজধানীতে নৃপতির দরবারেই জ্ঞানী গুণী দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরও সমাবেশ হোত। সেখানে তাঁরা আপন আপন জ্ঞানগরিমা দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানকে যেমন অগ্রগতির পথে তুলে দিতেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রাজ অনুগ্রহে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও করতেন। এমনি ব্যবস্থার ফলে কোন রাজবংশের পতনের পর সে স্থানের সংস্কৃতির ধারাও অনেক সময় রুদ্ধ হয়ে যেত। বাগদাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ম্রিয়মান হয়ে পড়ায় এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও অনেকটা খর্ব হয়ে পড়ে কিন্তু এর আশেপাশের প্রাদেশিক রাজধানীতে তার বিপরীত ভাবই দেখা দেয়। সেগুলো জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় মেতে উঠে বলা চলে। জুরজান নৃপতির মত তদানীন্তন খারিজম শাহও বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আলবেরুনীর প্রজ্ঞার কথা শুনে তিনি তাঁকে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ জানিয়ে পাঠান। আলবেরুনী সাদরে এ আহ্বানে সাড়া দেন।

জ্ঞান গরিমায় খারিজম এই সময় বিশেষ উন্নত হয়ে উঠে। নৃপতি আবুল আব্বাস ও তাঁর দার্শনিক মন্ত্রী আবুল হুসেনের আগ্রহাতিশয্যে সেই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ খারিজম

রাজদরবারে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে আলবেরুনী ব্যতীত জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত আবু আলি ইবনে সিনা, দার্শনিক আবু সহল মসীহি, গণিতিক আবু নসর আররাক এবং চিকিৎসক আবুল খয়ের খাম্মার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এমনি সুধীজনের সমাবেশ কিন্তু বেশী দিন টিকে থাকতে পারে নাই। শান্তিপূর্ণ দেশ যেমন সাম্রাজ্যবাদীর সাম্রাজ্যবর্ধন স্পৃহাব বেদীতলে অশান্তি কোলাহল জর্জরিত হয়ে উঠে, এই সুধী সমাবেশও তেমনি এক বিদ্যোৎসাহীর অতি আকাঙ্খার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। এই আঘাতকারী হোলেন গজনীর দিগ্বিজয়ী নৃপতি সুলতান মাহমুদ।

খারিজমশাহের দরবারে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বানবর্গের সমাবেশের কথা এই সময় সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ে। এ খ্যাতি সুলতান মাহমুদেরও কর্ণগোচর হতে দেরী হয় না। দিগ্বিজয়ী মাহমুদ কোন দিক থেকেই নিজেকে অন্যের চেয়ে অনুন্নত দেখতে রাজী নন। বিদ্যাবত্তার দিক থেকে গজনী খারিজমের চেয়ে কম হবে এ তাঁর সহ্যাতীত। তা ছাড়া এমনিতে তাঁর পররাজ্য বিজয়ের লোভ যত ছিল অন্য দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে আহরণ করে নিজের দেশে আনবার লোভও তার চেয়ে কম ছিল না। তিনি খারিজমের সুধীবর্গকে গজনীতে আনবার ফিকির খুজতে লাগলেন, উপায় স্থির হতেও দেরী হোল না। তিনি আলী বিন মামুনকে চিঠি লিখে পাঠালেন খারিজমের কয়েকজন সভাসদকে গজনীতে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। ভাষার দিক থেকে চিঠিতে অসৌজন্যের কিছুই ছিল না,

চিঠিখানি পড়ে কারুর ধারণাও হতে পারে না যে এই কোমলতার পিছনে বজ্রকঠোর তরবারী লুক্কায়িত থাকতে পারে। চিঠিতে লেখা ছিল "আমি শুনেছি খারিজম শাহের রাজসভায় নানা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, অভিজ্ঞ, অদ্বিতীয় ধীসম্পন্ন অমুক অমুক ব্যক্তি আছেন। আপনি তাঁদিগকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন—যাতে তাঁরা আমাদের দরবারের গৌরব বর্ধন করতে পারেন এবং নিজেরাও অশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারেন। আমরা তাঁদের জ্ঞান ও কৌশলের সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত হতে ইচ্ছা রাখি। খারিজম শাহ মেহেরবাণী করে তাঁদের পাঠিয়ে দেবেন এই আশা করি।"

পত্রের ভাষা যতই কোমল হোক না কেন খারিজম শাহের সাধ্যও ছিল না এর অমান্য করতে। তিনি সুলতানের দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণকে গোপনে ডেকে সমস্ত কথাই জানিয়ে দিলেন। স্বেচ্ছায় এ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে সুলতান যে বলপ্রয়োগ করতে এতটুকু কসুর করবেন না সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ত্রুটি করলেন না। সুধীবর্গের মধ্যে আবু নসর, আবুল হাসান এবং আলবেরুনী গজনীতে যাবার সম্মতি জানালেন কিন্তু ইবনে সিনা, আবুসহল অসম্মতি জানিয়ে খারিজমশাহের উপদেশ অনুসারে খারিজম ত্যাগ করে মাজান্দারান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। আলবেরুনী অন্য দুইজনের সহিত গজনীতে যেয়ে উপস্থিত হোলেন; তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হোল।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে আলবেরুনীর খারিজম ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানাবিধ মত দৃষ্ট হয়। কারুর মতে এর মূলে সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যবর্ধন স্পৃহাই বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল। এই মত পোষণকারীদের মধ্যে আবুল ফজল বয়হকী অন্যতম। আলবেরুনীর গ্রন্থাবলী থেকে ধারণা হয় তিনি মামুন নিহত হওয়ার পর খারিজম ত্যাগ করেন সে হিসাবে বয়হকীর মতই সত্য বলে মনে হয়। আলবেরুনী খারিজমে জুরজানিয়া নামক স্থানে মানমন্দির স্থাপন করে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ কার্য করতেন। কানুনে মাসউদী গ্রন্থে ৪০৭ হিঃ (১০১৬ খৃঃ) পর্যন্ত এমনি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লিখিত আছে। মামুনও ১০১৬ খৃঃ অব্দে নিহত হন। যা হোক আবুল ফজল বয়হকীর মতানুযায়ী সুলতান মাহমুদের খারিজম বিজয় অভিযান ইবনে সিনার জীবনী প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে যে কারণে এবং যেমন ভাবে আলবেরুনী গজনীতে উপস্থিত হোন না কেন, এই কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের কার্যাবলীর মধ্যেও বহু পরিবর্তন এসে দেখা দেয়। এর পূর্বে তিনি প্রায় সর্বস্থানেই রাজনীতির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে ছিলেন। খারিজমে অবস্থানকালে তিনি কার্যত মামুনের প্রধান মন্ত্রী হিসাবেই কাজ করতেন। এতে পার্থিব পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও তাঁর জ্ঞানানুশীলন যে সুস্থিরভাবে অগ্রসর হতে পেত না সে ঠিকই।

গজনীতে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রবই রইল না। সুলতান মাহমুদ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও তাঁর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নাই বরং খারিজমের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই রাখতেন বলে মনে হয়। ফলে তিনি শুদ্ধ মাত্র জ্ঞানানুশীলনে সময় কাটাতে বাধ্য হন। এতে তাঁর মানসিক অবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেছিল কিনা বলা না গেলেও তিনি যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অতি অধিক মাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন সে বোঝা যায় তার ভারত ভ্রমণ থেকেই। তাঁর নানাবিধ গ্রন্থ থেকে অতি সহজেই ধরা পড়ে যে তিনি ভারত ভ্রমণের পূর্বেই ভারত সম্বন্ধে এবং ভারতের বহুবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং গজনী পৌঁছবার বহু পূর্ব থেকেই ভারতে ভ্রমণ করে স্বচক্ষে সব দেখে সেখানকার জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেন। এই ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ এর পূর্বে হয়ে উঠে নাই গজনীতে এসে তিনি সে সাধ পূর্ণ করবার সুযোগ পান। তবে স্বাধীনভাবে শান্ত মনে তিনি তাঁর এ লিপ্সা চরিতার্থ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর "তাওয়ারিখে হিন্দ" এ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ দৃষ্ট হয়। ভারতে যেয়ে সেখানকাব জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করবার সুযোগ সুবিধা তাঁর পূর্বে অন্য কোন ব্যক্তি লাভ করেন নাই সে কথা তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন যে খোদা তাঁকে এমন সুযোগ সুবিধা জুটিয়ে

দিলেও ইচ্ছা মত কাজ করবার এবং গতি বিধির সুযোগ দেন নাই। স্বাধীনভাবে কাজ চালাবার উপযুক্ত ক্ষমতাও দেন নাই। মনে হয় পূর্বেকার রাজনৈতিক সংস্রবের জন্য তাঁর গতি বিধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হোত এবং তিনি তাঁর মনোমত আথিক সাহায্যও পেতেন না। অন্য স্থানে তিনি অভিযোগ করেছেন "নৃপতি এবং আমীর ওমরাহ্‌রাই পণ্ডিতগণকে সাংসারিক দৈনন্দিন ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দিয়ে আরও খ্যাতি অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। বর্তমান সময় তেমন নয় বরং ঠিক বিপরীত, তাই এখন নূতন কোন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা হওয়া অসম্ভব।" অবশ্য এ অভিযোগ পণ্ডিতগণের সর্বকালের, এর মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নেই। বর্তমান মুসলিম সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে আলবেরুনীর অবস্থা অনেক উন্নত বলেই মনে হবে। যা হোক এমনি অসুবিধা থাকলেও সাধারণভাবে মাহমুদ আলবেরুনীর প্রতি সদয় ব্যবহার করেছিলেন বলেই মনে হয়। আবুল ফতেহ বুস্তীর প্রশংসায় লিখিত কাসিদায় আলবেরুনী মাহমুদকেও অজস্র প্রশংসা করেছেন "মাহমুদ আমাকে অনুগ্রহ করতে কার্পন্য করতেন না। তিনি আমাকে প্রচুর ধন দান করেছেন, যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করেছেন, প্রচুর সম্মান করেছেন এবং মর্যাদাদানে আমার গৌরব ও পোযাক উজ্জল করেছেন।"

গজনী পৌছার কিছুদিন পরেই আলবেরুনী রাজদরবার ত্যাগ করে ভারতে গমন করেন এবং তথায় জ্ঞানানুশীলনেও

নানা তথ্য অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। ৪১০ হিঃ (১০১৯ খৃঃ অব্দ) থেকে ৪২০ হিঃ পর্যন্ত আলবেরুনীর গজনী অবস্থানের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, খুব সম্ভব এই সময়েই তিনি ভারতে ছিলেন। ১০২৯ খৃঃ অব্দে বা তৎসময়ে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ণে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে নূতন রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আলবেরুনীর প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরেই সুলতান মাহমুদ পরলোকগমন করেন। তাঁর দুই পুত্র মাসউদ ও মোহাম্মদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। মাহমুদের মৃত্যুকালে মাসউদ ছিলেন ইরাকে, মোহাম্মদ গজনীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মাসউদ পশ্চিম প্রান্তের প্রদেশগুলি এবং খোতবাতে মোহাম্মদের নামের সঙ্গে তাঁর নিজের নাম যোগ দেওয়ার দাবী জানালেন কিন্তু তাঁর এ দাবী অত্যন্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষিত হয় ফলে দুই ভাই সমর-আয়োজনে লিপ্ত হন। প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হবার পূর্বেই মোহাম্মদের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে অন্ধ করে দেয় এবং মাসউদের হাতে সমর্পণ করে। মাসউদ নিঃশঙ্কচিত্তে ১০৩১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই গোলযোগের সময় আলবেরুনী নিবিষ্টচিত্তে "কিতাবুল হিন্দ" রচনায় মত্ত ছিলেন। তিনি কোন পক্ষেই অনুরাগ দেখান নাই হয়ত বা শেষ ফলাফল না দেখে কোনদিকে অনুরক্তি প্রকাশ করবেন না স্থির করেই এরূপ রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতে এতটুকু বিচলতাও প্রকাশ করেন নাই।

মাসউদ পিতার ন্যায় শক্তিশালী শাসক না হোলেও সুশিক্ষিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আরবী পারসী উভয় ভাষায় তিনি ছিলেন বিশেষ বুৎপন্ন। সর্বোপরি ছিল তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। ফলে আলবেরুনীর কদর হতে দেরী হয় নি। তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে মনে হয় সুলতান মাহমুদের সময় তাঁর যে সমস্ত অসুবিধা ছিল সেগুলোও এই সময় বিদূরিত হয়। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কানুনে মাসউদী' মাসউদের নামানুসারে আখ্যাত করেন এবং তাঁকেই উৎসর্গ করেন। মাসউদও এর উপযুক্ত প্রতিদান দিতে ক্রুটি করেন নাই। বৈজ্ঞানিকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ "কানুনে মাসউদী" গ্রন্থ প্রণীত হোলে সুলতান মাসউদ আলবেরুনীকে এক হস্তী পরিমাণ রূপা উপহার প্রদান করেন। নির্লোভ বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের কোন ধনরত্নের দরকার নেই বলে এ সমস্ত অর্থ রাজকীয় ধনভাণ্ডারে ফেরত পাঠিয়ে দেন। বৈজ্ঞানিক ও নৃপতির মধ্যে এমনি সহৃদয়তার বিনিময়ে উভয়ে বন্ধু পর্যায়ে উপনীত হন। এই বন্ধুত্বের খাতিরেই আলবেরুনী সুলতান মাসউদের জন্য অতি সরল ভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় "দিবারাত্রির পরিমাপ বিষয়ক" একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। পুরে পুনরায় মাসউদের অনুরোধে "লাওয়াজিমুল হরকাতায়েন" নামক একখানি অতি উচ্চ ধরণের গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আলবেরুনীর ভাগ্যে অন্য

কোন বিরূপ ঘটনা ঘটে নাই বলে মনে হয়। তিনি নিরুদ্বেগ চিত্তে জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। বৈজ্ঞানিকের জীবনে কোন অশান্তি দেখা না দিলেও রাজনৈতিক জগতে গোলযোগের বিরাম হয় নাই। সেলজুকগণ মাসউদের রাজ্য বারবার আক্রমণ করে তাঁকে বিব্রত করে তোলে। ১০৩৯ খৃঃ অব্দে দন্দানকান নামক স্থানে তিনি তাদের হস্তে ভীষণ ভাবে পরাজিত হন, পিতৃ সাম্রাজ্যের অনেক অংশই তাঁর হস্তচ্যুত হয়। এমনি যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কালেই তিনি ১০৪০ খৃঃ অব্দে এক ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হন এবং তাঁর অন্ধ ভ্রাতা মোহাম্মদ পুনর্বার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অন্ধ মোহাম্মদ এর সৌভাগ্যও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। চারি মাস পরেই তি'ন মাসউদের পুত্র মওদুদ কর্তৃক শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও পুত্রসহ নিহত হন। মওদুদ ১ ৪০ খৃঃ অব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহন করেন। তিনিও কয়েক বৎসর রাজত্বের পর ১০৪৯ খৃঃ অব্দে নিহত হন। রাজনৈতিক জগতে এমনি গোলযোগ চলতে থাকলেও, আলবেরুনীর সাধনার কোন বিরাম হয় নাই। মনে হয় এই সমস্ত বিশৃঙ্খলতা তাঁকে বিশেষ বিচলিতও করতে পারে নাই। মওদুদ রাজ্যের আভ্যন্তারক বিশৃঙ্খলতা দূর করতে ও সেলজুকদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার জন্যে অন্য দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ না পেলেও পণ্ডিত বেরুনীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন বলে মনে হয় না। সুলতান মাসউদের দরবারে আলবেরুনীর যে স্থান ও মর্যাদা ছিল মওদুদের দরবারেও

তাতে ক্ষুণ্ণতা আসে নাই। মওদুদ যে তাঁর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় "আলমাজাহির ফিল জবাহির" গ্রন্থে। এ গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিক মওদুদের জন্যই প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া "আলদস্তুর" নামক গ্রন্থও মওদুদের নামে উৎসর্গ করেন। মওদুদের রাজত্বকালে তাঁর জীবনীর কোন বিশিষ্ট ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিকট লিখিত পত্রাদি থেকে এই বৃদ্ধকালের অবস্থার সামান্য কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাঁর একখানি পত্রের মর্মানুবাদ এখানে দেওয়া গেল—'এখন আমার বয়স চান্দ্র বৎসরের গণনা হিসাবে ৬৫ বৎসর এবং সৌর বৎসরের গণনা হিসাবে ৬৩ বৎসর। আমার স্বপ্ন ব্যাখ্যা সত্যে পরিণত হওয়া বিস্ময়কর নয় বটে কিন্তু এ আমার আকাঙ্খিত নয়। মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সুখের আশা করতে সে পরাঙ্মুখ নয়। সুসংবাদে যেমন সে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দুঃসংবাদে সে তেমনি বিমর্ষ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। হৃদয় মন যখন দুঃখে পরিপূর্ণ তখন সে ভবিষ্যৎ বার্তা জানতে চায়—ভবিষ্যতে কোন সুখের আশা পাওয়া যায় কিনা। আমিও এমনি দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত হয়ে জ্যোতিষীগণকে আমার ভবিষ্যত গণনা করতে অনুরোধ করতুম। তাঁরা আমার বয়স সম্বন্ধে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করতেন। কেউ বলতেন ষাটের কিছু উপরে কেউ বলতেন চল্লিশের কিছু উপরে ; তখন আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কিছু বেশী। এখন নানা সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি

কতকগুলি একই সময়ে দেখা দিয়েছে কতকগুলি বা পরপর দেখা দিয়েছে ফলে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমি দৈহিক শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলিয়েছি। হাড়গোড় যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে ; শরীর জরাজীর্ণ। চলা ফেরার শক্তি নাই বুদ্ধিরও স্থিরতা নাই তবে শরীরের এই অবস্থাতেও নিজের পূর্ব স্বভাবকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছি। এই সঙ্গে একষট্টি বৎসরের এক রাত্রির একটি ঘটনা বলছি। স্বপ্নে দেখলুম আমি যেন চন্দ্রের অস্তগমন ও নব চন্দ্রের আবির্ভাব স্থানগুলির দিকে তাকিয়ে আছি কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এমন সময় একজন আমাকে বলল তুমি এসব চেষ্টা পরিত্যাগ কর। তুমি ১০৯ বার ওর সন্তান হয়েছ। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি চান্দ্র বৎসরের ১৫ বৎসর ১০ মাসকে সৌর বৎসরে পরিণত করে তা থেকে সাড়ে পাঁচ মাস বাদ দিলুম। ফলে সব বুধের সালের নিকটবর্তী হোল। এরূপ হোলে জ্যোতিষীগণের মতে জন্মের সময় বুধের প্রভাব বেশী বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ ফল জেনেও আমার কোন আনন্দ হোল না। কারণ জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শুধু একটি কাজ বাকী আছে। সে কাজটি হোল অসম্পূর্ণ পুস্তকগুলোকে সম্পূর্ণ করা। "কানুনে মাসউদী" প্রভৃতি পুস্তকগুলির মুসাবিদা পরিষ্কার করে লেখা এবং যে সমস্ত ভারতীয় পুস্তকগুলি অনুবাদ করার ইচ্ছা আছে সেগুলো শেষ করা। এর জন্যে খোদার সাহায্য, মানসিক শান্তি, অনতিদীর্ঘ জীবন, বুদ্ধির স্থিরতা এবং বয়স অনুরূপ শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নয়।"

আলবেরুনীর এই পত্র থেকে মনে হয় এই সময় তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল।

যা হোক স্বাস্থ্যহানি হোলেও তাঁর জ্ঞান পিপাসা হ্রাস হয় নাই। এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এ পিপাসা সমভাবেই বর্তমান ছিল। ফকীহ আবুল হুসেন তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের যে ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যাবে এ জ্ঞান তপস্বীর জ্ঞানের পিপাসা কি প্রখর ছিল। "আমি আবু রায়হানের নিকট যেয়ে দেখলুম তাঁর শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়েছে। সেই অবস্থায়ই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি একদিন কৃত্রিম মাতামহীর হিসাবটা যেন কিরূপ বলেছিলেন আমি তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে সহানুভূতির সঙ্গে বললুম "এই অবস্থাতেই বলব।" তিনি বললেন হাঁ, এখনই বলুন, বিষয়টি জেনে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া না জেনে ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।" আমি তাঁকে বিষয়টি বললুম তিনি স্থিরভাবে শুনে নিয়ে নিজে তার পুনরাবৃত্তি করলেন। এর পর আমি সেখান থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে পড়তেই কান্নাকাটি শুনতে পেলুম।" ৪৪০ হিঃ ২রা রজব (১০৪৮ খৃঃ অব্দে ১২ ডিসেম্বর) শুক্রবার ৭৫ বৎসর বয়সে এই মহাজ্ঞানী গজনীতে পরলোক গমন করেন। যতদূর জানা যায় গজনীতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় কিন্তু তাঁর কবরের কোন চিহ্ন কোথাও বর্তমান নাই।

আলবেরুনীর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে কিরূপ নির্বাক ছিলেন তার পরিচয় তাঁর প্রথম জীবনের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

বংশ পরিচয়, জীবনের সুখ দুঃখের ক্রমিক ইতিহাস তিনি কোথাও রেখে যান নাই ফলে পূর্ব পুরুষদের পরিচয় যেমন অজ্ঞাত রয়ে গেছে, জীবন কাহিনী যেমন অস্পষ্টতার আবরণে ঘেরা রয়েছে পরবর্তী পুরুষগণের পরিচয় ততোধিক অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সন্তান সন্ততির কথা দূরে থাক তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধর্মমতে আলবেরুনী ছিলেন শিয়া মুসলিম। কিন্তু ধর্মের প্রতি অনুরাগ কোথাও তাঁকে গোঁড়ার পর্যায়ে ফেলতে সক্ষম হয় নাই। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মকে বিশ্বাসের বস্তু হিসাবে বাইরে রেখে এগিয়ে চলেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায়। এ সাধনার পথে ধর্মের অনুশাসন কি গোঁড়ামির ভ্রুকুটি এসে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নাই। ফলে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনায় তাঁর অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী অতি সহজ গতিতে সুন্দরভাবে সমাবিষ্ট হয়ে রয়েছে। "কিতাবুল হিন্দে" তিনি সময় সময় ভারতীয় হিন্দুগণের আচার ব্যবহার রীতিনীতির সঙ্গে মুসলমানদের আচার ব্যবহার রীতিনীতির পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইসলামের গণতন্ত্রের সঙ্গে হিন্দুগণের জাতিভেদ প্রথা, মুসলিমদের সুষ্ঠ বৈবাহিক নিয়ম কানুনের সঙ্গে হিন্দুদের বিবাহে বর্বর প্রথা, মুসলমানগণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে হিন্দুদের নোংরামি প্রভৃতিকে তিনি তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের বিশেষত আরবদের কুপ্রথা ও অন্যায় কার্যগুলিকে আক্রমণ করতে পিছপাও হন

নাই। তিনি তাঁর "আসারুল বাকিয়াতে" সাসানীয় সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য পূর্বেকার মুসলিমদের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেছেন। কিতাবুল হিন্দেও যখনই হিন্দুদের কোন কুসংস্কারের কথা আলোচনা করেছেন তখনই পূর্বেকার আরবদের কুসংস্কার ও কুকার্যের কথাও প্রকাশ করতে নিরস্ত হন নাই। কোন ধর্মের গোঁড়া অনুরক্ত ভক্তের পক্ষেই এমনি নিরপেক্ষ উদার সমালোচনা আশা করা যায় না।

ধর্ম এবং দর্শন বিষয়ে তিনি সব সময়ে স্বাধীন ভাবেই মত ব্যক্ত করেছেন, কারুর অনুরাগ কি বীতরাগ কোন কিছুই তাঁর মত বদলাতে সক্ষম হয় নাই। অর্ধ সত্য, ঘোরালো কথা, পরিবর্তনীয় মতকে তিনি কোন সময়েই ক্ষমার চোখে দেখেন নাই। সত্যের মর্যাদা কথায় এবং কাজে রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়েই তিনি কাজে লিপ্ত হয়েছেন। নিজের উপর এমনি অখণ্ড বিশ্বাস, সত্যের মহিমার প্রতি এমনি প্রগাঢ় অনুভূতির জন্যেই তিনি গোঁড়ামিকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন বলা চলে। বাইবেলের 'এক গালে চড় দিলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও' উপদেশের অন্তর্নিহিত মাধুর্যকে তিনি নিরাবিলভাবে প্রশংসা করলেও বাস্তব জগতে এর অনুপযোগিতার উল্লেখ করতেও পিছপাও হন নাই। "কিতাবুল হিন্দে" হিন্দুদের মধ্যে শাস্তি দেবার প্রথার বর্ণনা প্রসঙ্গেই এর অবতারণা হয়েছে। "এ বিষয়ে হিন্দুদের রীতিনীতি অনেকটা খৃষ্টানদের রীতিনীতির মতই। খৃষ্টানদের মতই এ সমস্ত শাস্তিও অনেকটা

করুণা মাখান—যেমন কাউকে কোন অবস্থাতেই বধ না করা, যে তোমার কোট নিয়ে গেছে তাকে তোমার সার্টও দিয়ে দাও, যে তোমার এক গালে চড় দিয়েছে তাকে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও, তোমার শত্রুকে আশীর্বাদ কর, এবং তার জন্যে প্রার্থনা কর, জীবনের দোহাই এগুলি সবই মহৎ দর্শন কিন্তু জগতের সব লোকই দার্শনিক নয়। অনেকেই অজ্ঞ এবং ভুল করতে অভ্যস্ত, তারা চাবুক এবং তরবারী ছাড়া সোজা পথে চলবে না। বাস্তবিক এই জন্যেই বিজয়ী কনষ্টেনটাইন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও চাবুক এবং তরবারী ব্যবহার করেছেন। সত্যি সত্যিই এ দুটো ছাড়া শাসন কার্য চালান অসম্ভব।" রাজনীতিতেও তাঁর এমনি অনমনীয় দৃঢ়তা ও সত্যানুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর মনে হয় রাজনীতিতে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবীয় ছিলেন। "কিতাবুল হিন্দে" তাঁর এই মনোভাবের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে যদি শাসকের উপযুক্ত চরিত্র ও ক্ষমতাধারী কোন ব্যক্তি সুশাসনের আকাঙ্খা নিয়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে নূতন কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যদি তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে শত বাধা বিপত্তিতেও অচল অটল থাকেন, তাঁর দুরবস্থার সময় লোকে তাঁর পূর্ব কীর্তি স্মরণ করে সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ না হয় তা হোলে তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থা লোকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করবে। যদি এই নব ব্যবস্থায় উদ্দীপিত সমাজ ধর্মের সঙ্গে যোগ রেখে চলে, তা হোলে রাজ্য এবং ধর্ম এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে অবস্থার

উদ্ভব হবে, সে হবে মানব সমাজের সর্ব শ্রেষ্ঠ উন্নতির প্রতীক। মানুষে এর বেশী কিছু আশা করতে পারে না।

মানুষ হিসাবে আলবেরুনী যত বড়ই হোন না কেন, তাঁর উদারতা ও মহাপ্রাণতা একাদশ শতাব্দীর অহমিকা ও গোঁড়ামি ছাড়িয়ে যত উচুতেই উঠে থাকুক না কেন নশ্বর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোও লোকের স্মৃতিপথ থেকে মুছে যেতে বাধ্য কিন্তু যা তাঁকে আজও জিইয়ে রেখেছে সে হোল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য অপরিসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন, পুরাণকে ভাল ভাবে জেনে নিয়ে নূতন নূতন জ্ঞানকে করায়ত্ত করে সমাজ, জাতি, সংস্কৃতিও সভ্যতাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ সাধনা। তাঁর সন্তান সন্ততি ছিল কিনা সে আজ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ালেও তাদের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কারুর মনে এতটুকু চিন্তার রেখাপাত করতেও অক্ষম কিন্তু তাঁর মানসসন্তান গ্রন্থগুলি আজ সমগ্র বিশ্বের সম্পদ, সবার আদরের বস্তু। জাতি, দেশ, সমাজ, ভাষা সব কিছুর পার্থক্য এড়িয়ে সেগুলো তাদের প্রণেতাকে উজ্জল ও মহিমান্বিত করে তুলেছে। সৃষ্টিকর্তা মাত্রেরই নিজের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি একটা অহেতুক মায়া থাকে। আলবেরুনীও সে দুর্বলতা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। সে দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পত্রাবলীতে। তিনি এক পত্রে উল্লেখ করেছেন "যে সমস্ত বিষয়ে প্রথম জীবনে পুস্তক লিখেছিলুম, সে সমস্ত বিষয়ে এখন আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু সে পুস্তকগুলোকে আমি

পরিত্যাগ করি নাই বা অবহেলাও করি নাই কারণ সেগুলো আমার সন্তান সন্ততি।"

এই সমস্ত সন্তান সন্ততি তাঁর ত্যাগোজ্জল সাধনাসিদ্ধ পণ্ডিত জীবনের জয় ঘোষণা করছে। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ আলোচনা ছিল বহুমুখী এবং আশ্চর্যরূপে ব্যাপক। এই সমস্ত আলোচিত বিষয়ের ব্যাপকতা থেকেই তাঁর নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করছে। গণিত, জ্যোতিষ, পুরাতত্ত, দর্শন, ন্যায়, সভ্যতার ইতিহাস, দিনপঞ্জীর তালিকা ও ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত, উদ্ভিদতত্ত, ভূতত্ত, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপের নিদর্শন বর্তমান। প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন। গ্রন্থগুলি গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে পাঠককে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে। এক ব্যক্তির পক্ষে এমনি ভাবে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা কতদূর আয়াসসাধ্য এবং কি সাধনার ফল সে ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। তাঁর জীবনী লেখক শাহরজুরীর ভাষায় "তাঁর হাত থেকে কলম কোন সময়েই অন্যত্র থাকবার অবসর পেত না, তাঁর চক্ষুরও বইয়ের পাতা ছাড়া বাইরে দৃষ্টি দেবার ফুরসৎ হত না। নওরোজ ও মিহরগণ—বৎসরের এই দুই দিন ছাড়া তাঁর মন থাকত সব সময়েই জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় ও চিন্তায় ভরপুর। ঐ অবসরের দুই দিনে তিনি শুদ্ধ মাত্র জীবন ধারণোপযোগী সারা বৎসরের খোরাক পোষাক বরাদ্দ করে নিতেন।"

সমস্ত বিষয়ে গভীর জ্ঞান আহরণের জন্য সর্বপ্রথম দরকার বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং সহজেই ভাষা হতে ভাষান্তরে অনুবাদের জন্য একই ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমে গেলেও যাঁরা সত্যি সত্যি বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক তাঁদের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা অনেকটা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে এ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। পথের দুরতিক্রম্যতাকে মানুষ তখনও বশে আনতে সক্ষম হয় নি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সংস্কৃতির বিনিময় হবার মত যোগাযোগও স্থাপিত হতে পারে নাই। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার অনুবাদও তাই সহজ ও স্বচ্ছন্দগতি পায় নাই। মুদ্রণের অভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাও ক্ষুদ্রতর গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর গণ্ডীতে ছড়িয়ে পড়তে আপনি বাধা পেত। সে সময়ে কেউ যদি সত্যিসত্যিই দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির খবর রাখতে চাইতেন তা হোলে তাঁকে নানা ভাষা শিক্ষার কষ্টও সহ্য করতেই হত। প্রকৃত পক্ষে সেইসময়ে যিনি যত ভাষায় পারদর্শী হতে পারতেন তাঁর পক্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার পথও ততই সহজসাধ্য হয়ে পড়ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে তাঁর দানও ততই কল্যাণকর হত। মুসলিম জগতে এদিক দিয়ে আলবেরুনীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রফেসর সাকাওএর মতে আলবেরুনী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি (Al Beruni was

the greatest intellect that ever lived on this earth).

যা হোক আলবেরুনীর এই অগাধ পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল তাঁর নানা ভাষায় অবাধ অধিকার। আরবী এবং পারসী মাতৃভাষা না হোলেও সে সময়কার মুসলিম জগতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই দুইয়ের অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতা ছিল অপরিহার্য। আরবী ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান তথা সংস্কৃতির বাহন; ধর্মশাস্ত্রও আরবীতে লিপিবদ্ধ। তাই মুসলিম হিসাবে যেমন আরবী জ্ঞান আবশ্যক হত তেমনি সংস্কৃতির কোন বিষয় আলোচনা করতেও আরবী ছিল অপরিহার্য। সমগোত্রীয় ভাষা হিসাবে এবং নৃপতিবর্গের উৎসাহে পারসীও আরবীর মত প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরই অন্যতম অপরিহার্য বিষয়ে পরিগণিত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এই দুইয়েই ছিলেন আলবেরুনী অতিমাত্রায় পারদর্শী। আরবী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য হিসাবে তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজিই বর্তমান। অধ্যাপক সাকাও এর মতে তিনি এ ভাষায় এমন পারদর্শী ছিলেন যে তাঁর শব্দ যোজনা ও রচনা আরবীভাষায় এক অপূর্ব সৃষ্টি বলা চলে। তিনি যে স্থানে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেস্থানে সে শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দেরই সামঞ্জস্য হত না। তবে তাঁর ভাষা অনেক সময়েই কর্কশ। এমনিতে তিনি আলবাত্তানীর মত লম্বা লম্বা বাক্য ব্যবহার না করলেও তাঁর ভাষা বুঝা খুবই কষ্ট সাপেক্ষ। অবশ্য এর মূলে রয়েছে

আরবী ভাষার উপর অগাধ দখলের সঙ্গে আলোচিত বিষয়গুলির দুরূহতা। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে শুধু কাব্যের খাতিরে একই ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ফলে অনেক স্থানে আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে পড়েছে। তাঁর কাজেও যাতে এর পুনরুক্তি না ঘটে সেইজন্যেই আলবেরুনী অনেক সময় কঠিন বাক্যবিন্যাস ব্যবহার করেছেন। কিতাবুত্ তফহীমের পারসী সংস্করণই তাঁর পারসী জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিদেশীয় ভাষার মধ্যে হিব্রু ও সিরীয় ভাষায় তাঁর বেশ অধিকার ছিল বলে মনে হয়। "আসারুল বাকিয়ার" অনেক স্থানে তিনি এই দুই ভাষায় মূলোক্তি উধৃত করেছেন। মূল ভাষার উপর অধিকার না থাকলে সে বিষয়ে মূল গ্রন্থ থেকে উধৃত করার চেয়ে অনুবাদ দেওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ দুইয়ে তাঁর জ্ঞান কেমন ছিল সে বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যা হোক এ সমস্তকে ছাপিয়ে যা তাঁকে সব চেয়ে মহিমান্বিত করে তুলেছে সে হোল তাঁর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য। অন্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ভাষা হিসাবে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন শিখবার পক্ষে কোন বাধা জন্মাতে পারে না কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে কোন বিদেশীর পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শিখবার পক্ষে হিমাচলের মত দুর্ভেদ্য বর্ম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এমনি কতকগুলো অস্বাভাবিক বাধা। এ বাধা অতিক্রম করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কেননা এ ঠিক ভাষার তরফ থেকে আসে নাই। মনে হতে পারে কোন পারস্যবাসীর

এ অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দ বিন্যাস পদ বিন্যাস সম্বন্ধে তার মাতৃভাষার সঙ্গে কোন মিল নেই, ভাব বিন্যাসও বিদেশী, আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নয়। এই সব মিলে ভাষাকে বিদেশীর পক্ষে কঠিন করে তুললেও তার শিখবার পথকে রোধ করতে পারে না অন্তত যেখানে আগ্রহ থাকে অতি উচ্চ স্তরে বিরাজমান। এ বাধা এসেছিল সংস্কৃত ভাষাভাষী ভারতীয়দের অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা থেকে। সাম্রাজ্য পিপাসু এবং দিগ্বিজয় আকাঙ্খী সামরিক শক্তিশালী নৃপতিদের করুণায় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বাইরে কিছু কিছু প্রকাশ পেলেও প্রজ্ঞার কথা সঠিকভাবে কিছুই প্রকাশিত হতে পারে নাই। সে ছিল শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে নব সভ্যতার বাণীতে উদ্বুদ্ধ মুসলিম জাতি যখন বিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই কিংবদন্তীতে উচ্চ প্রশংসিত ভারতের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি পড়ে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ থেকে গণিতের উপর যে প্রভাব পড়েছিল তা ছাড়া অন্য বেশী কিছু ঘটতে পারে নাই। পরে খলিফাদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা পুস্তক এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ সুধী পণ্ডিত বাগদাদে নীত হোলেও জ্ঞান পিপাসু পণ্ডিতদের পক্ষে সেগুলো ছিল অতি আকাঙ্খিতকর মাত্র। মূল ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে শুধু মাত্র অনুবাদের সাহায্যে সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ কোন দিনই তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। গ্রীক ভাষা জানতে আরব

মনীষীদের কোন অসুবিধাই হয় নাই কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁদের আন্তরিকতা কোনদিনই ভালভাবে ঘটে উঠতে পারে নাই। খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময় বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হোলেও, সে চর্চা ভারতবাসী কর্তৃক সংস্কৃত থেকে আরবী পারসীতে অনুবাদের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। দর্শন বিজ্ঞানের মত দুরূহ জিনিসের স্থান তার মধ্যে ছিল নিতান্ত নগন্য। এ ছাড়া যে স্থানের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা নিয়ে আলোচনা সেই স্থানের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গেও কারুর সম্যক পরিচয় ছিল না। গ্রীকদের জ্ঞানবিজ্ঞান ধারার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হবার জন্যে মুসলিম মনীষিগণ সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, আলেকজেন্দ্রিয়া প্রভৃতিতে অবাধ ভ্রমণ করে বেরিয়েছেন কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় এসে অবাধ পরিভ্রমণ দূরের কথা ভারতে তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের লীলাভূমি আর্য্যাবর্তে প্রবেশ লাভ করবার সুযোগও তাঁদের হয় নাই। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত সিন্ধু প্রদেশ মুসলিম জাতির করতলগত হোলে সর্বপ্রথম মুসলিম জাতি ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয়ের সুযোগ পান। কিন্তু সিন্ধু বাগদাদ থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর এ সুযোগও নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত বলতে গেলে আলবেরুনীর পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ করে ভারতীয়দের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মুসলিম মনীষীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে তার পূর্বেকার ইতিহাস ভালভাবেই জানা দরকার। অন্য দেশে সে সমস্ত বিষয়ে কতদূর উন্নতি

হয়েছে তা জানতে হোলে প্রথম দরকার সে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, দ্বিতীয়ত সেই বিদেশীয় জাতি এবং তাদের ভাষার সঙ্গে সবিশেষ পরিচয়। আলবেরুনীর পূর্বে এবং পরে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই প্রাজ্ঞ মুসলিম মনীষীর অভাব না থাকলেও ভারতের কৃষ্টির ভাষা সংস্কৃত শিক্ষা, এবং ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ সম্বন্ধে আলবেরুনীর নিজের কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাবে ঃ—

"আমাদের কাজ সুরু করবার পূর্বেই ভারতীয় কোন জিনিসের বিষয় সম্যক জ্ঞান লাভ করবার পক্ষে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি আছে সেগুলো জেনে নেওয়া দরকার। পাঠকগণ সব সময়েই স্মরণ রাখবেন যে হিন্দু জাতি প্রায় সব বিষয়েই আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমত ভাষার কথা ধরা যাক। এক জাতির ভাষার সঙ্গে অন্য জাতির ভাষার পার্থক্য থাকেই কিন্তু ভারতের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার পার্থক্য অতি দূর বিস্তৃত। সংস্কৃত ভাষা আরবী ভাষার মতই অজগর কুণ্ডলী পাকান। ভারতীয়েরা তাঁদের ভাষার এই কুণ্ডলীত্ব নিয়ে গর্ব বোধ করেন বটে কিন্তু আসলে ভাষার পক্ষে এ একটি মস্ত বড় অন্তরায়। ভাষাটির আবার দুইটি স্তর দেখা যায়। একটি উপেক্ষিত নিম্ন স্তরের অবস্থায় দ্বিতীয়টি classical, উচ্চ শ্রেণীর লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। এটি বেশ উচ্চ স্তরের, ব্যাকরণ ও ছন্দ প্রকরণের সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধভাবে পরিচালিত। ভারতীয় সমস্ত

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলিই কাব্যে লিখিত। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এতে প্রক্ষেপ বা বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না এবং তাঁদের বিজ্ঞান বিশুদ্ধ ভাবেই রক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁরা একটি কথা ভুলে গিয়েছেন যে কাব্যে শুধু ছন্দের খাতিরেই কতকগুলো অবোধ্য এবং সঙ্কুচিত ভাবকে ঢুকিয়ে দিতে হয়, তা ছাড়া অনেক সময় অযথা বেশী কথারও আমদানী করতে হয়। একই কথা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ারও এ অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হোল ধর্মের। হিন্দুজাতি ধর্মের ব্যাপার নিজেদের মধ্যে বাক্যবিরোধ ছাড়া দৈহিক বিবাদ বিসম্বাদ না করলেও তাঁদের যত গোঁড়ামী ও আক্রোশ সমস্ত হোল বিদেশীয়দের উপর। তাঁরা বিদেশীগণকে ম্লেচ্ছ বা অপ বত্র বলে জ্ঞান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব দূরের কথা, তাঁদের সঙ্গে খাওয়া বসা বা পান করা পর্যন্ত ঘৃণা করেন। আমাদের সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারেও এতদূর পার্থক্য বর্তমান যে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদিগকে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়ে ভয় দেখান। এ সমস্ত ছাড়া আর একটি মস্ত বড় কারণ তাঁদের জাতীয় দাম্ভিকতা। যদিও এ রহস্যের মতই শুনাবে তবুও এ তাঁদের জাতীয় জীবনে দৃঢ় শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই বেশ সুপরিস্ফুট। আমরা শুধু বলতে পারি যে এ নির্বুদ্ধিতার কোন ঔষধ নাই। হিন্দুরা মনে করেন তাঁদের দেশের মত কোন দেশ নাই, তাঁদের মত কোন লোক নাই, তাঁদের রাজার মত রাজা নাই, তাঁদের ধর্মের

মত ধর্ম নাই, তাঁদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নাই। তাঁরা উদ্ধত, দা স্তিক এবং অহঙ্কারী, তাঁরা স্বভাবতই অন্যেদের সঙ্গে নিজেদের জ্ঞাত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ এমন কি নিজেদের মধ্যেও এক সমাজ অন্য সমাজকে নিজেদের বিষয় জানতে দিতে অনিচ্ছুক, বিদেশী বিজাতির সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। তাঁদের ধারণা সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁরা ছাড়া আর কেউই বিজ্ঞান জানে না। যদি আপনি তাঁদিগকে খোরাসান ও পারস্যের বিজ্ঞান আলোচনার বা তথাকার সুধীবর্গের কোন কথা বলেন তা হোলে তাঁরা আপনাকে জলজ্যান্ত মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে যদি তাঁদের দেশবিদেশে ভ্রমণ এবং অন্য লোকের সঙ্গে মেশবার অভ্যাস থাকত তা হোলে তাঁরা এমন সঙ্কীর্ণমনা হতেন না বরং তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মতই উদার হতেন।

পণ্ডিত বরাহমিহির একস্থানে ব্রাহ্মণদের ভক্তি করার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন "গ্রীকরা যদিও অপবিত্র তবুও সম্মানের পাত্র। কেননা তারা জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এবং অন্যান্যের চেয়ে অনেক উন্নত। যে ব্রাহ্মণ নিজের পবিত্রতার সঙ্গে প্রজ্ঞাও জুটিয়ে নিয়েছেন তা হোলে তাকে কত সম্মান করতে হবে!" পুরাকালের হিন্দুরা স্বীকার করতেন যে তাঁদের চেয়ে গ্রীকদের দ্বারাই জ্ঞানবিজ্ঞানে বেশী উন্নতি হয়েছিল কিন্তু বরাহমিহিরের এই উক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি কেমন অন্যের প্রতি বিচার করবার ভাণ করে আত্মশ্লাঘায় মশগুল হয়ে পড়েছেন। প্রথমে আমি তাঁদের জ্যোতির্বিদদের ছাত্র হিসাবেই

অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলুম। তাঁদের কায়দাকানুনগুলো আয়ত্ত হবার পর আমি তাঁদের এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির কথা বলতে সুরু করি এবং যুক্তিতর্কসহ অঙ্কের সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতিকে কতদূর উন্নত করা যেতে পারে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এতে তাঁরা বিশেষ অভিভূত এবং মুগ্ধ হয়ে পড়েন সবাই আমাকে ঘিরে ধরে আমার নিকট থেকে এ সমস্ত শিক্ষা সুরু করেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন আমি কোন হিন্দু পণ্ডিতের নিকট এ সমস্ত শিক্ষা করেছি। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে আমি কোন হিন্দু পণ্ডিতের নিকট এ সমস্ত শিক্ষা করি নাই তখন তাঁরা আমাকে যাদুকর বলে মনে করতে লাগলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন যে লোকটি একটি সমুদ্রবিশেষ।

এই হোল ভারতের অবস্থা। তবে আমি বিষয়টি শিক্ষা করার জন্যে কোনরূপ পরিশ্রম স্বীকার করতেই পরাঙ্মুখ হই নাই। যে রকম ভাবে যেখানে পাওয়া যাক না কেন এই সমস্ত বিষয়ের সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি এবং এগুলিকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে দূরদূরান্তর থেকে পণ্ডিতদের আনয়ন করতেও ত্রুটি করি নাই। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সততার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সাধারণে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি জড়িয়ে নিয়ে খিচুড়ী পাকিয়ে তুলেছেন। আমি তাঁদের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাকে একসঙ্গে মুক্তা এবং গোবর,

বহুমূল্য প্রস্তর এবং সাধারণ পাথরের সংমিশ্রণ মনে করি। এই সবই তাঁদের চোখে সমান কেননা বৈজ্ঞানিক সততাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে সাধারণের মধ্যে কার ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের উর্ধে উঠবার মত সৎসাহস তাঁদের কারুরই নাই।"

দুর্গমগিরি প্রান্তর পার হয়ে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে বিদেশে আত্মীয় স্বজনহীন বিধর্মীদের মধ্যে বাস করে তাদের অবোধ্য ভাষা শিখে জ্ঞান আহরণ করা কতখানি সহিষ্ণুতা ও জ্ঞানপিপাসার পরিচায়ক সে আজকাল চিন্তা করাও কষ্টকর। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সহানুভূতিহীন, সম্পর্কহীন শত্রুভাবাপন্ন দেশে নিজের ধর্ম, নিজের দেশ সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে বিধর্মী শত্রুর জ্ঞানজগৎ আয়ত্ত করা অসাধারণ মানসিক শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। সেইভাবেই আলবেরুনীকে বিচার করে দেখতে হবে।

আলবেরুনী গ্রীক ভাষা জানতেন কি না সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। প্রফেসর সাকাও এবং স্যার জিয়াউদ্দিন তাঁকে গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ বলেই মত প্রকাশ করেছেন। স্যার হেনরী ইলিয়ট তাঁর History of Indiaতে আলবেরুনী কয়েকখানি গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। Prof. F. Krenkow এই মত সমর্থন করেন। আলবেরুনী তাঁর বৃদ্ধবয়সে লিখিত ঔষধি সম্বন্ধে গ্রন্থে নিজের জীবনী বিষয়ে যে দুই এক কথা বলেছেন তা থেকে মনে হয় তিনি গ্রীকভাষাও জানতেন। পুস্তকখানির ভূমিকায় তিনি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মাতৃভাষা বিজ্ঞানের পুস্তক লিখতে ব্যবহৃত হয় না। আরবী এবং পারসী উভয়ই আমার পক্ষে বিদেশী ভাষা। কিন্তু এই দুই ভাষার মধ্যে কি অগাধ পার্থক্য বিদ্যমান। আরবী থেকে পারসীতে অনুদিত কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ দেখলেই বুঝা যাবে সৌন্দর্য এবং স্পষ্টতা কেমনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। আসল কথা পারসী শুধু গালগল্পের বা জিন পরীদের গল্প বলবার জন্যেই উপযুক্ত। আমার যৌবনকালে আমি কোন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতের নিকট গ্রীকভাষা এবং গাছপালার গ্রীকনাম শিক্ষার জন্য গমন করতুম। এই গ্রীক নামগুলি আরবীভাষায় লেখা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আরবী ভাষা তার অসামান্য সৌন্দর্য সত্বেও দুইটি বিশেষ দোষযুক্ত। একটি তোল অনেকগুলো অক্ষর একই রকমের, শুধু বিন্দুর সাহায্যে তাদের পার্থক্য ঠিক করতে হয় কিন্তু লেখকগণ বিশেষ করে নকলকারীগণ অনেক সময়েই এগুলোর প্রতি সাবধান হন না। দ্বিতীয়ত এর উচ্চারণ পদ্ধতি (vocalisation)।" তিনি অন্যত্র বলেছেন "ধার্মিকগণ সাধারণত যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দে (technical term) 's' সংযুক্ত আছে, সেগুলোকে পৌত্তলিকতার প্রতীক বলে মনে করেন কিন্তু গ্রীক ভাষায় এই 's' গুলো আরবী ভাষার ইরাবের কার্য করে, তা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।" অন্যত্র তিনি থিবকে (Thebes) পুরাতন মিশরের রাজধানী বলে উল্লেখ করে বলেছেন "কবি হোমার তাঁর কাব্যে এই রাজধানীর কথা উল্লেখ করেন।" এই সমস্ত থেকে মনে হয় আলবেরুনী গ্রীকভাষায়ও বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন।

আলবেরুনীর বিশ্বশোষিকা জ্ঞান, যুগপৎ পূর্বেকার ইতিহাস সঙ্কলন এবং বিজ্ঞানে নব নব মৌলিক আবিষ্কার এ সবের একত্র সমাবেশ দেখলে সত্যিই বিস্ময় বিমুগ্ধ হতে হয়। সাধারণত বৈজ্ঞানিকগণ ঐতিহাসিক নন। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল সংবাদ দিতে পারেন তাঁরাই কিন্তু বিজ্ঞানের চিন্তায় বিভোর মন, নূতনত্বের মোহে মশগুল প্রাণ ইতিহাসের পুরাণ স্মৃতি ঘাটতে রাজী নয় তাই বিজ্ঞানের ইতিহাস এমনি এলোমেলো। আলবেরুনীর বেলায় এসে কিন্তু ঘটেছে এর ব্যতিক্রম। তাঁর সমস্ত কাজেই ইতিহাস এবং নব আবিষ্কারক বিজ্ঞান বুদ্ধি একসঙ্গে যোগ দিয়েছে। হিন্দু সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস কিতাবুল হিন্দে, জ্যামিতিক কায়দা কানুন, নানা গণিতিক আলোচনা তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা বিশেষত গণিতশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অতি সহজেই পাঠকের চোখে ধরা পড়ে আবার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পুস্তক কানুনে মাসউদীর মধ্যে পূর্বেকার ইতিহাস উল্লেখ তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কানুনে মাসউদী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা যেতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার মধ্য দিয়ে ত্রিকোণমিতিকে তার পরিচিত গণ্ডী ছাড়িয়ে উচ্চস্তরে উন্নীত করার মধ্যে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। প্রাচ্যে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ত্রিকোণমিতি কতদূর উন্নত হয়েছিল তার সাক্ষ্য হোল এই "কানুনে মাসউদী।"

প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের স'ত্যকার ইতিহাস জানতে হোলে এর সাহায্য ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। গ্রন্থখানি যে গণিতের দিক দিয়ে অতি উচ্চাঙ্গের তার প্রমাণ হোল এই ধরণের অন্যান্য গ্রন্থের মত এর ভাষ্যের অভাব। এ থেকেই মনে হয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেন নাই। খুব সম্ভব নাসিরউদ্দিন তুসী তাঁর বিখ্যাত ত্রিকোণমিতির গ্রন্থ "কিতাবু শাকলুল কাতআ" প্রণয়ন করবার পূর্বে কানুনে মাসউদী পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত Nicolas de khanekoff এর Quarterly Reviewতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে, এ গ্রন্থের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সর্বপ্রথম মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিজ্ঞানচর্চাকারী দেশ হিসাবে পূর্ব পারস্যের দাবীই অগ্রগণ্য। এই দেশই এশিয়ার সভ্যতার উদ্বোধক হিসাবে দাবী করতে পারে এবং এই স্থানেই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচিত হয়। তাঁর মতে "চীন এবং ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে এখানকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। খুব সম্ভব এই দুই দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার মূলে ছিল পূর্ব পারস্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান। এ দেশ জ্ঞানবিজ্ঞানে কত উন্নত হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ত্রিকোণমিতি আবিষ্কারের বহুপূর্বে সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করার জন্যে খারিজমে Sine quadrant ব্যবহৃত হত।

এ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কারণে প্রাচ্যের মধ্যে এই দেশটি জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতার প্রগাততে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে তার প্রভূত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সুনিপুণ ঐতিহাসিক আলবেরুনী। প্রাচ্যের সমস্ত দেশের বিজ্ঞানচর্চাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বাছাই করে নিয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান ফল লিপিবদ্ধ করেন। সভ্যতা তথা জ্ঞানবিজ্ঞানের সত্যিকার ইতিহাস জানতে হোলে আবু রায়হানের গ্রন্থাবলীর পূর্ণ অনুবাদ হওয়া দরকার।" বলা বাহুল্য এর পরেই আলবেরুনীর গ্রন্থাবলী বিশেষ করে কানুনে মাসউদীর পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ ও অনুবাদের জন্য সমগ্র পাশ্চাত্যে অধীর আগ্রহ জেগে উঠে। প্যারী Academy of Scienceএ দুই দুইবার এ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে! কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে চেষ্টাও করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ ও অনুবাদ এ পর্যন্ত হয়ে উঠে নাই।

কানুনে মাসউদী বিজ্ঞান জগতে কি বিপ্লব এনেছিল সে এর ত্রিকোণমিতির আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে। নীরস বিষয় বস্তুর আলোচনার মধ্যেও গ্রন্থকার কেমনভাবে নিজেকে মশগুল করে দিয়েছেন, সত্যের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে কেমনভাবে অপক্ষপাত সমালোচনাতে বিজাতীয় বিধর্মীকে নিজের জাতির উপর স্থান দিয়েছেন এর প্রতিটি প্রতিপাদ্য উপপাদ্য বিষয়ের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। টলেমি এবং ইয়াকুব উভয়েই বৃত্তির পরিধির অন্তঃস্থিত ও বহিস্থিত Polygon এর মধ্যমান গণনা করেছেন, উভয়েরই শেষফল নির্ভুল কিন্তু দুইজনের উপায়

বিভিন্ন। উপায় দুইটির দুর্বলতা আলবেরুনীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয় নাই। তিনি টলেমির গণনায় সন্তুষ্ট হন নাই তাঁর উপায়টির সঙ্গেও একমত হন নাই তবে তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যে বৈজ্ঞানিকত্ব আছে বলে প্রশংসা করেছেন; কিন্তু ইয়াকুব যখন $\frac{15}{16}$° ডিগ্রীর চাপ (arc) গণনা করে π এর মূল্য বের করবার জন্যে এরই সঙ্গে এর $\frac{1}{16}$ অংশ যোগ করে অন্য একটি কোণের চাপ বের করতে চেষ্টা করেছেন, আলবেরুনী তখন আর নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারেন নাই। এই অবৈজ্ঞানিক প্রথাকে তিনি নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন। দুইজনের উপায়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন "টলেমি এবং ইয়াকুব দুইজনের উপায়েই দশমিকের তৃতীয় স্থান পর্যন্ত বিশুদ্ধ ফল পাওয়া গেলেও টলেমি যা করেছেন সমস্ত বুঝেসুঝেই করেছেন কিন্তু ইয়াকুব বুঝতেই পারেন নাই যে তিনি কি করেছেন। শুধু সমালোচনা করেই আলবেরুনীর বৈজ্ঞানিক মন নিরস্ত হয় নাই। তিনি নিজেই এর সঠিক উপায় নির্ধারণ করে দশমিকের চতুর্দশ অঙ্ক পর্যন্ত π এর মূল্য বের করেছেন।

যে কোন বিষয় আলোচনায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকদের মতামতগুলি উধৃত করে তাঁদের ভিতরকার পার্থক্য, কার্যকারণের দোষত্রুটী, নিজের সময়কার বৈজ্ঞানিকদের সেই বিষয়ের আলোচনার ফলাফল বর্ণনা করে তিনি নিজের মত ও উপায় লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি উদাহরণেই তাঁর এই কার্য পদ্ধতির গতি স্পষ্ট বোঝা যাবে। চন্দ্রের কক্ষের আনতির

(The inclination of the moon's orbit) বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি নানা বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত ফলের কথা উল্লেখ করেছেন ; হিপারকাসের (Hipparchus) মতে এ আনতি হোল 5° টলেমিরও সেইমত কিন্তু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মতে এ হোল $4\frac{1}{2}°$ ডিগ্রী। হাবাস তাঁর ফলকে (table) আনতি 4°46′ অর্থাৎ গ্রীক এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নির্ণীত ফলের মধ্যমান (mean) বলে উল্লেখ করেছেন।" এর পরে তিনি নিজের উদ্ভাবনা যোগ দিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ করে গণনা করে দেখিয়েছেন এ আনতি হোল 5°8′ 22″ – 5″। এর পরে মন্তব্য করেছেন যে "টলেমির সংখ্যা কতকগুলি সংখ্যার মধ্য ফলের সমান এবং আলবাত্তানিও যখন গণনা করে এ আনতি 5°1′ বলে নির্ধারণ করেছেন তখন আমরা কাজ চালানর জন্য একে 5° ডিগ্রী বলেই ধরে নিতে পারি।" এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে আরব ও গ্রীক বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রের আনতির সাময়িক গতি (periodic) বিষয় ভাল করে বুঝতে পারেন নাই বলে মনে হয়। ইবনে ইউনুস কয়েকবার পর্যবেক্ষণের ফলে এ আনতির পরিমাণ পান 5°3′ দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণ একই অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল তাই ফলেরও তারতম্য হয় নাই। আবুল হাসানও কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর পরিমাণ হিপারকাসের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু আনতির গতির জন্যই যে এই তারতম্য সে কথা

উল্লেখ না করে তাঁর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে এবং যন্ত্রপাতিতে ত্রুটির জন্যে এমনি হয়েছে বলে নিরস্ত থাকেন।

ত্রিকোণমিতি আলোচনায় আলবেরুনী প্রথমে 0° শূন্য থেকে 90° ডিগ্রীর সাইনের মূল্য নির্ধারণ করে একটি সাইন টেবল (sine table) তৈরী করেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য ফলকের থেকে এর পার্থক্য হোল যে এখানে বৈজ্ঞানিক শুধু প্রত্যেক ডিগ্রীর সাইন নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হন নাই, প্রতি ডিগ্রীর অংশেরও সাইন নির্ধারণ করেছেন। প্রত্যেক 15′ মিনিট বা $\frac{1}{4}$ অংশ বৃদ্ধির জন্য সাইনের পরিমাণে যে তারতম্য হয় তার মূল্য দশমিকের সপ্তম স্থান পর্যন্ত নির্ধারণ করে বৈজ্ঞানিক তাঁর কাজ সমাপ্ত করেন। কাজটি যে কি বিপুল অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ গণিতিক মাত্রেই সে উপলব্ধি করবেন। এই ফলক তৈরী করতে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেন তাকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে তিনি সুষম বহুভুজের (Regular Polygon) বাহুগুলি ঠিক করে নিয়ে তা থেকে 60°, 30°, 45° এবং 18° ডিগ্রীর সাইনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এরপরে ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতি উভয়ভাবেই $\sin(A \pm B)$র ফরমুলা নির্ণয় করে $B = A$ ধরে নিয়ে তা থেকে $\sin 2A$এর পরিমাণ নির্ধারণ করবার পন্থা বের করেন। তৃতীয় পন্থাটি গণিতিক বৈশিষ্টতার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের দিক থেকে এ তদানীন্তন কালের পক্ষে অনেক উন্নত পরিস্থিতির পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিককে যে এর জন্যে কি অপরিসীম পরিশ্রম এবং

অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে হয়েছে সে বুঝতে পারা যাবে তাঁর কার্যকলাপ থেকেই। কাজটি হোল 15° ডিগ্রীর sine নির্ধারণ করা কিন্তু এর জন্যে দরকার হয় ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধান। জ্যামিতিক ভাষায় একে বলা যেতে পারে চাপের (arc) এক তৃতীয়াংশের জ্যা (chord) নির্ধারণ করা। স্তরে স্তরে গণনা করে এই ত্রৈমাত্রিক সমীকরণ সমাধান করবার জন্যে আলবেরুনী তাঁর গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। চতুর্থ দফায় sin (A+B) ফরমুলা পুন পুন প্রয়োগ করে ফলকটি সম্পূর্ণ করেন।

এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে আলবেরুনী বহুভূজের বাহু সমূহের পরিমাণ বীজগণিতিক সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন। এ বিষয়ে তিনি আলখারেজমি প্রভৃতি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের পন্থা অনুসরণ করে সাধারণ সূত্র, পন্থা এবং ফল সবই কথায় প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ অষ্টভূজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান প্রচলিত বীজগণিতিক সূত্রে এর পরিমাণ লিখিত হবে $r\sqrt{2-\sqrt{2}}$ আলবেরুনীর ভাষায় একে বলা যেতে পারে কোন অষ্টভূজের জ্যা বের করতে হোলে ব্যাসার্ধকে, ব্যাসার্ধ এবং বর্গের বাহুর বিয়োগফল দিয়ে গুণ করে সেই গুণফলকে ব্যাসার্ধের বর্গ থেকে বাদ দিতে হবে। এতে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তার বর্গমুল বের করলেই অভীষ্ট ফলটি পাওয়া যাবে। অঙ্কের সংখ্যায় এ দাঁড়াবে

$$\sqrt{r^2-r(r\sqrt{2}-r)} = r\sqrt{2-\sqrt{2}}$$

এই ফলক তৈরী করবার প্রসঙ্গেই পূর্বোল্লিখিত টলেমি এবং ইয়াকুবের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাঁরা দুইজনেই ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধানের কোন চেষ্টা না করেই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। টলেমি $1\frac{1}{2}^\circ$ ডিগ্রী এবং $\frac{3}{4}^\circ$ ডিগ্রীর জ্যা থেকে 1° ডিগ্রীর জ্যা নির্ধারণ করেন। তাঁর মতে কখ যদি $\frac{3}{4}^\circ$ ডিগ্রীর কোণের কগ 1° ডিগ্রী কোণের এবং কঘ $1\frac{1}{2}^\circ$ ডিগ্রীর কোণের জ্যা হয় তা হোলে কগ চাপ $=(1+\frac{2}{3})$ কখ চাপ $=(1-\frac{2}{3})$ কঘ চাপ। তা হোলে কগ, কখ এবং কঘ এর মধ্য ফলের সমান হবে। ইয়াকুব $\frac{15}{16}^\circ$ ডিগ্রীর চাপ নির্ধারণ করে তার সঙ্গে $\frac{1}{16}^\circ$ ডিগ্রী যোগ করে 1° ডিগ্রীর চাপ নির্ধারণ করেন। আলবেরুনী উদাহরণ দিয়ে দুইজনের পন্থাকেই অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করার গণিতিক সমস্যার এখন পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নাই। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদিগকে এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নানা গণিতিক বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে। সমাধানের চেষ্টাও অনেকেই করেন। আলবেরুনীকেও এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গণিতিক (Theoretical) সমাধান অসম্ভব জেনেই তিনি চেষ্টা করে বারটি যান্ত্রিক (mechanical) উপায় নির্ধারন করেন। এই যান্ত্রিক উপায়ের মধ্যেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাবেই তিনি 1° ডিগ্রীর চাপ এর যে পরিমান নির্ধারন করেন সে দশমিকের দশম স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। তাঁর নির্ধারিত পরিমান

হোল এই $1g2^{i}—49^{ii}—51^{iii}—48^{iv}$, আবুল ওয়াফার নির্ধারিত পরিমাণ হোল $1g2^{i}—49^{ii}—51^{iii}—48^{iv}—0^{v}—25^{vi}$ বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলে স্থিরীকৃত পরিমাণ হোল $1g2^{i}—49^{ii}—51^{iii}—48^{iv}—0^{v}—25^{vi}—27^{vii}$ এমনি ভাবেই তিনি π এর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তাঁর স্থিরীকৃত পরিমাণ হোল $3^{\circ}—8^{i}—30^{ii}—17^{iii}—36^{iv}—46^{v}—30^{vi}$ এটিকে তিনি নিজেই ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করেন। ভগ্নাংশ ভাবে এর পরিমাণ হোল $\frac{1,62,86,81,471}{51,84,00,000}$ তাঁর নিজেই এইভাবে ভগ্নাংশে পরিবর্তন করা দেখে মনে হয় Sexagesimal এবং Decimal এই দুইটিই তিনি বিশেষ ভালভাবেই অবগত ছিলেন। এর পূর্বে অন্য কোন বৈজ্ঞানিককে Decimal এমন ভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায় নাই। কোন সময় Decimal প্রবর্তিত হয় সে বিষয় ভাল ভাবে অবগত হওয়া যায় না।

এই π এর পরিমাণ নির্ধারণ ব্যাপারে হিন্দু মনীষিগণ পূর্বে কিভাবে ভুল করেছিলেন আলবেরুনী কিতাবুল হিন্দ গ্রন্থে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হোলেও পূর্বের ইতিহাসের প্রতি বৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা হিসাবে সেগুলির উল্লেখ হয়ত এখানে অশোভনীয় হবে না। "বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের মধ্যেকার সম্বন্ধ সম্বন্ধে মাৎস্য পুরাণে সূর্য এবং চন্দ্রের ব্যাসের কথা উল্লেখের পর বলা হয়েছে যে পরিধি ব্যাসের তিনগুণ। আদিত্য পুরাণে দ্বীপসমূহের গ্রন্থের কথা উল্লেখের

পর পরিধি ব্যাসের তিনগুণ বলে উল্লিখিত হয়েছে। বায়ু পুরাণেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে। পরে হিন্দুগণ তাঁদের ভুল ধরতে পারেন। ব্রহ্মগুপ্তই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন যে পরিধি ব্যাসের $3\frac{1}{7}$ গুণ কিন্তু তাঁর নির্ধারণ প্রথাটি বেশ কৌতূহলকর। তাঁর মতে ১০এর বর্গমূল যেমন $3\frac{1}{7}$ এর প্রায় সমান, ব্যাস এবং পরিধির অনুপাতও তেমনি ১ এবং ১০ এর বর্গমূলের অনুপাতের সমান। পুলিষ একে $3\frac{177}{1250}$ বলে সিদ্ধান্ত করেন। হিন্দু মনীষিগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণও তাঁদের এই ফলই ব্যবহার করেন। ইয়াকুব এবনে তারিক তাঁর composito sphoerarum গ্রন্থে ঠিক এই অনুপাতই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে Zodiac এর পরিধি হোল 1,256,640,000 যোজন এবং তার ব্যাস হোল 500,000,000 যোজন।" যা হোক বৈজ্ঞানিক π এর পরিমাণ নির্ধারণে কোথাও তাঁর 1° ডিগ্রীর সাইনের নির্ধারিত পরিমাণ ব্যবহার করেন নাই এবং অন্যত্র তিনি আর্কিমেডিসের নির্ধারিত পরিমাণ $\pi = 3\frac{1}{7}$ ব্যবহার করেছেন।

ত্রিকোণমিতিতে আলবেরুনী যে বিশেষভাবেই তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ত্রিকোনমিতিক গণনা থেকেই। প্রত্যেক গণনাকে তিনি শুদ্ধ ও অভ্রান্ত করবার জন্যে প্রাণপন সাধনা করেছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর প্রাপ্ত ফল শুদ্ধ বলে নিজে সন্তুষ্ট হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি একে বিজ্ঞান হিসাবে

পরিবেশ করতেও স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তার মধ্যেও তিনি দৈনন্দিন ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাই দৈনন্দিন সাধারণ ব্যবহারোপযোগী সহজ সরল নিয়ম দেখিয়ে দিতেও প্রচেষ্ট হয়েছেন। এমনি প্রচেষ্টার সাক্ষ্য পাওয়া যায় সাইন টেবল তৈরীর মধ্যেই। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি প্রত্যেক ডিগ্রীর $\frac{1}{4}$ অংশ (১৫′) বৃদ্ধি অনুসারে গণনা করে সাইন টেবল তৈরী করেন—কিন্তু এই গণনায় ছুইটি নিয়ম দেখা যায় ; একটা হোল সাধারণভাবে গণনা অন্যটি হোল সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ গণনা। সাধারণ গণনার জন্য তিনি আনুপাতিক অংশের নিয়ম (method of proportional parts) ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য এ সাধারণভাবের গণনা হোলেও এতে দশমিকের তৃতীয় স্থান পর্যন্ত বিশুদ্ধ ফল পাওয়া যায়। বর্তমানেও প্রচলিত সাইন টেবল থেকে কোন কোণের সাইন নির্ণয় করতে হোলে এই নিয়মই ব্যবহৃত হয়।

সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ গণনায় তিনি যে নিয়ম ব্যবহার করেছিলেন সে শুধু সে যুগের জন্যই বিস্ময়কর নয় তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। কোন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার নূতন পথের সৃষ্টি দাবী করলেই সেটিকে কোন না কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বলে প্রচলন করবার যে ফ্যাসান দাঁড়িয়ে গেছে আলবেরুনীর এই অভিনব পন্থাটিও তার হাত থেকে অব্যাহতি পায় নাই। এই পন্থাটির বর্তমান প্রচলিত নাম হোল "The formula of interpolation" এবং এটিকে

নিউটনের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিউটনের জন্মেরও বহু পূর্বে আলবেরুনী শুধু একে আবিষ্কারই করেন নাই বরং একে ব্যবহার করে বিশুদ্ধ সাইন টেবল তৈরী করেন। আলবেরুনীর দোষ হিসাবে বলা যেতে পারে যে তিনি দশমিকের সপ্তম স্থানের পরেও আর একে এগিয়ে নিয়ে যান নাই। তিনি প্রথম তিনটি অঙ্ক (term) বের করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তার পরে আর এগোন নাই এর পরের ফল দশমিকের সপ্তম স্থানের পরেও স্থান পায় বলেই। তাঁর ফরমুলা ব্যবহার করে যে কোন কোণের সাইনের মুল্য দশমিকের পঞ্চম স্থান পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবেই নির্ণয় করা যায়। বলতে গেলে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানবুদ্ধির সবেমাত্র যখন উন্মেষ হয়েছে সেই একাদশ শতাব্দীতে, কোণের সাইনের বিশুদ্ধ মূল্যের যখন প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্যই নাই বরং সাধারণ লোকের মত বৈজ্ঞানিকেরাও যখন একে পণ্ডশ্রম বলেই মনে করতেন, সেই সময়ে এমনি সূক্ষ্ম গণনা করবার আয়াস স্বীকার করা যে কতখানি মানসিক শক্তির দরকার সে হয়ত বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। আলবেরুনী তাঁর সাইন টেবলে এত সূক্ষ্মভাবে গণনা করেছেন যে এতে ভুলের পরিমাণ $\frac{1}{10^7}$এর চেয়েও কম (have an error less than $\frac{1}{10^7}$) এবং তাঁর ফরমুলা অনুসারে নির্ণীত মূল্য $\frac{3}{10^6}$এরও কম ভুল হয় (have an

error less than $\frac{3}{10^6}$)। বলা বাহুল্য বর্তমানেও এর চেয়ে সূক্ষ্মতর গণনা হয় নাই এবং কোন বৈজ্ঞানিক গণনাতেই আঙ্কিক বিশুদ্ধ গণনা লওয়া হয় না।

নির্দিষ্ট কোণের সাইন নির্ধারণ করবার ফরমূলা বের করেই আলবেরুনী ক্ষান্ত হন নাই এর বিপরীত পন্থা অর্থাৎ সাইন জানা থাকলে তার কোণ নির্ধারণ করবার পন্থাটিও অতি সুনিপুণ ভাবে বের করেছেন। এর মধ্যে তাঁর সুকৌশলী বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের মত আলবেরুনীও তাঁর ত্রিকোণ-মিতির প্রমাণ ও প্রামাণ্যগুলি জ্যামিতিক অঙ্কন ও প্রমাণের দ্বারা সর্বসাধারণের উপযোগী করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি এই দুইয়ের অভেদ্য সম্বন্ধ তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ অতি সাধারণভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। অন্তত ত্রিকোণমিতিকে জ্যামিতিক অঙ্কন ও প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ সমভাবেই বিদ্যমান ছিল।

সাইন টেবল সমাপ্ত করেই আলবেরুনী ট্যানজেণ্ট টেবল (Tangent Table) এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। এখানেও তাঁর অপূর্ব বৈজ্ঞানিক কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আলবেরুনীর পূর্ব পর্যন্ত ত্রিকোণমিতির প্রগতি অনেকটা ব্যাহত হয়ে পড়েছিল বৃত্তের ব্যাসার্ধের পরিমাণ 60 ধরে নেওয়াতে। এর জন্যে ত্রিকোণমিতির ফরমুলাগুলিও অনেকটা জবরজঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাবাশের ফরমুলার কথা উল্লেখ

করা যেতে পারে। আলবেরুনী পূর্বের বৈজ্ঞানিকদের অনুসৃত পন্থাকে অনুসরণ না করে সহজ উপায় নির্ধারণ করতে তৎপর হন। তবে এখানে যে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সাধারণ জনসমাজই যে শুধু পূর্বেকার সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকতে তৎপর তা নয় বৈজ্ঞানিকগণ মুক্ত বুদ্ধি হয়েও এদিক দিয়ে জনসাধারণকে ছাড়িয়ে যেতে বিশেষ সক্ষম নন। তাঁরাও পূর্বেকার মতবাদ ও পন্থাকে সহজে ছেড়ে দিতে রাজী হন না। ফলে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে তাকে চালু করতে বৈজ্ঞানিকদের কম বেগ পেতে হয় না। আলবেরুনীকেও প্রথম উদ্ভাবকের কষ্ট স্বীকার করে নিয়েই এগুতে হয় তবে তাঁর পন্থার সরলতা অতি সহজেই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত জয় করে এবং পন্থাটিও প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে আদৃত হয়। পন্থাটি অন্য কিছু নয় শুধু বৃত্তের ব্যাসার্ধের পরিমান। তিনি বৃত্তের ব্যাসার্ধের পরিমাণকে এক (unit) ধরে নিয়ে ত্রিকোণমিতির সম্বন্ধগুলির ব্যাখ্যা করতে প্রচেষ্ট হন এবং অতি সহজেই এগুলির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। বৈজ্ঞানিক জগতেও তাঁর এ পন্থা অতি সহজেই গৃহীত হয়।

একটি উদাহরণ থেকেই বিষয়টি কিছু বোঝা যাবে :—

XCY এবং ECW কোন বৃত্তের দুইটি ব্যাস। যদি SCY সূর্যের উন্নতি (altitude) তা হোলে SM হবে সেই উন্নতির সাইন এবং CM কোসাইন। এখন X বিন্দুতে একটি ট্যানজেণ্ট আঁকা যাক। SC বর্ধিত করলে এই ট্যানজেণ্টটিকে

P বিন্দুতে ছেদ করবে তা হোলে PX উন্নতির ট্যানজেণ্ট। এমনি বৃত্তের W বিন্দুতে একটি ট্যানজেণ্ট অঙ্কন করলে, সেই ট্যানজেণ্ট যদি CPকে Q বিন্দুতে ছেদ করে তা হোলে WQ হবে উন্নতির কোট্যানজেণ্ট, CP হবে secant ও CQ cosecant.
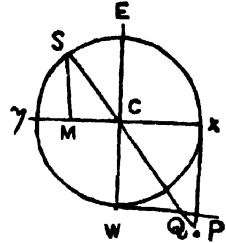
ট্যানজেণ্ট টেবল তৈরী করতে বৈজ্ঞানিক সাইন টেবলের মত অত পরিশ্রম করতে রাজী হন নি বলে মনে হয়। তিনি এখানে প্রত্যেক 15′ মিনিট বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রত্যেক ১° ডিগ্রী বৃদ্ধির ট্যানজেণ্টের পরিমাণের মূল্য গণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তবে এই গণনার পরিশ্রম অস্বীকার করলেও এর বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ধারণের জন্য এতটুকু কুণ্ঠা দেখান নাই। এখানে আনুপাতিক অংশ (The method of proportional parts) এবং Interpolation formulae এই দুই ভাবেই গণনা করবার পন্থা প্রদর্শন করেছেন।

শুধু ত্রিকোণমিতির সম্বন্ধগুলির সহজভাবে ব্যাখ্যা করবার উপায় নির্ধারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের চিরাচরিত ট্যানজেণ্ট এবং নমনের (gnomon) সম্বন্ধকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেন। কুশায়ার প্রভৃতি পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই নমনের ছায়ার (the shadow of the gnomon) 60 এবং 7 দুইটি দৈর্ঘ নিয়ে

দুইটি টেবল তৈরী করেন, আলবেরুনী এমনি তালিকার কোন সার্থকতা খুঁজে পান নাই। তাঁর মতে নমনের যত দৈর্ঘ্যই হোক না কেন উন্নতির ট্যানজেণ্ট দিয়ে তাকে গুণ করলেই ছায়ার পরিমাণ পাওয়া যাবে (we should multiply the length of the gnomon whatever it may be by tangent or the complementary of the altitude in order to find the shadow).

অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে উঠেছে। আজকালকার বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে দশম একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতের পার্থক্য মনে করলেই, তখন কেন সুষ্ঠুভাবে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি গড়ে উঠে নাই সে স্পষ্টভাবেই অনুধাবন করা যেতে পারে। আলবেরুনীর পূর্ব পর্যন্ত অনন্ত সংখ্যার (Infinite number) কথা বিবেচনা করে যে জন্যে কেউ কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন কিনা জানা যায় না ; তবে আলবেরুনী নিজে কোন চিহ্ন ব্যবহার বা প্রচলন করেন নাই। তাঁর সাইন টেবল এবং ট্যানজেণ্ট টেবলে দেখা যায় তিনি Sine 0° এবং tan 90° মূল্য একই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—এ চিহ্নটি হোল ꟿ.

পূর্বেই বলা হয়েছে আলবেরুনী সর্বপ্রথম Interpolation formulae ব্যবহার করে ত্রিকোণমিতির সম্বন্ধগুলির মূল্য নির্ধারণ করবার পথ প্রদর্শন করেন।. বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানী মন এত অল্পেই ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি ফরমুলাটি যাতে

সাধারণভাবে (function in general) ব্যবহৃত হতে পারে, সেইভাবেই এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তুলতে প্রয়াস পান এবং একে Theory of Functionএর ভাষায় প্রকাশ করেন। মধ্যযুগের বিজ্ঞান সাহিত্য কিম্বা গ্রীক লাটিন বিজ্ঞান সাহিত্যে এমনি ধরণের Theory of Function এর ভাষা ব্যবহারের কোন নজির দেখা যায় না। আলবেরুনী এ বিষয়ে একক এবং বর্তমান Theory of Functionএর পথ প্রদর্শক। অবশ্য Functionএর অনুরূপ শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই কিন্তু তাঁর ভাষার মধ্যে এর সমস্ত বৈজ্ঞানিক আদর্শ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এখানে এ সম্বন্ধে তাঁর কার্যের কতকাংশের অনুবাদ দেওয়া গেল।

"·········কোন টেবলের কার্য নিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হতে হোলে এই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। প্রদত্ত টেবলের একক অংশ (unit part) [অর্থাৎ যেটিকে unit ধরে টেবল গণনা করা হয়েছে] নিন এবং আপনার নিরূপিত পরিমাণের নিকটবর্তী এক অংশ কম ধরে নিয়ে তাদের মধ্যকার পার্থক্য বের করুন (যদি $a+x$ দেওয়া থাকে তা হোলে $a+x$ এবং a মধ্যকার পার্থক্য বের করে নিন যেন এটি সাধারণ পার্থক্য hএর চেয়ে কম হয় এই পার্থক্যটি হোল x) এইবার পার্থক্য দুইটির ভাগফল বা x/h বের করুন। এইবার ভাগফলটিকে আমাদের পূর্বেকার সংখ্যার উপরের এবং নীচের সংখ্যার— উপরোক্ত ভাবের ভাগফলগুলিকে নিয়ে তাদের বিয়োগফল

দিয়ে গুণ করুন। যদি পূর্বেকার পার্থক্য এবারকার পার্থক্যের চেয়ে কম হয় তা হোলে উপরোক্তভাবে নিরূপিত ফলকে পূর্বের পার্থক্যের সঙ্গে যোগ করুন, আর যদি বড় হয় তা হোলে বিয়োগ করুন। তারপর আবার সে ফলটিকে পুনরায় x/h ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করুন এবং যদি পূর্বের পরিমাণের চেয়ে বড় হয় (অর্থাৎ যদি ভগ্নাংশ বড় হতে থাকে) তা হোলে টেবলে নিরূপিত পরিমাণের সঙ্গে যোগ করুন নইলে বিয়োগ করুন। অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা এটিকে বলা যাবে

$$f(a+x)=f(a)\frac{x}{h}\left\{\frac{d}{-1}+\frac{x}{h}\left(\frac{d}{o}-\frac{d}{-1}\right)\right\}$$

বৈজ্ঞানিকের এই পুস্তকটিতে ত্রিকোণমিতির আলোচনাই সব চেয়ে বেশী হয়েছে। সমতলিক মণ্ডলাকার ত্রিভূজের সমাধানের জন্য তিনি ফরমুলার উদ্ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই যত্নবান হয়েছেন। এতে সর্বপ্রথম ফরমূলা হোল $\frac{\text{Sin A}}{a}=\frac{\text{Sin B}}{b}$ বৈজ্ঞানিক অনেক পরিশ্রম সহকারে একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করিয়ে এর ত্রিকোণমিতির মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর সমাধান বৈজ্ঞানিকদিগকে কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আড়াই শত বৎসর পরে মারাঘার শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক নাসিরউদ্দিন তুসীর ঠিক এই একই পন্থা ব্যবহার করা থেকেই। ত্রিকোণমিতির নবজীবনদানকারী হিসাবেই নাসিরউদ্দীন বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত। ত্রিকোণমিতির নানা সমস্যার সমাধান

তাঁকে বিজ্ঞানজগতে অমর করে রেখেছে কিন্তু এ বিষয়ে তিনিও আলবেরুনীকে অনুসরণ করতে কসুর করেন নাই। আলবেরুনীর কার্যাবলীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকার জন্যেই তাঁর অনেক কার্যই অন্যের নামে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। ত্রিকোণমিতির ফরমূলার ব্যাপারেও এর ত্রুটি হয় নাই। Prof. Braunmuhle তাঁর History of Trigonometryতে আলবেরুনীর কার্যের সঙ্গে অপরিচয়ের জন্যেই এই ফরমূলাটিকে নাসিরউদ্দীনের আবিষ্কার বলে মত প্রকাশ করেছেন। মণ্ডলাকার সমকোণিক ত্রিভূজের ছয়টি কৌণিক সম্বন্ধের মধ্যে চারিটি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। আলবেরুনীর পূর্ব পর্যন্ত এর উপর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। তিনিই সর্বপ্রথম অন্য দুইটি আবিষ্কার করেন এবং ত্রিকোণমিতিকে নূতন রূপ দিয়ে একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলেন। এই দুইটি ফরমুলা * হোল

$$\text{Cos A} = \cos a \sin B$$

$$\text{Cos } c = \cot A \cot B$$

বলা বাহুল্য এই দুইটি প্রতিষ্ঠা করেই বৈজ্ঞানিক ক্ষান্ত হন নাই। নিজস্ব প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে মেনিলসের Theorem দিয়ে এই দুইটি প্রমাণ করেও এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের উদ্ভাবিত ফরমুলাগুলি ছাড়া তিনি পূর্বেকার প্রতিষ্ঠিত এবং

* মিঃ পি, এন, মিত্রের মতে—এই ফরমুলাগুলো হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদদের জানা ছিল; অবশ্য তিনি বিশেষ কোন বিজ্ঞানবিদের নাম বা সময়ের উল্লেখ করেন নাই।

ত্রিকোণমিতিতে প্রচলিত ফরমুলাগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতদূর সুদৃঢ় সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করতে বিরত হন নাই। তাঁর প্রত্যেক কার্যের মধ্যে এমনি একটি সত্যান্বেষী মনের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে থেকে প্রচলিত বলেই যে তাকে নির্বিচারে সত্য বলে মেনে নিতে হবে এ যেন তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তিনি প্রত্যেকটি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিজের জ্ঞানমত যাচাই করে নিয়ে তবে স্বীকার করে নিয়েছেন। ত্রিকোণমিতির এই পুস্তকটিতেও তাঁর এ স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্বের গুলিকে যাচাই করে নিয়ে আবার তার নূতন প্রমাণ দিতেও কসুর করেন নাই। এমনি একটির উদাহরণ হোল $\frac{\text{Sin A}}{\sin a}=\frac{\text{Sin B}}{\sin b}$ তিনি নিজেই বলেছেন এটি ছাবেত এবনে কোরার উদ্ভাবিত কিন্তু এর সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজস্ব প্রমাণ দিতেও ত্রুটি করেন নাই।

জ্যোতির্বিজ্ঞান উদ্ভাবনের প্রথম অবস্থা থেকেই বোধ হয় বৈজ্ঞানিকগণের মনে পৃথিবীর আকার, পরিধি ইত্যাদির কথা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন বলে মনে হয় কিন্তু আলোচনার শেষ হয় নাই অনেকদিন পর্যন্ত। অবশ্য এখনও যে শেষ হয়েছে সে নির্বিবাদে বলা চলে না। যা হোক আলবেরুনীও এ বিষয়ে আলোচনা করতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি পৃথিবীর কোন ডিগ্রীর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ

করবার জন্যে দুইবার চেষ্টা করেন। প্রথম দফায় হাবাশ আল হাসিব এবং ফারগণের মতই প্রত্যক্ষভাবে জুনগাঁওএর নিকট দোহিস্তানের প্রান্তরে পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করতে প্রয়াস পান কিন্তু রাজনীতিক ভেল্কীবাজীতে তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। পরীক্ষাকার্য সমাপ্ত করবার সুযোগ আর তাঁর হয়ে উঠে নাই। এই অসাফল্যে তিনি দমে যান নি আবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া মাত্র এ বিষয়ে সচেষ্ট হন। দ্বিতীয় দফায় তিনি ভারতবর্ষের হিন্দুকুশ পর্বত থেকে পরীক্ষাকার্য চালান। অবশ্য এবার তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে ত্রুটি করেন নাই। প্রথমেই হিন্দুকুশ পর্বতের উচ্চতা মেপে নিয়ে এ থেকে ডিগ্রী নির্ধারণের প্রয়াস পান। তাঁর অনুসৃত পন্থাটির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উল্লেখ এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

AB যেন কোন পর্বতের উচ্চতা। এক্ষণে এমনি একটি স্থান নির্বাচন করা হোল যেখান থেকে পর্বতের উপরিভাগ দিগন্তের উপরে মাত্র (just over the horizon) পরিলক্ষিত হবে। এই স্থানটি যেন C. এইবার অক্ষরেখার পার্থক্য অর্থাৎ CA চাপ কেন্দ্রে যে কোণ গঠন করে তার পরিমাণ ঠিক করলেই অভীষ্ট ফল লাভের সুবিধা হবে। কেননা AB এবং ∠COA কোণের পরিমাণ জানা থাকলে ব্যাসার্ধ অতি সহজেই গণনা করে নেওয়া যেতে পারে। আলবেরুনীর এমনি
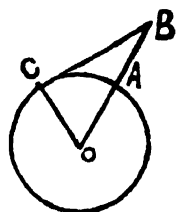
ভাবে নির্ধারিত ফলের সঙ্গে বর্তমানের অবধারিত পরিমাণের পার্থক্য অতি সামান্য। এই পার্থক্যের কারণও অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় মত্ত হয়ে পদার্থবিদ্যার প্রতি বৈজ্ঞানিকের ক্ষণিক অমনোযোগ। তিনি আলোর উপর বায়ুর প্রভাব— আলোর প্রতিসরণের (Refraction) কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেন। যা হোক তিনি পরবর্তী সমস্ত গণনায় হাবাসের নির্ধারিত পরিমাণই ব্যবহার করেছেন।

মাসুদীর চতুর্থ খণ্ডে প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ক্রান্তিবৃত্তের আনতি (obliquity of the Ecliptic) বৈজ্ঞানিকের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়েও তিনি তাঁর চিরাচরিত পন্থা অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রথমে নিজ পন্থায় আনতি গণনা করেছেন তার পরে অন্যান্য আরব এবং গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণের নির্ধারিত পরিমাণ উধৃত করেছেন। তবে এ বেলায় তিনি শুধু এইটুকুতেই ক্ষান্ত হন নাই সঙ্গে সঙ্গে এর পরিবর্তনশীল পশ্চাদগামী গতি (variable retrograde motion) নিয়েও আলোচনায় মেতেছেন। এ থেকেই বুঝা যাবে বৈজ্ঞানিক কি ভাবে একের পর একে বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিকে ক্রমশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

চন্দ্রের লম্বন (parallax of the moon, ইখতিলাফ মনজর আলকামার) সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যেও তাঁর এই উন্নত চিন্তাধারার অব্যাহত গতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও

তিনি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের পন্থা উল্লেখ করার পর নিজের উদ্ভাবনা যোগ করে দিয়েছেন। তাঁর এই নব উদ্ভুত পন্থা ও পর্যবেক্ষণগুলি সব দিক দিয়েই চিত্তাকর্ষক। এর একটি হোল চন্দ্রের আলোতে ছায়াঘড়ির কাঁটার (gnomon) পাতিত ছায়ার পর্যবেক্ষণ। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, পৃথিবী ও চন্দ্রের দূরত্বের তুলনায় খুব ছোট নয়। সেইজন্য চন্দ্রের আলোতে gnomon এর ছায়া সূর্যের আলোতে পাতিত ছায়ার চেয়ে অনেক বড়। আলবেরুনী তাঁর কানুনে মাসউদীতে (তৃতীয় মাকালা অষ্টম পরিচ্ছেদ) চন্দ্র ও সূর্যের ৪৫° উন্নতিতে gnomon এর ছায়া দুইটির পার্থক্য স্থির করে চন্দ্রের parallax সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন।

দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, দিক্‌নির্ণয়, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানজ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্দেশের সহজ বিজ্ঞান সম্মত উপায় প্রভৃতি নির্ধারণ করতেও গ্রন্থের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিষুবাংশ (Right ascension) বিষুবলম্ব (declination) দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, উন্নতি (altitude) দিগংশ (azimuth) প্রভৃতি স্থানাঙ্ক বিষয়ের তিনটি প্রণালীর সমাবেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানাঙ্কের যে কোন দুইটির বিষয় জানতে পারলে অন্যগুলি নির্ধারণ করবার সহজতম ফরমুলাও দিয়ে দিয়েছেন। এই ফরমুলার প্রথম আবিষ্কর্তার গৌরব আলবেরুনীরই প্রাপ্য কি অন্য পূর্বতন বৈজ্ঞানিক এ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন সে সঠিকভাবে জানা জায় না।

অনুসন্ধিৎসু মনের অনুশীলনের জন্যই সে বিষয় এখনও অপরিজ্ঞাত রয়েছে। তবে যতদূর জানা যায় আলবেরুনীর পূর্বে এ রকম কোন ফরমুলার ব্যবহার হয় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কর্তা আলবাত্তানীর গ্রন্থে এরূপ কোন ফরমুলার সন্ধান পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব আলবেরুনীই এর সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা। যা হোক এ ফরমুলা যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অমোঘ মুক্তিবাণীর সন্ধান দিয়েছিল সে বোঝা যায় পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণের এর প্রতি অবাধ আগ্রহের বহর থেকেই। আলবেরুনীর পরবর্তী সমস্ত বৈজ্ঞানিকই একে বিজ্ঞান গ্রন্থে সাড়ম্বরে ব্যবহার করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সমাদরের মধ্যে এতটুকু মলিন ছায়া দেখা দেয় নাই। এই সময়কার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উলুগবেগ আলবেরুনীর ভাষা ভাববিন্যাস সব কিছুকে হুবহু অনুকরণ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

আলবেরুনীর বৈজ্ঞানিক মন যে কোন বিষয়কে সহজে স্থিরনিশ্চয় ও সত্য বলে গ্রহণ করতে স্বতই দ্বিধা বোধ করত। স্বপক্ষে বিপক্ষে সমস্ত প্রকার যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করে যাচাই না করা পর্যন্ত তিনি কোন কিছুকেই বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিতে রাজী ছিলেন না। এইজন্যেই তিনি তাঁর প্রতিটি ফরমুলা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে তাকে প্রমাণসহ বলে স্থির করা যায় কিনা সেই অনুসন্ধানেও রত হতেন। আবিষ্কৃত ফরমুলা যত কঠিন এবং জটিলই হোক না কেন,

বিপরীত দিক থেকে উল্টিয়ে নিয়ে তাকে তিনি যাচাই করবেনই ; এই ফরমুলার বেলায়ও তাঁর সেই চিরাচরিত পন্থার ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞান স্পৃহা কি ধরণের ছিল তার কতকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে ভারতবর্ষে অবস্থান কালে, তাঁর পর্যবেক্ষণের বিস্তার থেকে। হিন্দুকুশ পর্বতে পৃথিবীর পরিধির পরিমাপ নির্ণয় করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও নানা পর্যবেক্ষন কার্য চালান এবং নানা স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা নির্ণয় করেন। কানুনে মাসউদীর পঞ্চম খণ্ডে নিম্নলিখিত স্থানগুলির দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার উল্লেখ দেখা যায়—লাওয়াহোর (লাহোর) আভাস্তান (কাশ্মীরের তৎকালীন রাজধানী) নেপাল (গ্রন্থকারের মতে এ হিন্দুস্থান এবং তিব্বতের মধ্যে বিশ্রামস্থান) ভাইহিন্দ (সিন্ধু উপত্যকার একটি সহর) শিয়ালকোট, মুলতান, তেজ (বেলুচিস্তানের একটি বন্দর) সোমনাথ, নাহলওয়ালা, খামবায়াত, কালাঞ্জর (মধ্য ভারতের একটি সহর) মাহুরা (মুত্রা) কাননোজ (গ্রন্থকারের মতে এটি গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত মধ্য ভারতের একটি সহর, এবং বহু রাজার রাজধানী এখানে অবস্থিত ছিল) গোয়ালিয়র, গোবরালি, দাইবাল (সিন্ধুর একটি বন্দর) কাজুরাহা, অযোধ (অযোধ্যা) বানারস (গ্রন্থকারের মতে এ হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান এবং শিল্প ও সাহিত্যের পীঠস্থান) লঙ্কা দ্বীপ, জামকোট, তাঞ্জোর, সঙ্গলছুবা, মানকরী (মহানগরী)।

অন্যান্য আরব বৈজ্ঞানিকগণের মত আলবেরুনীও মাইলোল আওয়াল এবং মাইলোছ্ছানি ব্যবহার করেছেন। তিনি সূর্যের দ্রাঘিমার প্রত্যেক ১° ডিগ্রী বৃদ্ধি অনুসারে এই দুইটি নির্ধারণ করবার একটি টেবলও তৈরী করেন। মাইলোল আওয়াল বর্তমান জোতির্বিজ্ঞানে আনতি (Declination) নামে পরিচিত মাইলোছ্ছানি কখনও কখনও দ্বিতীয় আনতি (second Declination) নামেও অভিহিত হয়। মাইলোল আওয়াল, বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবিচলিত থাকলেও মাইলোছ্ছানি আজকালকার গণনায় ব্যবহৃত হয় না এবং সেইজন্যেই ঐতিহাসিক কৌতূহল ছাড়া এর বিশেষ মর্যাদাও দেওয়া হয় না তবে এর বৈজ্ঞানিকত্ব অবহেলার জিনিস নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি তথ্য অনাবশ্যক বোধে আপনি ঝড়ে যায়, মাইলোছ্ছানির বেলায়ও সেই কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্যগুলির বেলায় যেমন ঝড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক মূল্যও হ্রাস পায় এর বেলায় তা হয়নি; এর বৈজ্ঞানিক মূল্য এখনও সমাদরের জিনিস। ক্রান্তিবৃত্তের মেরু এবং কোন গ্রহের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত বৃত্তের যে চাপ সেই গ্রহের এবং বিষুবরেখার মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে তাকেই মাইলোছ্ছানি বলা হয়। (The arc of circle passing through a heavenly body and the pole of the ecliptic and intercepted between the equator and the heavenly body).

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আজকাল আর কারুর কোন সন্দেহই নেই। এ যে স্থির নিশ্চল নয়, সে বোঝাতে আর কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবতারণা কর্‌বার দরকার হয় না। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ কোন ধারণা ছিল বলে জানা যায় না। আলবেরুনীর কানুনে মাসউদীতেই এ সম্বন্ধে সর্ব প্রথম আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা এখানে উধৃত করা গেল :—

"اما انا فشاهدت احد من مال الى نصرة هدا الراى من المتنورين فى علم الهيئة لم يلتزم نزول الثقل الى الارض على القطر عموداً على وجهها بل منحرفاً على زوايا مختلفه لاتنضبط فيه و لا تحفظ غير المسامة لان الرجل راى الثقل عن الارض حركتين احداهما دورية كافى طبيعة الجزء من تقبيل الكل فى خواصه والاخرى مستقيمة لانجذابه الى معدنه. فالثقيل اذا انفصل عن الارض تتحرك باولهما حركة يوجب فى الهوا لادام المسامة الواجبة واما الثانيه المستقيمه فيوجب لو تجردت وقوعه عن عرب المسامة ابداً لكن هويته مركب منهما فلذالك لاينحرف عن المسامة والخط الذى ينزل عليه ليس عمود على الارض بالحقيقه بل مايل نحو المشرق"

"আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদকে জানি তিনি এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে যখন কোন জিনিস উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে তখন সে জিনিসটি তার পতনের ধারা অনুযায়ী লম্ব লাইন ধরেই পড়ে না বরং একটু বেঁকে যায় এবং বিভিন্ন কোণ করে পতিত হয়। তিনি বলেন যখন পৃথিবীর কোন অংশ এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায় তখন এই ছিন্ন অংশটির দুই প্রকার গতি হয়; এক হোল বৃত্তিক গতি (circular motion) পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যই এর উদ্ভব আর একটি হোল

সরল গতি (straight) পৃথিবীর কেন্দ্রে সরাসরিভাবে পতিত হওয়ার জন্যে এ গতির উদ্ভব। প্রথমটির জন্যে এর গতির পরিবর্তন হয়, দ্বিতীয়টি এর অবস্থানকে ঠিক রাখে। যদি এর শুধু সরল গতিই থাকত তা হোলে এ লম্ব লাইনের পশ্চিমে পড়ত। কিন্তু একই সঙ্গে এই দুই গতিই কার্যকরী হওয়ায় এ পশ্চিমের দিকেও পড়ে না কিম্বা ঠিক লম্ব লাইনেও পড়ে না বরং একটু পূবের দিকে বেঁকে পড়ে।"

এই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদটি কে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোন কথাই বলেন নাই। তা ছাড়া তাঁর নিজস্ব মতামতও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। সারটনের মতে তিনি এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নাই। সারটন্ অবশ্য তাঁর এ মতের কারণ কি কিছুই বলেন নাই।

সে যাই হোক Solar System সম্বন্ধে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্য পথের সন্ধান পেয়েছিলেন আলবেরুনী আলজারকালি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের কাজ থেকেই সে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁরা যে Geocentric মত ছেড়ে দিয়ে Heliocentric মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলেন এ সমস্তই তার নিদর্শন। বর্তমানে বিজ্ঞান গ্রন্থগুলিতে এ মত (Heliocentric) কোপার্নিকাসের আবিষ্কার বলেই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলবেরুনী ও আলজারকালির গ্রন্থ কোপার্নিকাসের তিনশ বৎসর পূর্বে লিখিত। এ থেকেই বোঝা যাবে এ আবিষ্কারের সম্মান আরব বৈজ্ঞানিকদেরই প্রাপ্য। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা

একে এগিয়ে নিয়ে যান নাই বা একে বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলাতেও প্রবর্তিত করেন নাই। বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলাতে সন্নিবেশ করে একে আরও বিস্তার সাধন করবার সম্মান যে কোপার্নিকাসেরই প্রাপ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

কানুনে মাসউদী প্রধানত বিজ্ঞান গ্রন্থ হোলেও তার মধ্যে যেমন ঐতিহাসিক বিবরণ স্থান পেয়েছে তেমনি তার উল্টোটি হয়েছে "আল আসারুল বাকিয়া মিনাল কুরুনিল খালিয়া" গ্রন্থে। এ গ্রন্থখানি স্পষ্টত পৃথিবীর পুরাকালের বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের ধারা হোলেও এ আমাদের পরিচিত গতানুগতিক ইতিহাস নয়। ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞান মিলিত হয়ে একে এক অভিনব রূপ দিয়েছে বলা চলে। এতে যেমন আসিরীয়া, বাবিলনীয়, কালদীয়, কপটিক, মাসিদনীয়, রোমীয় ও পারসীক রাজাদের রাজত্বকালের তালিকা দেওয়া হয়েছে তেমনি নানা জাতির পর্ব, মেলা, আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও এতে স্থান পেয়েছে। বর্তমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য থেকে একে ইতিহাস বলে ধরে নিলেও গ্রন্থকার যখন প্রাচীন মিশর, পারসী, গ্রীক, ইহুদী, খারিজমা প্রভৃতির উৎপত্তি, তাদের স্বরূপ ও বৈজ্ঞানিকত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন তখন আর একে ইতিহাসের গণ্ডীতে ঢেকে রাখা চলে না। সেখানে এর ইতিহাসত্ব ম্লান হয়ে বৈজ্ঞানিকত্বই বেশী করে ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের সরসত্বের সঙ্গে এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের নীরস গণনা গ্রন্থকারের ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর অনুসন্ধিৎসার কথাই শুধু জানিয়ে দেয়। Prof. Sachau তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় গ্রন্থ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সে থেকেই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিকত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা হতে পারে। তাঁর মত এখানে উধৃত করা গেল :—

In offering the book both in text and translation to the learned world, I feel bound to premise it that it is scarcely of a nature to attract the interest of the general reader. It appeals to minds trained in schools of various sciences. Even competent scholars will find it no easy matter to follow our author through all the mazes of his elaborate scientific calculations." Prof. Sachau এর কথাগুলি যে শুধু কথার কথাই নয় দুই একটি উদাহরণ থেকেই সে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

"ইহুদীদের মধ্যে বর্ষগণনার অন্যতম উপায় হোল তেকুফা। তেকুফা অর্থ হোল বর্ষের প্রতি চতুর্থাংশের প্রারম্ভ। অতএব তেকুফা-এ-নিসান হবে বিষুপাদ (vernal equinox) তেকুফা-এ-তাম্‌মুজ—কর্কট সংক্রান্তি (summer solistice) তেকুফা-এ-তিশ্‌রী—হরিপদ (autumnal equinox) তেকুফা-এ--তেবেত—মকর সংক্রান্তি (winter solistice)। ইহুদীদের

মতে যে কোন দুইটি তেকুফাতের মধ্যেকার সময় বৎসরের এক চতুর্থাংশের সমান—অর্থাৎ 91 দিন 7½ ঘণ্টা এবং এই গণনা অনুসারেই তাদের পাল পর্বণাদির দিনও নিরূপিত। ইহুদী ধর্মযাজকদের মতে এই তেকুফার প্রারম্ভে সাধারণ লোকের পক্ষে কোন খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এতে নাকি তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আসলে এ কিছুই নয় এর উদ্দেশ্য হোল সাধারণ লোকদিগকে প্রতারণা করে তাদের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা এবং তাদিগকে নিজেদের বশে রাখা। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়িয়েছে যে এখন ইহুদীরা রব্বীদের আদেশ ও উপদেশ ব্যতীত কোন কাজই করতে পারে না। তারা অন্য লোকের পরামর্শ নিতেও রাজী নয় যেন রব্বীরা খোদা ছাড়া অন্য এক খোদা। ইহুদীদের মতে মাসের "Moleds" এর সময় জল ঘোলাটে হয়। কোন এক বিজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত ইহুদী এ ঘটনা নিজে দেখেছেন বলে আমাকে বলেছেন। যদি সত্যি এমন কিছু হয় তা হোলে বলতে হবে যে এ কোন নৈসর্গিক কারণেই ঘটে থাকে তাদের ধর্মের জন্য ঘটে না। এ রকম হওয়া যে একেবারেই অসম্ভব সে কথাও আমরা বলি না। যে ইহুদী আমাকে এ কথা বলেছিলেন তিনি সত্যবাদী তাঁকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণই নাই। যা হোক ইহুদী বৈজ্ঞানিকগণ তেকুফার যে গণনা দিয়েছেন টলেমির গণনার সঙ্গে সে হুবহু মিলে যায়ঃ—

তেকুফা	তিশরী থেকে	তেকুফা	তেবেত	$88\frac{1}{8}$ দিন
"	তেবেত	"	নিসান	$90\frac{1}{8}$ দিন
"	নিসান	"	তামমুজ	$94\frac{1}{2}$ দিন
"	তামমুজ	"	তিশরী	$92\frac{1}{2}$ দিন
				$365\frac{1}{4}$ দিন

কিন্তু এই তেকুফা গণনায় তাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ষগণনা করেন নাই। গণনা অনুযায়ী এবং প্রদত্ত তালিকা থেকে তেকুফা আরম্ভের দিন বের করে নেওয়া বেশ সহজসাধ্য। এই গণনা অনুসারে যে সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে সত্যিকার সময়ের বেশ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তিশরী প্রথম দিনের জন্য আদমী বর্ষ (Aera Adami) থেকে ধরা যাক্ এর Moled আলেকজেন্দ্রীয় বর্ষের (Aera Alexandri) ১৩১১ সনের "ইলুলের" প্রথম দিন রবিবারে পড়ে। আদমীবর্ষে পূর্ণ বৎসরের সংখ্যা হোল ৪৭৫৯ বা ৮টি বৃহৎ চক্র (৮×৫৩২ =৪২৫৫) ২৬টি ক্ষুদ্র চক্র (২৬×১৯=৪৯৪) এবং ৯টি পূর্ণ বৎসর বা ১৭৩৮২০০ দিন ৭ ঘণ্টা ২৫৩ হালাকিম। আদমীবর্ষের প্রথম বৎসরের moled এবং উপরোক্ত বৎসরের moledএর মধ্যে এই ব্যবধান থাকবে। আমরা প্রথমেই বলেছি ইহুদীদের ধর্মমত অনুসারে তেকুফা-এ-তিশরী (autumnal equinox) আদমীবর্ষের প্রথমেই বৎসরের moledএর ৫ দিন ১ ঘণ্টা পরে সংঘটিত হয়েছিল। তা হোলে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে ৫ দিন ১ ঘণ্টা বাদ দিলে প্রথম বর্ষের তেকুফা-এ-তিশরী এবং বর্তমান

বৎসরের molededএর মধ্যেকার ব্যবধান পাওয়া যাবে। এই সময়কে ৩৬৫¼ দিয়ে ভাগ করলে ৪৭৫৮ বৎসর হয়ে ৩৩৫¾ দিন অবশিষ্ট থাকে। এই সৌর বৎসর পূর্ণ হয়ে আবার দিন রাত সমান হবার দিন আসতে ২৯ দিন ১১ ঘণ্টা ৮২৭ হালাকিমএর দরকার। এই সংখ্যাটি বর্তমান বৎসরের moledএর সঙ্গে যোগ করলে অর্থাৎ রবিবারে দিনের বেলাতে ৭ ঘণ্টা ২৫৩ হালাকিম যোগ করলে তিশরী প্রারম্ভ মাসের প্রথম দিনে মঙ্গলবারের রাত্রকে ৯ ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়।* এইরূপ গণনা অনুসারে দেখা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী যেদিন দিবারাত্রি সমান হয় ইহুদীদের মতানুযায়ী তেকুফা তার ১৪ দিন পরে সংঘটিত হবে। এমনি পার্থক্য বা এর চেয়ে কম পার্থক্যকেও কোন প্রকারে অবহেলা করা যায় না তাতে ধর্মমত যাই হোক না কেন।"

প্রচলিত বিভিন্ন মতের বিজ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা গণনাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বস্তুত গ্রন্থখানি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তালিকায় ভরপুর। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়াই যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বিরাট কার্যরূপে প্রতীয়মান হবে তার সঙ্গে তাদের তারিখ, সন, পঞ্জিকার মূল

---

* If we add this number of days, hours and halakim to the moled of the present year i. e., to Sunday 7h 253H of day time, we advance as far as the night of Tuesday 9h on the 1st day of the month Tishriu Primus.

উৎস বের করে তার সমালোচনা এবং নিজস্ব উদ্ভাবনা যোগ করে দেওয়া যে কি প্রতিভার পরিচায়ক সে ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। এর প্রত্যেকটি কাজের জন্য তিনি কিভাবে পূর্বাপর বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছিলেন একটি উদাহরণ থেকেই তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। কোন বৎসরের moled নিরূপণের বৈজ্ঞানিক উপায় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "যদি কোন গণিতবিদ ইহুদীদের ধর্মমত প্রয়োগ না করে শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সংযোগ সময় (Time of conjunction) জানতে চান তা হোলে তিনি প্রদত্ত টেবল ব্যবহার করলেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে পারবেন। পূর্বেরগুলির মত এটিকেও পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই সম্পাদনা করা হয়েছে। এটি তৈরী করতে আমরা টলেমীর মতানুযায়ী মাসের গড় দৈর্ঘ্য, খালেক এবনে আবদুল মালিকের দামস্কাসে জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ এবং মুসা বিনা শাকিরের পুত্রদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এঁদের মধ্যে মুসা বিন শাকিরের পুত্রদের মতই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং অনুসৃত হবার উপযুক্ত বলে মনে করি কেন না সত্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের জ্ঞান ও কৌশলে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ ফলগুলির সততা সম্বন্ধে একমত।"

সমস্ত গ্রন্থখানি এমনিভাবে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গণনায় ভরপুর। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি গ্রন্থের সংখ্যা অতীব বিরল। মধ্য এশিয়ার নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত বা অধুনা বিলুপ্ত বর্ষগণনা পদ্ধতি, পর্বাদি, ধর্মকর্মের নিয়মকানুন ইত্যাদির এমনি বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা আলবেরুনী ছাড়া অন্য কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। কোন উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করলেও এর চেয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আলবেরুনী যে সমস্ত স্থান থেকে অধুনা বিলুপ্ত বিষয়গুলির উদ্ধারসাধন করেছিলেন সে সমস্ত উৎস বর্তমানে যে কোন লেখকের আয়ত্তের বাইরে। সে হিসাবে এর মৌলিকত্ব যে চিরকালের জন্য অবিনশ্বর রয়ে যাবে সে বিষয় কোন সন্দেহই নাই। গ্রন্থখানি এবং গ্রন্থকর্তার স্থান কত উচ্চে Prof. Sachauএর মন্তব্য থেকেই এ বিষয় কিছু উপলব্ধি করা যেতে পারে। "As the first editor and translator of a book of this kind, I venture to claim the indulgence of the reader. Generations of scholars have toiled to carry the understanding of Herodotus to that point where it is now, and how much is wanting still ! The work of generations will be required to do full justice to AlBiruni."

আলবেরুনীর বহুমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া

এস্থানে সম্ভবপর নয়। তাঁর সম্বন্ধে শুধু বলা চলে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এক কথায় কৃষ্টির সমস্ত পরিবাহকের সঙ্গে এমন পরিচয়, সমস্ত বিষয়ে এমন নিপুণতা, এমন অভিজ্ঞতা পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল। জ্ঞানবিজ্ঞানে এমনি প্রতিভাদীপ্ত মনীষীর আবির্ভাব যে কোন সমাজের যে কোন যুগের গৌরব। এই অভূতপূর্ব প্রতিভার একমাত্র পরিচয় তাঁর গ্রন্থাবলী। এগুলির তালিকাতেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা সামান্যভাবে বোধগম্য হতে পারে। এখানে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর কতকগুলির নাম দেওয়া গেল।

১। কিতাবুল হিন্দ ২। কানুনে মাসউদী ৩। আত্‌তাফ-হীমা লি অওয়াইল-ই-সিনাতিত্‌ তানজীম বা কিতাবুত্‌ তাফহীম ৪। কিতাবুল জমাহির ফি মরিফতিল জওয়াহির ৫। কিতাবুস সায়দানা ৬। মুজহতুল আফকার ৭। আল আসারুল বাকিয়া মিনাল কুরুনিল খালিয়া ৮। মকালতুন ফী সহময়স্‌ সাদতি ওয়াল গয়ব ৯। কিতাবুদ্‌ ত্বরর ১০। ইস্তিয়াবুল বুজুহিল মুম্‌কিনা ১১। ফি তসহীলিত তসতীহিল উসতারলবীয়ে ওয়াল আমল ১২। কিতাবুল ইসতিসহাদ বি খতিলাফুল আরসাদ। ভারতীয় পণ্ডিতদের জন্য—১৩। হিন্দু জ্যোতিষীগণের প্রশ্নের উত্তর (সংস্কৃত) ১৪। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের দশটি প্রশ্নের উত্তর ও তাদের সন্দেহ নিরসন ১৫। আস্তারলব সম্বন্ধে গ্রন্থ (সংস্কৃত) ১৬। টলেমির আলমাজেষ্টের অনুবাদ (সংস্কৃত) ১৭। ইউক্লিডের অনুবাদ (সংস্কৃত)
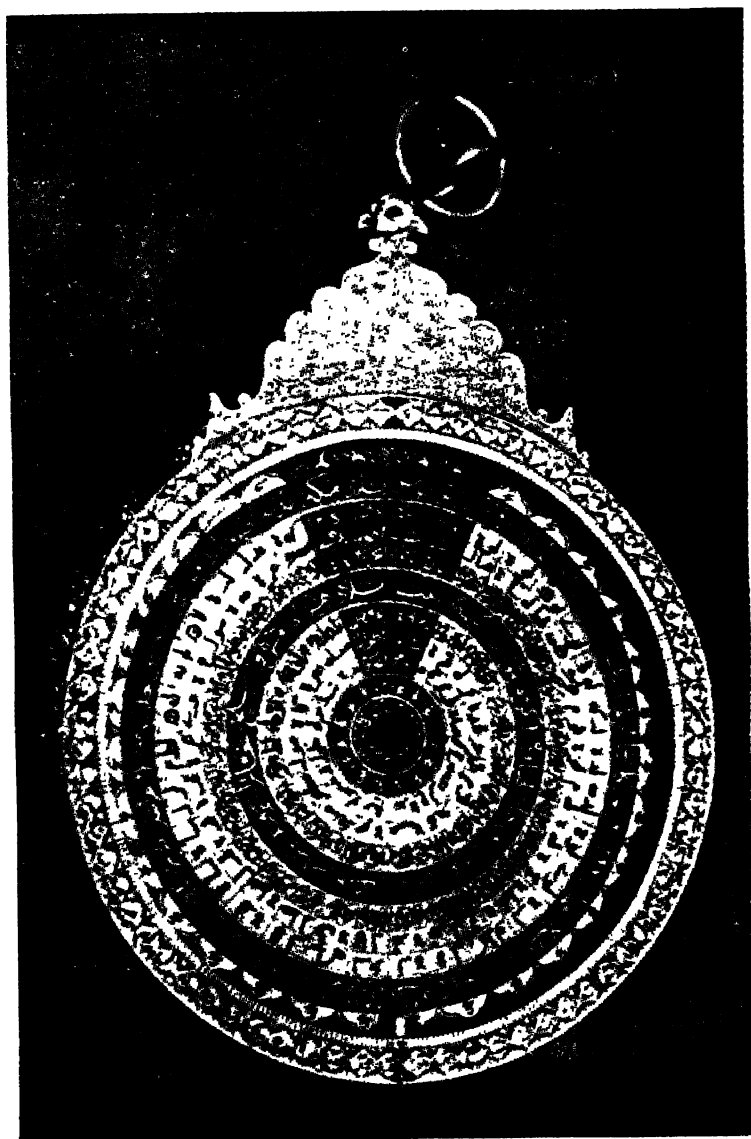
খোলা অবস্থায় আস্তারলবের অভ্যন্তরভাগ

১৮। জ্যোতিষ গ্রন্থ (সংস্কৃত) ১৯। ব্রহ্মগুপ্তের পঞ্চ সিদ্ধান্তের আরবী অনুবাদ ২০। ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের আরবী অনুবাদ ২১। সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধীয় হিন্দু জ্যোতিষীদের আলোচনা অনুবাদ ২২। সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ ২৩। গণিত শিক্ষায় সংখ্যার আলোচনা (An account of figures in the teaching of Mathematics) ২৪। ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের আরবী অনুবাদ ২৫। পণ্ডিত পাতঞ্জলের আরবী অনুবাদ ২৬। বরাহ মিহিরের লঘুজাতকমের আরবী অনুবাদ ২৭। বসু-দেবের দ্বিতীয় অবতার সম্বন্ধে গ্রন্থ ২৮। সংস্কৃত থেকে আরবীতে অনুদিত গ্রন্থগুলির ভ্রম সংশোধন ২৯। জাওয়ামিল মাওজুদ ওয়া খাওয়াতিরুল হুনুদ ৩০। আরবী ও সংস্কৃত লিখন প্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা ৩১। ফিল ইরশাদ এলা তাশিহিল মাবাদি আলান্ নামুদারাত। ৩২। ত্রিরাজীক ফী রাশীকাতুল হিন্দ ৩৩। মিফতাহল হায়াত্ ৩৪। 'কল্লয়ার' সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধীয় আয়ুর্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ ৩৫। কপিলের সাঙ্খ্য গ্রন্থের অনুবাদ।

বলা বাহুল্য এগুলো ছাড়াও তাঁর লিখিত আরও বহু গ্রন্থাবলীর নাম পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি এখনও লোকচক্ষুর বাইরেই রয়ে গেছে হয়ত বা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রন্থগুলির প্রণয়নের উপকরণ হিসাবে তিনটি জিনিষের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত হোল বহু গ্রন্থ অধ্যয়নজনিত জ্ঞান, দ্বিতীয়ত দেশ বিদেশে ভ্রমন উপলক্ষে বিভিন্নজাতির নিকট প্রাপ্ত

উপকরণ, তৃতীয়ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হোল তাঁর মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা। বিভিন্ন জাতির নিকট শ্রুত উপকরণের সাহায্যে লিখিত গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব হোল পুরাকালের স্মৃতি। এগুলির অন্য কোন লিখিত ইতিহাস নাই; বোধ হয় আলবেরুনীর গ্রন্থাবলী ব্যতীত এদের অনেকগুলির অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই।

আলবেরুনীর গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিতেই আনুসঙ্গিকভাবে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে। ইতিহাস আলোচনা করতে যেয়েও কেমনভাবে গণিতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কিতাবুল হিন্দ এবং আল আসারুল বাকিয়া গ্রন্থে। শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র হিসাবে কানুনে মাসউদী এবং কিতাবুত্ তফহীমের নাম করা যেতে পারে। এগুলিতে পূর্ব ইতিহাসের সঙ্গে গ্রন্থকারের অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণাও স্থান পেয়েছে। কানুনে মাসউদীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হাতে অঙ্কশাস্ত্রের কি অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল কানুনে মাসউদী তার অন্যতম নিদর্শন। কিতাবুত্ তাফহীম কানুনের মত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিক্ষার উদ্দেশ্যেই এখানি রচিত হয় তবে মৌলিকতার দিক থেকে এর মূল্যও খুব কম নয়। অনুবাদকর্তা Ramsay Wright এর মতে গ্রন্থখানি যদিও জ্যোতিষ সম্বন্ধে উপদেশাবলী সম্বলিত তবুও একে একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, এবং জ্যোতিষে ব্যবহৃত আস্তারলব এবং এই সময়কার সর্বজন সমাদৃত ভূগোল এবং

chronology সম্বন্ধেও এতে আলোচনা হয়েছে। সে হিসাবে একে cosmographyর গ্রন্থ বলা যেতে পারে কিন্তু গ্রন্থকার একে জ্যোতিষবিদ্যার গ্রন্থের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। 'The Tafhim is a book of instruction in the principles of art of astrology but may be regarded as a Primer of Eleventh Century Science, because apart from the elements of geometry and astronomy and the use of astrolabe for astronomical and astrological purposes (Astrology is differentiated as ilm al-tanjim, ilm ahkam al-nujum) it has sections on geography and chronology both favourite topics at this period. It is, therefore, often classified with other works designated as cosmographies but the author places it at the head of his list of works on Astrology. Albiruni insists that no one is entitled to call himself an Astrologer unless he possesses a thorough knowledge of these ancillary Sciences.'

গ্রন্থকার এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুখপত্রেই বলেছেন "বিশ্ব পৃথিবীর আকৃতি, গঠন, পৃথিবী এবং আকাশে বিরাজিত গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয়ে বিশদ জ্ঞান এবং সম্যক্ উপলব্ধি জ্যোতিষ

বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। তাতে জ্যোতিষ আলোচনাকারী, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহৃত হয় সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং পরে যখন তিনি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তখন আর তাঁর কোন কষ্টই হয় না। এইজন্যেই আমি রায়হানা বিন্‌তে হাসানের অনুরোধে প্রশ্নোত্তররূপে সরলভাবে এ গ্রন্থখানি রচনা করেছি। এতে বোঝবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে। আমি জ্যামিতি থেকে সুরু করে অঙ্ক, Science of Numbers, বিশ্বের গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে সর্বশেষে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।"

এই রায়হানা বিনতে হাসান কে সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। র‍্যামজের মতে রায়হানা আলবেরুনীর কোন বন্ধুর কন্যা। এই বন্ধুটিও আলবেরুনীর মতই ৪০৮ হিজরীতে মাহমুদের রাজধানীতে নীত হন। যা হোক এই রায়হানা যেই হোন না কেন তিনি যে অতীব বিদুষী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সাধারণত প্রাচ্যে নারী জাতির মধ্যে বিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। মুসলিম জাতির উন্নততর অবস্থায়ও এদিকে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই সে হিসাবে রায়হানা যে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কোন নারীর নামে বোধ হয় এর পূর্বে কোন গ্রন্থও উৎসর্গিত হয় নাই সে দিক দিয়েও রায়হানাকে একক বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহের

পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি যে বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন আলবেরুনীর গ্রন্থ উৎসর্গ থেকেই সে স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু তিনি এতে মৌলিকতার কোন পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব।

কিতাবুত্ তফহিমকে জ্যোতিষ বলে অভিহিত করলেও এতে জ্যোতিষের চেয়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চাই বেশী হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থখানি ৫৩০ পারায় বিভক্ত, তন্মধ্যে জ্যামিতি ১-৭১ পারা, অঙ্ক ৭২-১১৯ পারা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ১২০-২৩৫, ভূগোল ২৩৬-২৪১, জ্যোতির্বিজ্ঞান—২৪২-২৬৮ chronology ২৬৯-৩২৩, আস্তারলব ৩২৪-৩৪৬, জ্যোতিষ (রাশিচক্র)—৩৪৭-৩৮০ গ্রহাদি—৩৮১-৪৪৭, রাশিচক্রের বিভাগ—৪৪৮-৪৬০, গৃহাদি (Houses) ৪৬১-৪৭৪, ভাগ্যফল—৪৭৫-৫১৪, বিচার জ্যোতিষ (Judicial astrology)—৫১৫-৫৩০ এ থেকেই বোঝা যাবে নামের সঙ্গে গ্রন্থের বিশেষ কোন সাদৃশ্যই নাই। জ্যামিতির অংশে সাধারণত জ্যামিতিতে ব্যবহৃত সমস্ত প্রকার অঙ্কনাদির চিত্র সহ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে আলমাখরুত (Conics), কুসী মুতাশাবিহাহ (similar arcs) প্রভৃতি জটিল জ্যামিতিক বিষয় সমূহও গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় থেকে বাদ যায়নি। সহজ দৃষ্টান্ত স্বরূপ চতুর্ভুজের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে গ্রন্থকারের মতে "চতুর্ভুজের মধ্যে প্রথম হোল মুরাব্বা সমবাহু সমকোণী (square) এতে সমস্ত বাহুগুলি সমান এবং সমস্ত

কোণগুলি সমকোণ এবং বিপরীত কোণ সংযোগকারী কর্ণগুলিও সমান। দ্বিতীয় হোল মুসতাতিল (Rectangle) এতে কর্ণগুলি সমান, কোণগুলিও সমকোণী কিন্তু শুধু বিপরীত বাহুগুলিই সমান। তৃতীয় হোল মুয়ায়েন (Rhombus) (বা যার চশমা আছে অর্থাৎ যার কর্ণগুলি অসমান, যেমনই চশমাই তারাজুর অর্থ হোল যে পাল্লার এক অর্ধেক অন্য অর্ধেকের চেয়ে বড়) এর বাহুগুলি সমান, কর্ণ অসমান, বিপরীত কোণগুলি সমান বটে কিন্তু সমকোণী নয়। চতুর্থ হোল শাবিহ বিল মুয়ায়েন (Rhomboid) এ অন্যগুলির চেয়ে পৃথক কারণ এর বিপরীত বাহুগুলি অসমান। অন্য চতুর্ভুজকে "মুন হারাফ" বলা হয় বহুভুজের মধ্যে যেগুলির বাহু ও কোণ সমান সেগুলিকে বাহুর সংখ্যা অনুসারে নাম দেওয়া হয় যেমন মুখাম্মাস, মুসাদ্দাস্, মুসাব্বা ইত্যাদি।

অঙ্কের বেলায়ও এমনি সংখ্যার সংজ্ঞা, তাদের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থকার জটিলতর সমস্যায় উপনীত হয়েছেন। সংখ্যার নামের তালিকা থেকেই গ্রন্থকারের ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। যেমন আদাদ আত্‌তাবিয়া (natural number) জাওয়াজ (even) ফারাদ (odd) জাওয়াজ আল জাওয়াজ (evenly even) জাওয়াজ আলফারাদ (unevenly even) জাওয়াজ আল জাওয়াজ আল ফারাদ (evenly-even-odd) ফারাদ আল ফারাদ (oddly odd) মা আল আদাদ আল আওয়াল (Prime

number) মা আল আদাদ আল মুরাক্কাব (composite number) মা আল আদাদ আল মুসাত্‌তাহ (Plane number) মা আল আদাদ আল মুতাম্‌মাম্‌ (complete number) মা আল আদাদ আল মুশ্‌তারাকাহ্‌ (Number with common factors) মা আল আদাদ আলমুতাবাইনাহ (Separate numbers) মা আল আদাদ আত্‌তামম্‌ (Perfect number) মা আল আদাদ আন্‌নাকিছ ওয়াজ্জাইদ (Deficient and abundant numbers) মা আল আদাদ আল মুতাহাব্বাহ্‌ (amicable numbers) মা আল আদাদ আলমুজাস্‌সামা (solid numbers) মা আল আদাদ আল মুছাল্‌লাছা আল মুতাওয়ালিয়াহ (Traingular number) মা আল আদাদ আল মুরাব্বাহ আল মুতাওয়ালিয়াহ (Square numbers) মা আল আদাদ আল মাখরুতিয়াহ (comical numbers) মা আল আদাদ আল আহ্‌রামিয়াহ (Pyramidal numbers) এর প্রত্যেকটির সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তবে গ্রন্থকার ক্ষান্ত হয়েছেন। গ্রন্থকার কিভাবে উদাহরণ দিয়ে এগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন একটি দৃষ্টান্তেই সে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। Amicable number এর কথা বলা যেতে পারে। এ এমনি দুইটি সংখ্যা যার একটির ভগ্নাংশের সমষ্টি অন্যটির সমান। এমনি দুইটি যুগ্ম সংখ্যার একটি সব সময়েই সম্পূর্ণ অন্যটি অসম্পূর্ণ (one of

such pair is always abundant, the other deficient) 220 এবং 284 amicable number এদের মধ্যে 220 সম্পূর্ণ সংখ্যা এবং 284 অসম্পূর্ণ সংখ্যা ; 220 এর $\frac{1}{2}=110$, $\frac{1}{4}=55$, $\frac{1}{5}=45$, $\frac{1}{10}=22$, $\frac{1}{20}=11$, $\frac{1}{110}=2$, $\frac{1}{55}=4$, $\frac{1}{44}=5$, $\frac{1}{22}=10$, $\frac{1}{11}=20$, $\frac{1}{220}=1$ $(110+55+44+22+11+2+4+5+10+20+1)=284$

আবার 284 এর $\frac{1}{2}=142$, $\frac{1}{4}=71$, $\frac{1}{142}=2$, $\frac{1}{284}=1$, $\frac{1}{71}=4$, $(142+71+2+1+4)=220$

অন্য বিষয়েও এমনি প্রাথমিক সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ জটিলতর সমস্যা আলোচিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যেই এই জটিলতা সব চেয়ে বেশী ভাবে দেখা দিয়েছে বলা যেতে পারে। গ্রন্থকার জ্যোতিষ শিক্ষা দেবার অজুহাতে কেমনভাবে উৎসাহী ছাত্রীকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশদ ভাবে জ্ঞানী করে তোলবার প্রচেষ্টা করেছেন গ্রন্থখানির সর্বত্রই তার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষ শিক্ষার জন্যে গ্রহনক্ষত্রের গুণাগুণ দরকার হলেও তাদের দূরত্ব, পরিমাপ, পরিধির বিশেষ কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না তেমনি অপভূ, অনভূ, উদবিন্দু, অববিন্দু (মা আস্ সায়েদ ওআল হাবেত ascending and descending nodes) বিশ্বদিবস (মা আইয়াম ও আল আলম world days) দিগংশিক বিন্দু (মা আস্ সামাত azimuth) প্রভৃতির সঙ্গেও জ্যোতিষীগণের বিশেষ পরিচয় থাকবার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না কিন্তু বৈজ্ঞানিক

জ্যোতিষী এই সমস্তই খুটিনাটিভাবে আলোচনা করেছেন। শুধু নীরস বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেই এর শেষ হয় নাই বৈজ্ঞানিক একে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্যে দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিকদের ব্যবহৃত গণনাপদ্ধতিও উধৃত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আল আইয়াম ওয়াল আব্বাসএর উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থকারের মতে "যে সময়ে গ্রহগুলি তাদের অপভূ এবং পাতসহ অবশিষ্টশূন্য সম্পূর্ণ আবর্তন শেষ করে সেই সময়কেই "বিশ্বদিবস" বলে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই বিশ্বদিবসএর গণনা করেছেন কিন্তু হিন্দুদের কল্প প্রথাই সব চেয়ে বেশী পরিচিত। হিন্দু পদ্ধতিতে একে 'কল্পহরজ্ঞান' বলে এবং আমাদের মুসলিমদের কাছে এ সিন্দহিন্দ দিবস (sindhind days) নামে পরিচিত! অবশ্য আমাদের এ নামটি অযৌক্তিক। হিন্দুদের ভাষায় নামটি হোল সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক দরকারী জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের নামই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁদের গ্রন্থ অনুসারে এমনি পাঁচখানা সিদ্ধান্ত আছে। প্রথমখানা সূর্য, দ্বিতীয়খানা বশিষ্ঠ, তৃতীয়খানা পুলিষ, চতুর্থখানা রোম, এবং পঞ্চমখানা ব্রহ্মের নামানুসারে পরিচিত (সূর্যসিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, পুলিষসিদ্ধান্ত, রোমক-সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত) হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুই কল্পে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। গ্রহগুলি যখন কোন রবিবারে মেষরাশিতে একত্রিত হয় (set out from the 1st point of aries on a sunday) তখন এই দিনের সুরু হয়, তারপর এই কল্প শেষ

হবার পর রাত্রির আরম্ভ হয়। রাত্রিতে সব কিছুই নিস্তব্ধ নীরব হয়ে যায়। এমনিভাবে ব্রহ্মার এক অহোরাত্রি শেষ হয়। (ব্রহ্মার অহোরাত্র ৮,৬৪০,০০০,০০০ বৎসর) ব্রহ্মার আয়ু এমনি দিনের গণনায় ১০০ বৎসর।

এ সমস্যার সমাধান ব্যাপার বহু জটিল। আমরা অন্যত্র এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। যা হোক এখানে হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী এক কল্পে গ্রহগুলির আবর্তনের সংখ্যার একটি তালিকা দেওয়া গেল। এতে আমাদের গণনা দেওয়া হয় নাই; তবে আবু মাশারের পারসী মতানুযায়ী গণনাকৃত গণনা দেওয়া গেল।

	হিন্দু গণনা	আবু মাশারের সহস্রাদি গণনা
এক কল্প	১,৫৭৭,৯১৬,৪৫০,০০০	১,৩৪১,৪৯৩,২৪০ (বিশ্ববর্ষে দিবস)
৬৩২ খৃঃ অব্দে ১৬ই জুন পর্যন্ত	৭২০,৬৩৫,৮০৬,৩১৩	১,৩৬৩,৫৯৮
সূর্যের আবর্তন	৪,৩২০,০০০,০০০	৩৬০,০০০ (বিশ্ববর্ষে বৎসর)
সূর্যের অপভূর আবর্তন	৪৮০	
চন্দ্রের আবর্তন	৫৭,৭৫৩,৩০০,০০০	৪,৮১২,৭৭৮
চন্দ্রের অপভূর আবর্তন	৪৮৮,১০৫,৮৫৮	১৯,৩৬৫
চন্দ্রের পাতের আবর্তন	২৩২,৩১১,১৬৮	১৯,৩৬০
শনির আবর্তন	১৪৬,৫৬৭,২৯৮	১২,২১৪

	হিন্দু গণনা	আবু মাশারের সহস্রাব্দি গণনা
শনির অপভূর আবর্তন	৪১	
ঐ পাতের ,,	৫৮৪	
বৃহস্পতির আবর্তন	৩৬৪,২২৬,৪৫৫	৩০,৩৫২
ঐ অপভূর ,,	৮৫৫	
ঐ পাতের ,,	৬৩	
মঙ্গলের আবর্তন	২,২৯৬,৮২৮,৫২২	১৯১,৪০২
ঐ অপভূর ,,	২৯২	
ঐ পাতের ,,	২৬৭	
শুক্রের আবর্তন	৭,০২২,৩৮৯,৪৯২	৫৮৫,১৯৯
ঐ অপভূর ,,	৬৫৩	
ঐ পাতের ,,	৮৯৩	
বুধের আবর্তন	১৭,৯৩৬,৯৯৮,৯৮৪	১,৪৯৪,৭৫১
ঐ অপভূর ,,	৩৩২	
ঐ পাতের ,,	৫২১	
স্থির নক্ষত্র	১২,০০০০	

গ্রন্থখানি কেমন ব্যাপক এবং এ গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকার কি অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেছেন এই থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে। আলবেরুনীর বিজ্ঞানে দান সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁর এই প্রাথমিক শিক্ষার গ্রন্থই যে কোন মানুষকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারে।

ইবনে সিনা

আলবেরুনীর সমসাময়িক অন্য যে ব্যক্তি প্রাচ্যপাশ্চাত্যে জ্ঞানগরিমা ও মনীষার জন্যে সমধিক বিখ্যাত তিনি হোলেন মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ইবনে সিনা। সাধারণত দেখা যায় যে অতি বড়দের প্রথম জীবন থাকে দুঃখকষ্টে নিমজ্জমান। তাঁদের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে। হয়ত বা নির্মম দারিদ্র্য সমস্ত প্রতিভাকে অক্টোপাসের মতই বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে রাখে, কিম্বা হয়ত রাজনৈতিক বাত্যা সাজান গোছান জীবনধারাকে এক নিমেষে দেয় ওলোটপালট করে। জীবন সুরু হয় দৈনন্দিন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কিন্তু ইবনে সিনার বেলায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। দারিদ্র্য রাজনৈতিক বাত্যা কোন কিছুই তাঁর প্রথম জীবনের পথে এসে দাঁড়ায় নাই। সে কেটেছে অতুল ঐশ্বর্য মহাসমারোহের মধ্যে। তাঁর পিতা আবদুল্লা ছিলেন খারমাইসান প্রদেশের গভর্ণর। মধ্যযুগের বিলাস আড়ম্বর, জাঁকজমক কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর প্রাসাদে। তা ছাড়া পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত বিলাস উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী মনও যে তাঁর মনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছিল সেও নিঃসন্দেহে বলা চলে। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পুত্র হিসাবে ইবনে সিনার প্রথম জীবন যে কত জাঁকজমক আরাম বিলাসে অতিবাহিত হয়েছিল সে সহজেই অনুমেয়।

৯৮০ খৃঃ অব্দে (৩৭৫ হিজরী ৩রা সফর) ইবনে সিনার জন্ম হয়। তাঁর জন্ম স্থান নিয়ে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কারুর কারুর মতে তাঁর পিতা যে স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন সেই খারমাইসানেই তাঁর জন্ম হয়। কেউ কেউ বলেন তিনি বোখারার অদূরবর্তী আপসেনাতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ এই তুটিকে অগ্রাহ্য করে বলখ্‌কে তাঁর জন্মস্থান বলে নির্দেশ করেন। এই বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তির একটি কারণ হোল তাঁর পিতা আবতুল্লার পূর্ব পুরুষগণের বাসস্থান ত্যাগ করে নূতন স্থানে বসতি স্থাপন। আবতুল্লার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন বলখের অধিবাসী। আবতুল্লাই হয়ত বা রাজনৈতিক কারণে কিম্বা চাকুরীর খাতিরে বলখ্‌ ত্যাগ করে বোখারায় বসতি স্থাপন করেন সামানীয় নৃপতি নুহ ইবনে মনসুরের রাজত্বকালে। কোন সময় তিনি এই পরিবর্তন সাধন করেন সে সঠিক ভাবে জানা যায় না। এই বাসস্থান পরিবর্তনের সময়ের অনির্দিষ্টতাই ইবনে সিনার জন্মস্থানের অনির্দিষ্টতার প্রধান কারণ বলা চলে। কারুর মতে এই পরিবর্তন হয় ইবনে সিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্মগ্রহণের পর। কারুর মতে ইবনে সিনার জন্মের পূর্বেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়। আপসেনার দাবী বোধ হয় তাঁর মাতৃকুলের বাসস্থানের সঙ্গেই বিজড়িত। তাঁর মাতা ছিলেন এই আপসেনার এক ধনাঢ্য পরিবারের কন্যা। ইবনে সিনার পিতাই যে শুধু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা নয় বহুপূর্ব থেকেই এই বংশের ইতিহাস রাজনীতির সঙ্গে বিজড়িত। তাঁর

পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই এমনি উচ্চ রাজপদে অধি ছিলেন এবং হয়ত বা সেই জন্যেই আরাম বিলাসও তাঁদের অস্থি মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষা দীক্ষা বিজ্ঞান দর্শনের জন্য অতি মাত্রায় আগ্রহ—কোন কিছুতেই এই বিলাসিতার মোহ থেকে ইবনে সিনাকে নিষ্কৃতি পেতে দেয় নাই। কারুর কারুর মতে এই বিলাসিতা এবং এর সঙ্গী অন্য একটি উপসর্গ তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালের কারণ।

অগণিত বিলাস উপকরণ, শিশুর মনের উপর যতই প্রভাব বিস্তার করে থাকুক না কেন তাঁর শিক্ষার প্রতি অনুরাগে এতটুকু ঘুণ ধরাতে পারে নাই। পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি পিতাও ছিলেন অতি সজাগ। বোখারায় আগমনের পরেই তিনি পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

ধনীর পুত্র হলেও ইবনে সিনা অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধা-সম্পন্ন ছিলেন। দশ বৎসর বয়সেই তিনি সমস্ত কো'রাণ শরিফ মুখস্ত করে ফেলেন এবং কোরাণ শরিফ ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। এ ছাড়া অঙ্ক বীজগণিত এবং ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদিতেও তিনি বেশ জ্ঞান লাভ করেন। এর পরে তিনি ইসমাইল সুফীর নিকট ধর্মতত্ত্ব বিষয়, ইসা ইবনে ইয়াহিয়া নামক ক্রীশ্চিয়ান চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা এবং আবদুল্লাহ আন্ নাতিলির নিকট ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি, আলমাজেষ্ট, বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পরফিরির (Porphyry) ইসাগোজি প্রভৃতি শিক্ষা করেন। এ ছাড়া নিজে নিজে পদার্থ বিদ্যা, এবং খগোল শাস্ত্র

বস্তুবিজ্ঞান ইত্যাদিরও অধ্যয়ন সুরু করেন। বোধ হয় তাঁর চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে গৃহ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার সমাপ্তি হয়। তিনি নিজে নিজেই সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দর্শন এবং চিকিৎসা-বিদ্যাই ইবনে সিনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ব্যবহারিক নিয়ম কানুন এবং প্রয়োগ বিধি ব্যবস্থার অনুশীলনের জন্য তাঁকে চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নাই কিন্তু "দর্শন" তাঁকে অত সহজে রেহাই দেয় না। নানা কুট তর্কজাল ব্যবহার বিধির অতি উর্ধে অবস্থিত দর্শন শাস্ত্র তাঁর নিকট প্রথম প্রথম গোলক ধাঁধাঁর মতই প্রতীয়মান হয়। এ সমন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন "চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা বিশেষ কঠিন নয় কিন্তু দর্শনের ব্যাপারে তা বলা চলে না। এর জটিল মতবাদ, কুট তর্কজাল আমাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।"

যা হোক চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি এমনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন যে তাঁর বয়স যখন সবে মাত্র ষোল বৎসর তখনই তিনি বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসক বলে খ্যাত হয়ে পড়েন। এ খ্যাতি শুধু সাধারণের মধেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়নি। অতি শীঘ্রই রাজ দরবারেও ছড়িয়ে পড়ে এবং চিকিৎসা নৈপুন্যের জোরেই ইবনে সিনা রাজকীয় অনুগ্রহ লাভেও সমর্থ হন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে খলিফা নুহ ইবনে মনসুর এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। দরবারের নামজাদা চিকিৎসকগণের চিকিৎসায়ও এ ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম হয় না। নবীন চিকিৎসকের ডাক পড়ে

নৃপতির চিকিৎসার জন্যে। ইবনে সিনার নৈপুণ্যে খলিফা ব্যাধিমুক্ত হন। খলিফা তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ দেখে পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে নিজের লাইব্রেরী যথেচ্ছা ব্যবহারে অনুমতি দেন।

ইবনে সিনাও এই পুরস্কারের যথা মর্যাদা দিতে কসুর করেন নাই। তিনি নিবিষ্ট মনে লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করে নিজের জ্ঞানায়ত্ত করে ফেলেন কতক বা নকল করে নিজের লাইব্রেরীতে রেখে দেন। রাজকীয় পুস্তকাগার এর পূর্বে এত অধ্যয়নশীল পরিশ্রমী ছাত্রকে পায় নি। যা ছিল অন্যতম বিলাস সামগ্রী সেই হয়ে উঠে সাধকের সাধনার ধন। এই পুস্তকাগারে কি অমূল্য বিষয় সঞ্চিত ছিল তার সাক্ষী হোলেন একমাত্র আবু সিনা। তাঁর পূর্বে অভেদ্য রাজকীয় সম্মানের প্রতিবন্ধকতায় এর মধ্যে প্রবেশ অধিকার কারুর সৌভাগ্যে ঘটেনি; তাঁর পরেও আর কেউ এর সদ্ব্যবহার করবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। তাঁর কাজ সমাপ্ত হওয়ার কিছুকাল পরেই এটি এক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অনেকেই এর জন্যে তাঁকেই দায়ী করেন যদিও এ অভিযোগের কোন যুক্তিসহ কারণই নাই। যা হোক এখান থেকেই সুরু হয় তাঁর চরম প্রতিষ্ঠার অভিযান। পৃথিবীর সর্বস্থানের জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারের সংস্পর্শে এসে তিনি নিজের সাধনার পথ বেছে নেন এবং নিবিষ্টমনে সেই সাধনার পথে ব্রতী হন। সত্যিকার সাধনা কোন দিনই অফলবতী থাকে না, ইবনে সিনার বেলায়ও এর

ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি মাত্র একুশ বৎসর বয়সে সমস্ত সুকুমার বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তবে এ পারদর্শিতা শুধু পুথিগত বিদ্যার মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে রয় নাই। এই সময়ে তিনি একখানা বিশ্বকোষ প্রণয়ণ করেন। এতে গণিত শাস্ত্র ব্যতীত তদানীন্তন সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ে খুঁটিনাটি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত তথ্যের সমাবেশ করে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। গ্রন্থখানি শুধু যুবকের পক্ষেই প্রশংসনীয় নয় যে কোন ব্যক্তিকে এ চিরস্মরণীয় করে রাখতে সক্ষম। গ্রন্থে তাঁর সত্যিকার পরিচয় প্রকট হয়ে পড়ে। এরই মারফত তাঁর অগাধ বিদ্যার খ্যাতিও চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র পারস্য হয়ে উঠে তাঁর প্রশংসায় মুখর।

এমনি বিদ্বান, সুচিকিৎসক হিসাবে সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও, এর পরই তাঁকে জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয় একের পর একে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের কিছুদিন পরে, তাঁর বাইশ বৎসর বয়সে, তাঁর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্নেহশীল পিতার মৃত্যুশোক নিবারিত হতে না হতেই অন্যদিক থেকে বিপদ এসে দেখা দেয়। যে সামানীয় বংশের অনুগ্রহে তিনি ও তাঁর পিতৃপুরুষগণ সৌভাগ্যের বরপুত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবার হয় তাঁদেরই পতন। বোখারা গজনীর সুলতান মাহমুদের বিজয় অভিযানে উৎসর্গিত হয়। ইবনে সিনা সমস্ত ত্যাগ করে প্রাণভয়ে খারিজমের রাজধানী কারকনজিতে পলায়ন করেন। কিন্তু এইটি তাঁর শেষ পলায়ন নয়। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমায় খারিজমে

প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে বসতে না বসতেই আবার তাঁকে সেখান থেকে প্রস্থান করতে হোল। এবারেও সুলতান মাহমুদ ভীতি তাঁকে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গ আলবেরুনীর জীবনী বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে; এখানে তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই খারিজমেই দুই যুগ সূর্যের প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ হয়। আলবেরুনী মাহমুদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও ইবনে সিনা কিন্তু নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁর এ 'সুলতান মাহমুদ' ভীতি বা অপ্রীতির কারণ বোঝা দুষ্কর। কিন্তু এই ভীতি তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত শান্তিতে থাকিতে দেয় নি। সুলতান মাহমুদ তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা শুনে তাঁকে নিজের দরবারে পাবার জন্যে বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠেন। খারিজমের অন্যান্য পণ্ডিতগণকে নিজ দরবারে পেয়েও তিনি ইবনে সিনার কথা ভুলতে পারেন নি।

নিজামীর মতে তিনি ইবনে সিনাকেই বিশেষভাবে পেতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর পলায়ন সংবাদ শুনেই তিনি শিল্পীদের দিয়ে সিনার প্রতিকৃতি আঁকিয়ে সারা পারস্যের রাজন্যবর্গের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আদেশ করেন "ছবিতে যে ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে তাকে লোকে ইবনে সিনা বলে ডাকে। আপনি আপনার অধীনস্থ স্থানে এঁকে খোঁজ করবেন এবং পেলে পাঠিয়ে দেবেন।" সুলতান মাহমুদের এই অতি আকাঙ্খার নিষ্পেষণ দার্শনিকের জীবনে যে কি

অশান্তির বান ডাকিয়ে দিয়েছিল সে তাঁর যাযাবর বৃত্তি থেকেই বেশ অনুমান করা যায়।

খারিজম ত্যাগ করলেও শান্তির রেশ ফিরে আসবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। নানা দুঃখ ভোগের পর দুস্তর মরুভূমি পার হয়ে তিনি নস্য আবিওয়াদি পৌছেন কিন্তু নস্য আবিওয়ার্দিও তাঁর পছন্দ হয় না। এখান থেকে তুসের দিকে রওয়ানা হন কিন্তু সেখানেও তিষ্টিতে পারেন নি। 'সুলতান মাহমুদ' ভীতি তাঁর মনের মধ্যে তখন ভ্রাম্যমান বৃত্তি চাগিয়ে দিয়েছে তাই সেখান থেকে রওয়ানা হন নিশাপুরের দিকে। ওমর খৈয়ামের নিশাপুর ইবনে সিনার গুণ গরিমার কথা শুনে তাঁর দর্শনের জন্য উদগ্রীব থাকলেও তাঁর মাহমুদ ভীতি অপনোদন করতে অপারগ হয়। ইবনে সিনা নিশাপুরে পৌছেই দেখতে পান তাঁরই ছবি হাতে কতকগুলি লোক তাঁকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এখানেও তাঁর থাকা হোল না। তিনি গুরগাঁও এর দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন।

তখন কাবুস বিন ওয়াসমগির ছিলেন গুরগাঁও এর নরপতি। কাবুস ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যিক, জ্ঞান গরিমার ভক্ত। ইবনে সিনার পরিচয় পেয়ে তিনি সাদরে তাঁকে নিজ সভাসদ পদে বরিত করে নেন। দার্শনিক চিকিৎসকও কিছুদিনের জন্য শান্তি পান।

"অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়" প্রবাদ বাক্য সফল করতেই বোধ হয় সিনার এ শান্তির দিনও বেশী দিন

স্থায়ী হয়ে দেখা দিতে পারে নাই। কিছুদিন পরেই রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতে কাবুসের রাজত্বের অবসান ঘটে; তিনি বিদ্রোহী সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হন। কাবুস নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইবনে সিনারও দুর্ভাগ্যের সূচনা দেখা দেয়। রাজনৈতিক ক্ষোভ থেমে গেলেও এর কোন উন্নতি হোল না। তিনি গুরগাঁও ত্যাগ করে রাইতে গিয়ে উপস্থিত হন। রাইতেও তাঁর তিষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। সুলতান মাহমুদ রাই আক্রমণ করবেন তখন রাইএ এমনি জোর গুজব রটছিল। তিনি রাই ত্যাগ করে কাসবিন এবং কাসবিন থেকে হামাজানে যেয়ে উপস্থিত হন। আবার শান্তির রেশ দেখা দিল। হামাজানে তখন রাজত্ব করছিলেন পারস্যের অন্যতম বিদ্যোৎসাহী নরপতি সামসুদ্দোলা। চিকিৎসানৈপুণ্য দেখিয়ে ইবনে সিনা রাজ দরবারে প্রবেশ লাভ করলেন। তাঁর আদর হতে দেরী হোল না। সামসুদ্দোলা তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁকে মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করেন। আজন্ম রাজনীতির সঙ্গে বিজড়িত ইবনে সিনা আনন্দে মন্ত্রীত্ব সুরু করলেন কিন্তু রাজনৈতিক ধুলিবাত্যা আবার তাঁর ভাগ্যগগন ছেয়ে ফেলল। সামসুদ্দোলার মৃত্যুর পরেই ইবনে সিনারও সমস্ত প্রতিষ্ঠা, মানসম্মান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; তিনি কারাগারে বন্দী হোলেন। বাইরের বন্দীত্ব বোধ হয় মনের আগল খুলে দেয়। তাই রাজনীতির সঙ্গে বিজড়িত থেকে এতদিন পর্যন্ত তিনি দর্শন বিজ্ঞানের প্রতি যে অবজ্ঞা দেখিয়ে এসেছিলেন এই কারাগারের

অবসর সময়ে তিনি তার ক্ষতিপূরণে ব্রতী হোলেন। অবসরকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে বন্দী অবস্থাতেই তিনি আবদুল ওয়াহেদ নামক জনৈক বন্ধুর পরামর্শে কিতাবুস্ সিফার সংস্কার করেন এবং কিতাবে আতিকিয়াত ও কিতাবুল হাইয়ান রচনা করেন। এদিকে তিনি কিভাবে মন সন্নিবেশ করতে পেরেছিলেন সে বোঝা যায় এই দুইখানা গ্রন্থ রচনা ব্যাপারেই। এই দুইখানা গ্রন্থ রচনায় তাঁর মাত্র একুশদিন সময় লাগে। এই কারাগারে বন্দী অবস্থাতেই তিনি 'হাইবেন ইয়াকজান' এবং 'হেদায়েতে হোকামার'ও সংস্কার করেন।

যা হোক তাঁকে বেশী দিন বন্দী অবস্থায় ভুগতে হয় নাই। মাস চারেক পরেই তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন এবং ইস্পাহানে গিয়ে উপস্থিত হন। এই সময়ে ইস্পাহানের নৃপতি ছিলেন বুয়াইদ বংশীয় আলাউদ্দৌলা বিন কাজুরী। এখানেও তাঁর সমাদর হতে দেরী হোল না। সামসুদ্দৌলার মত আলাউদ্দৌলাও তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হয়ে নিজের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এতদিন পরে দার্শনিকের জীবনে সত্যি সত্যিই সুখ ও শান্তি এসে দেখা দিল। তাঁর ভ্রাম্যমান বৃত্তির অবসান ঘটল; এইবার তিনি পূর্ণভাবে তাঁর প্রতিভা ও সময়ের সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ পেলেন। রাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান সব কিছুতেই তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। চাহার মাকালায় তাঁর এই সময়কার দৈনন্দিন কার্যের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকেই এই

মহামনীষীর অদ্ভুত জীবনধারার কিছু আভাস পাওয়া যায়। "তাঁর কার্যধারা এমন সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুবিবেচিতভাবে সম্পন্ন হোত যে মহামতি আলেকজাণ্ডারের মন্ত্রী এরিষ্টটলের সঙ্গেই শুধু তার উপমা চলতে পারে। আলেকজাণ্ডারের পর আর কোন নৃপতিই এমন বিচক্ষণ সুপণ্ডিত জ্ঞানী মন্ত্রী পান নি। মন্ত্রী থাকা কালীন ইবনে সিনা প্রত্যেক দিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতেন। প্রাতঃকালীন অন্যান্য কাজের পর দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল সিফার দুই এক পৃষ্ঠা লেখা। লিখতে লিখতে প্রভাত হোত। তখন তিনি ছাত্রদের অধ্যাপনা সুরু করতেন। এই সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে কিয়া রইস বাহমনিয়ার, আবু মনসুর জিঁলা, আবদুল ওয়াহেদ জুরজানি, দামস্কাসবাসী সুলায়মান এবং আবু কালিন্জারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চতুর্দিক ফরসা না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রেরা এমনি অধ্যয়ন করতেন। আস্তে আস্তে চারদিক ফরসা হয়ে আসত, নকিবের আজানধ্বনি সারা দুনিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যেত। ইবনে সিনা ছাত্রদিগকে সঙ্গে করে ফজরের নামাজ পড়তেন এবং পরে প্রাসাদ থেকে বের হতেন।

এমনি প্রত্যূষে বের হোলেও প্রথমেই তাঁর দেখা হত দণ্ডায়মান অসংখ্য দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে। এঁদের মধ্যে অনেক প্রধান ও সম্মানীয় ব্যক্তিও থাকতেন, তা ছাড়া থাকত সাহায্য-প্রার্থী নানা প্রকারে বিপন্ন ব্যক্তিগণ। তাঁদের সঙ্গে আলাপ

করতে করতে ইবনে সিনা রাজপ্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হতেন —চলার পথে দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকত এঁরা সবাই তাঁর অনুসরণ করতে থাকতেন নানা অভিযোগ, নানা বিষয়ে আদেশ উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করতে করতে। মন্ত্রীও পথের মধ্যে যথাযোগ্য উত্তর দিতে দিতে গমন করতেন। এমনি করতে করতে পুনর্বার নামাজের সময় হয়ে আসত। নামাজ সমাধা করে ইবনে সিনা জলযোগ করতেন। তখন পর্যন্ত যে সমস্ত দর্শনপ্রার্থী সেখানে উপস্থিত থাকত তাদের সকলেরই মন্ত্রীর সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থা হত। আবার অফিসের কাজ চলত মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। মধ্যাহ্নের আহার সমাধা করে তিনি জোহরের নামাজ পড়তেন। নামাজের পরে নৃপতির সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন থাকতেন। আসরের নামাজ পর্যন্ত এমনি আলাপ আলোচনা চলত। যদি কোন দরকারী বা গোপনীয় বিষয় থাকত তা হোলে আলোচনাও চলত অতি গোপনে।"

খুব সম্ভব তাঁরই প্ররোচনায় আলাউদ্দোলা হামাজান আক্রমণ করেন। তিনিও এই অভিযানে নৃপতির সঙ্গী হন। এই ভ্রমণই তাঁর জীবনের শেষ ভ্রমণ। এর পূর্ব থেকেই তিনি নানা ব্যাধিতে ভূগছিলেন কিন্তু এ পর্যন্তও সেগুলো তাঁর জীবনের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। হামাজান থেকে ফিরবার পথে তাঁর ব্যাধির প্রকোপ হয়ে পড়ল অত্যন্ত বেশী। তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসা সুরু করলেন; তীব্র

ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োগ করতে লাগলেন কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হোল না। এর মধ্যে ভৃত্যেরা আরও বিপত্তি ঘটিয়ে তুলল। তারা ভুল করে এক বিষাক্ত ঔষধ খাইয়ে দিল কিন্তু শাস্তির ভয়ে ভুল ধরা পড়লেও কিছুই প্রকাশ করল না। অন্য চিকিৎসক চিকিৎসা সুরু করলেন কিন্তু ফল কিছুই হোল না। ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ হওয়া দূরের কথা, চিকিৎসাব ভুলে ব্যাপার আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল। ইবনে সিনা বুঝতে পারলেন যে এবার আর তাঁর মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় নাই। আন্তমকাল নিকটবর্তী জেনে তিনি ক্রীত দাসদাসীদের মুক্ত করে দিলেন। বলপ্রয়োগ করে যাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন তাদের সেগুলো ফিরিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি দীনদরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিজে তওবা করলেন এবং তিনদিনে কোরাণ শারিফ পড়ে ফেললেন। মৃত্যু সম্বন্ধে এবার আর কোন ভুল হয় নাই। ১০৩৭ খৃঃ ৪২৮ হিজরী রমজান মাসে ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। হামাজান নগরীর পশ্চিমে দেওয়ালের নীচে তাঁর কবর দেওয়া হয়। কারুর কারুর মতে কিছুদিন পরে তাঁর লাশ এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ইস্পাহানে তাঁর নিজ বাসগৃহ "কুনগনবদ"এ সমাহিত করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ জীবন কাহিনী বলতে অন্যান্য মুসলীম মনীষীদের বেলায় যেমন ঘটেছে ইবনে সিনার বেলায়ও তার প্রত্যব্যয় ঘটে নাই। তাঁর যাযাবার প্রবৃত্তির সঙ্গে গৃহীর গৃহধর্মের

কতটুকু সামঞ্জস্য ছিল সে নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানা যায় না। বিবাহ সন্তানসন্ততি কোন কিছুরই বিশেষ কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

রাজনীতির দিক থেকে তিনি বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেন নাই বলেই মনে হয়। অতিমাত্রায় প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং অতি উগ্র স্বাধীনচিত্ততাই এর কারণ বলা যেতে পারে। হামাজানে সামসুদ্দৌলার বিশেষ অনুগ্রহ সত্ত্বেও তিনি সৈন্যদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন এবং অপ্রিয়তার জন্যে সামসুদ্দৌলার মৃত্যুর পরে তিনি অল্পদিনের জন্যও নিজের প্রতিষ্ঠা ঠিক রাখতে পারেন নাই। কিন্তু রাজনৈতিক জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোলেও এই স্বাধীনচিত্ততাই তাঁকে কৃষ্টির জগতে মহীয়ান করে তুলেছে; এর জন্যেই তাঁর বৈজ্ঞানিক দার্শনিক জীবন সফলকাম হয়ে উঠেছে। তিনি কোন মতবাদের প্রতিই অন্ধভক্তি দেখাতে রাজী হন নি। যা কিছু বিবেকসম্মত তাকেই আঁকড়ে ধরেছেন সে অতিবড় কারুর মতবাদের সপক্ষেই হোক কি বিপক্ষেই হোক। দার্শনিক হিসাবে তাই তাঁর স্থান প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। দর্শনের কূটতর্কধারাপূর্ণ মতবাদগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিজেদের আদর্শ ও মতবাদ প্রচারকারীদের মধ্যে ইবনে সিনার স্থান সর্বোচ্চে বলা যেতে পারে। এমনি ভাবে যে দর্শনের মতবাদ প্রচার করা যায় তিনিই সর্বপ্রথম সে আদর্শ স্থাপন করেন।

আলবেরুনী ও ইবনে সিনার তুলনামূলক সমালোচনায় একটি

জিনিস অতি সহজেই চোখে পড়ে। সে হোল প্রথম ব্যক্তির শান্তসমাহিতভাব, দ্বিতীয় জনের উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালী জীবন। চরিত্রের দিক দিয়েও এমনি পার্থক্য বর্তমান। প্রথম জন ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি দ্বিতীয় জন ছিলেন আনুসঙ্গিক সমস্ত দোষ নিয়ে অত্যন্ত বিলাসিতা প্রিয়।

ইবনে সিনার মৃত্যুর কারণ হিসাবে অনেকেই তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। এ একমাত্র কারণ না হোলেও অন্যতম কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। চরিত্রে যাই হোক না কেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় ইবনে সিনা আলবেরুনীর মতই সর্বকালের জন্য বরণীয় হয়ে রয়েছেন। রাজনীতি, আমোদ প্রমোদ, বিলাস ব্যসন এ সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর দর্শন বিজ্ঞানের সাধনা। হামাজানে, ইস্পাহানে মন্ত্রীত্বের দায়িত্বশীল কাজের মধ্যেও এ সাধনায় এতটুকু অবসাদ আসে নাই। দিনের বেলায় রাজকীয় কাজের বা ছাত্রদের অধ্যাপনার মধ্যেকার অবসর সময়ে চলত স্বকীয় বা রাজকীয় লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন। সন্ধ্যা কাটত বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে। Eat, drink and be merry'র আদর্শই তখন তাঁকে পেয়ে বসত। সেই সান্ধ্য মজলিসের সমাবেশে তাঁকে দেখলে কারুর মনে এতটুকু সন্দেহেরও উদয় হোত না যে তিনিই একটি সম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, দর্শন বিজ্ঞানের গুরু গম্ভীর অধ্যাপক—যাঁর মনে রয়েছে উচ্চ দর্শন বিজ্ঞানের মতবাদ সুপ্ত হয়ে। সান্ধ্য মজলিস ভাঙ্গার পরেই

আসত তাঁর আসল সাধকের রূপ। নীরব গৃহে সমাহিত চিত্তে তখন তিনি বসতেন গ্রন্থ রচনায়, সুপ্ত চিন্তাধারার জাগ্রত রূপকে অনাগত ভবিষ্যত জ্ঞানসেবীদের জন্য সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরতে। সময় এবং অবস্থা বুঝেই এই লিখিত গ্রন্থের ভাবধারা ও গতিবিধি নির্ধারিত হোত। রাজসভার সঙ্গে বিজড়িত থাকাকালীন প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি কাছে থাকলে তিনি চিকিৎসাতত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, বা বিশ্বকোষ রচনায় মনোনিবেশ করতেন। ভ্রমণের সময়ে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অভাবে চলত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লেখা বা কোন গ্রন্থের সার সংগ্রহ রচনা করা। সুখে দুঃখে সব সময়েই তাঁর এ সাধনার গতি ছিল অবিচলিত। এরই সঙ্গে মিশেছিল তাঁর আরবী পারসী উভয় ভাষার উপর অগাধ দখল। উভয় ভাষাতেই সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাব প্রকাশ করতে তাঁকে এতটুকুও কষ্ট করতে হত না—ফলে তাঁর লেখার মধ্যেও কোথাও এতটুকু জড়তার আভাস পাওয়া যায় না। তাঁর ভাষা সরস কবিত্ব মাখা কোথাও কাটখোট্টা নীরস হয়ে উঠে নি। এদিক দিয়ে তিনি আলবেরুনীকে পরাভূত করেছেন বলা যেতে পারে। এই সরস ভাষার জন্যেই তিনি আলবেরুনীর চেয়ে অতি সহজেই সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইবনে সিনা কৃষ্টির জগতে যে অপূর্ব সম্ভার রেখে গেছেন পৃথিবীর কৃষ্টির ইতিহাসে তাকে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি

কৃষ্টির সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন এবং সর্বত্রই নিজের মৌলিকত্বে একটি উচ্ছাসের সূচনা করেছেন। এ উচ্ছাস শুধু ফাঁপান খোলসভরা অন্তঃসারশূন্য মূর্তি নিয়ে এসে দেখা দেয় নি বরং সব দিক দিয়ে একটি প্লাবনের সৃষ্টি করেছে। বস্তুত একাদশ শতাব্দীতে দর্শন বিজ্ঞানে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন আলবেরুনী ও ইবনে সিনা। এঁদের দুইজনের মধ্যে কে বেশী প্রতিভাসম্পন্ন সে নিয়ে চুলচেরা বিচার করা অসম্ভব। তবে সাধারণভাবে বলা চলে আলবেরুনী ছিলেন খাঁটী বৈজ্ঞানিক আর ইবনে সিনা ছিলেন দার্শনিক। আলবেরুনী যেখানে সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানকে সত্য পথে চালিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন ইবনে সিনা সেখানে সমস্তগুলিকে একসঙ্গে গুছিয়ে একটি দার্শনিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সারটনের মতে "Alberuni represents the more adventurous and critical spirit, Ibn Sina the synthetic; Alberuni more of a discoverer and in that respect comes nearer to the modern scientists ideals; Ibn Sina was essentially an organiser, an encyclopædist, a Philosopher.

যা হোক সাধারন ভাবে দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন হলেও প্রকৃত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিক দিয়েও ইবনে সিনা কম যান নাই। বস্তুত তাঁর জীবন কালে বৈজ্ঞানিক তথা চিকিৎসক

হিসাবেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন—তাঁর দার্শনিক মতবাদ তখন কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের মধ্যে অবশ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানই তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর অধিকাংশ সময়ই এদিকেই নিয়োজিত হয়। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি যে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন আজ পর্যন্তও তার প্রভাব হাকিমি চিকিৎসা জগতে অক্ষুণ্ণ থেকে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার কথা সমস্ত জগতে বিঘোষিত করছে, তাঁর আলকানুন ও আস্‌সেফা এখনও হাকিমি চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রামান্য গ্রন্থগুলির অন্যতম বলে পরিচিত। এ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিভাগে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাবে। শুদ্ধ গণিতের মধ্যে তিনি জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন। তবে এগুলির মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনাই বেশী স্থান পেয়েছে বলা যেতে পারে। জ্যামিতি আলোচনার মধ্যে ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুবাদই বোধ হয় তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি। তাঁর কার্যকলাপ থেকে মনে হয় প্রথম জীবনে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হন নাই হয়ত প্রথম দিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দেবার সুযোগও পান নাই। যতদূর জানা যায় হামাজানেই তিনি সর্ব প্রথম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সুরু করেন।

পর্যবেক্ষণ বিশুদ্ধতর করতে হোলে সর্বপ্রথম বিশুদ্ধতর গণনা করবার উপযোগী যন্ত্রপাতি দরকার। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করতে যেয়ে বিশুদ্ধতর গণনা করবার উপযোগী যন্ত্রপাতি

আবিষ্কারের চিন্তাই ইবনে সিনাকে প্রথমত উদ্ব্যস্ত করে তোলে। তিনি সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন এবং ফলে সূক্ষ্ম গণনা করবার উপযোগী vernierএর অনুরূপ একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অন্যতম কীর্তিগুলির কথা বাদ দিলেও অখণ্ড যুক্তিবলে পৃথিবীর ঘোরা প্রমাণই তাঁকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর করে রাখতে সক্ষম। বিজ্ঞান হিসাবে এর মূল্য এখন যাই হোক না কেন এতে বৈজ্ঞানিকের যে মনঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সে অতুলনীয়। এই বিংশ শতাব্দীতে যখন পৃথিবীর ঘূর্ণন ব্যাপারে গোঁড়া ধার্মিকদের প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় তখন একাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে কতখানি মানসিক সাহসের প্রয়োজন ছিল সে সহজেই অনুমেয়। যা হোক এই মতবাদের প্রবর্তক হিসাবে আলবেরুনী যে বৈজ্ঞানিকের কথা উল্লেখ করেছেন খুব সম্ভব ইবনে সিনাই সেই বৈজ্ঞানিক। সংখ্যা লিখন প্রণালীতে তিনি গ্রীক প্রথাকেই প্রাধান্য দেন এবং গ্রীক পন্থারই অনুসরণ করেন। প্রথমে জীবনে মুদীর নিকট ভারতীয় অঙ্কলিখন প্রণালী শিক্ষা সুরু করলেও এযে তাঁকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারে নাই. পরিণত বয়সে গ্রীক পন্থার অনুসরণেই সে স্পষ্ট বোঝা যায়। পুরণের শুদ্ধির পরীক্ষায় নয় বাদ দেওয়ার প্রথা ইবনে সিনার বহুপূর্ব থেকেই চলে আসছিল কিন্তু একে যে অন্যভাবে অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় সে কথা বোধ হয় অন্য কেউ ভাবেন নাই। তিনি কিন্তু একে পুরণের শুদ্ধি নিরূপণের উপায় হিসাবে রেখে

দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই এটির তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি "বর্গ" এবং "ঘন" এর শুদ্ধির গণনায় একে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তারও প্রমাণ প্রয়োগ করেছেন।

গণিতিক হিসাবে ইবনে সিনার স্থান আলবেরুনীর মত উচ্চ নয়। গণিতের আলোচনায়ও তাঁর দার্শনিক মনোভাবই বেশী করে ফুটে উঠেছে। শুদ্ধ গণিতিক আলোচনায় যার পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার সেগুলিকেও তিনি গণিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দর্শনের কুটতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। প্রমাণস্বরূপ অনন্ত শ্রেণীর (infinite series) আলোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর আলোচনায় গণিতের প্রভাবই বেশী হওয়া উচিত কিন্তু তা না হয়ে এ উঠেছে কখনও কখনও ধর্মমত আলোচনার পক্ষ থেকে কখনও কখনও বা পদার্থবিদ্যার আলোচনার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে। অনন্ত শ্রেণী সম্ভবপর কিনা, কোন সরলরেখা অন্য একটি সরলরেখার সঙ্গে যেখানে মিলিত হয় সেখানে এরদিকে আনত কোন প্রথম বিন্দু আছে কিনা, একটি বর্গ অণুতে বিভক্ত হোলে কর্ণতে বাহু অপেক্ষা কি করে বেশী অণু থাকতে পারে ইত্যাকার প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক শুদ্ধ দর্শন হিসাবে আলোচনা করেছেন। Differential Calculas তখন পর্যন্ত পূর্ণভাবে আবিষ্কৃত না হওয়ার জন্যেই এগুলির গণিতিক পরিণতি সম্ভবপর হয় নাই। তবে এ সমস্ত প্রশ্ন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তখন বৈজ্ঞানিকগণ Differential Calculas এর প্রবর্তনের পথে অনেক অগ্রসর হয়েছেন।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের সঙ্গে গণিতের একটি সামঞ্জস্য সব সময়েই বিদ্যমান রয়েছে। তাই সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে গণিতেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইসলামিক কৃষ্টির মধ্যে সঙ্গীতের প্রভাব এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম মনিষিগণ এদিকে অবহিত হন। ইবনে সিনারও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। এই সঙ্গীত আলোচনার মধ্যেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর পূর্বে আলফারাবী সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক অংশে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, ইবনে সিনা তারই উপর ভিত্তি করে এতে আরও উন্নত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকদিন পর্যন্ত এগুলিকে অনুধাবনই করতে পারেন নাই। অষ্টমের দ্বিত্ব, চতুর্থ এবং পঞ্চমের দ্বিত্বকে সামঞ্জস্য বিধান করা ইত্যাকার নানা বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে যদি $(n+1)$ series দিয়ে সঙ্গতির অনুক্রম (series of consonances) প্রকট করা যায় তা হোলে n যখন ৩৩ হবে তখন বিভিন্ন অবকাশ কালে একই প্রকার সুর ধ্বনিত হবে কিন্তু n যদি ৪৫ হয় তা হোলে আর কাণে বিভিন্ন সুরের পার্থক্য ধরা পড়বে না।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধেও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। যথাস্থানে সেগুলির আলোচনা করা যাবে।

ইবনে সিনা সবসমেত কতগুলি গ্রন্থ লিখেছিলেন তার সঠিক সন্ধান এ পর্যন্ত হয় নি। তবে সংখ্যায় একশতের কম যে নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সংখ্যার প্রাচুর্যের কথায়ই হয়ত

আকারে ক্ষুদ্রতার কথা মনে হতে পারে কিন্তু ঠিক তা নয়। কতকগুলি গ্রন্থ ২০ খণ্ডে সমাপ্ত। এতেই আকারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আলকিফতি, ইবনে সিনার পুস্তকের যে তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন তাতে ২১ খানা বৃহদাকার এবং ২৪ খানা ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ব্রকেলম্যানের (Brockelman) তালিকা আলকিফতির তালিকার চেয়ে অনেক বড় এবং বিস্তৃত। তাঁর Geschichte der Arabischen Literateur (vol. i, Pp. 452—458) এর তালিকাতে ধর্মতত্ব ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ৬৮ খানা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে ১১ খানা, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ১৬ খানা, এবং ৪ খানা কবিতা পুস্তক, মোট ৯৯ খানা পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। তবুও ব্রকেলম্যানের মতে এই তালিকায় সেই সময়ে যে গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল শুধু সেইগুলিরই নাম দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থগুলির প্রায় সবগুলিই আরবীতে লিখিত। বৃহদাকার গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দানিশ নামাই আলা" এবং ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থগুলির মধ্যে "নাড়ীর গতি সম্বন্ধে" এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা শুধু ফারসীতে লিখিত। অন্যান্য মুসলিম সাধকদের মতই ইবনে সিনার যতগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার সবগুলিই ইউরোপীয় জ্ঞান-পিপাসুগণ কর্তৃক ইউরোপের নানা ভাষায় অনুদিত হয়েছে অবশ্য লাটিনই তার মধ্যে নিয়েছে সিংহভাগ। নিম্নে তাঁর বইগুলির নাম দেওয়া গেল ঃ—

১। আল কানুন—চতুর্দশভাগে বিভক্ত। চিকিৎসাতত্ব, উদ্ভিদ বিদ্যা, অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২। আস্‌সেফা—আঠার খণ্ডে সমাপ্ত। এক খণ্ডে চিকিৎসাতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে অন্যান্য খণ্ডে অন্য নানা বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। ৩। আলফিয়া ফিত্‌ তিব—চিকিৎসাতত্ব সম্বন্ধে এক হাজার কবিতা (৪) মানজুমাতুন ফিত্‌ তিব—চিকিৎসার কবিতা (৫) আলএশারাত—তুসী এবং ফখরুদ্দিন কর্তৃক এই গ্রন্থখানির দুইখানি ভাষ্য লিখিত হয়। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে এর চারখানি ভাষ্য বিদ্যমান রয়েছে—তন্মধ্যে তিনখানি আরবী এবং একখানি পারসীতে। আরবী তিনখানি ফখরুদ্দিন মহম্মদ দিয়াউদ্দিন ওমর আররাজী, কুতুবদ্দিন আররাজী, এবং অন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির রচিত। কুতুব-উদ্দিন রাজীর গ্রন্থখানির নাম হোল কিতাবুল মুহকামাত, অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তির গ্রন্থখানার নাম হোল আলমাবাহিতুল তারিয়া। পারসী ভাষ্যখানা নাসির উদ্দিন তুসী কর্তৃক লিখিত (৬) আন্‌ নাজারাত—ছয় খণ্ডে সমাপ্ত (৭) আল কাসিদাতুল আয়না ফি নাফস্‌—আত্মা সম্বন্ধে একটি বৃহৎ কবিতা (৮) কিতাবুল মাবদা ওয়াল মায়াদ—সৃষ্টি এবং পুন সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পুস্তক (৯) আল এলাহিয়াত (আল্লা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ) (১০) আজ্‌জামান আল এলাহিয়াত (১১) কিতাবুল ইশারাহ (১২) কিতাবো সার কায়য়েন (১৩) রিসাদাতুল অরূহ (১৪) আলমজমু (১৫) হাছেল ওয়া মহছুল ২০ খণ্ড (১৬) আলবিররু ও আল এছম ২ খণ্ড (১৭)

আল ইনছাফ (১৮) আল এরছাতুলকুল্লিয়া (১৯) আন্নাজাত —৩ খণ্ড (২০) আল হেদায়েত (২১) আলমুখতাছারুল আওছাত (২২) দানেশ নামাই আল ওলাই (২৩) আলকুলনজ (২৪) লেসানুল আরব (২৫) জাওাতুল জেহাত (২৬) কিতাবুল মায়াদ (২৭) কিতাবুল মাবদাহ্ ও আলমায়াদ (২৮) কিতাবুল মবাহেছাত (২৯) রিসালায়ে কাজা ও আলকদর (৩০) আলাতুর্‌রশিদিয়া (৩১) গরজে কাতিগো রিয়াস (৩২) কাছায়েদে মনতেক (৩৩) রিসালাতুল ফিল এজমাতে ও আল হেকমা (৩৪) রিসালাতুল ফিল হরুফ (৩৫) ফি তায়াক্কুবিল মাওয়াজিল জাদালিয়া (৩৬) মখতেছর উকলিদাস্ (৩৭) মখতেছর দর বয়ানে নবজ ব জবানে ফারসী (৩৮) আল আজরাম ওয়াস সামাবিয়াহ (৩৯) আল এশারাত উলা এলমুল মনতেক (৪০) আকসামুল হেকমত (৪১) আকসামুল হেকমত ফি নেহায়েত ওয়াল্ লা নেহায়েত (৪২) ওছিয়ত নামা ইয়া আহদ (৪৩) হাই বেন ইয়াক জান (৪৪) খতবুল কালাম (৪৫) রেসায়েলে এখওয়ানিয়া ওয়া সোলতানিয়া (৪৬) হাশিয়ায়ে কানুন (৪৭) কেতাবু ওয়ুনিন হেকমত (৪৮) কেতাবু শবকাতে ওয়াত্ তায়েব (৪৯) রেসালা কাজাহ ওয়া কদর (৫০) মাকালা দর হাইয়াতে আরদ (৫১) কিতাবুল মিলহ (৫২) রিসালাতুল এশক্ (৫৩) মাকালা ফল এরিথমেটিক, (৫৪) আরজুজা ফিত্ তিব, বিচার সম্বন্ধে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তক, জড় পদার্থ এবং বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে কুড়িটি প্রবন্ধ, এরিষ্টটলের আত্মা সম্বন্ধীয় পুস্তকের একখানি ভাষ্য, পদার্থের

সংজ্ঞা, দর্শনের বিভাগ এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থ, প্রাচ্য দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ, শরীরের অবস্থা বর্ণনা করে কতকগুলি পুস্তক, দুইজনের জ্ঞান ও বিদ্যা যে পৃথক সে বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক, সৈন্যদের তদবির এবং খাজনা আদায় করবার পদ্ধতি বিষয়ক কতকগুলি পুস্তক।

মহামতি আবদুল কাদির জিলানীর জন্মভূমি হিসাবে, জিলান সহর (কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত) সমগ্র মুসলিম জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেও, বিজ্ঞানের মত ধর্মের সংশ্রবহীন জিনিস বোধ হয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত একে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করতে পারে নাই। অন্তত তেমন কোন বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি বা বাসস্থান হিসাবে এ কোন গৌরব দাবী করতে পারে বলে জানা যায় না। বিজ্ঞানের দিক থেকে এর এ নীরবতা ভঙ্গ করেন কুশায়ার ইবনে লাব্বান ইবনে বাশারী আল জিলি। জিলি অবশ্য জিলান সহরের অধিবাসী হিসাবেই। তাঁর জীবন ইতিহাস বিশেষ কিছুই জানা যায় না। খুব সম্ভব তিনি ৯৭১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কার্যাবলী থেকে মনে হয় প্রথম জীবনে তিনি বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই হয়ত তখন এদিকে তাঁর খেয়ালও হয় নাই। স্থান মাহাত্ম্যই বোধ হয় প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের প্রতি এই ঔদাস্যের কারণ। কৃষ্টি হিসাবে ধর্মের প্রভাবই এখানে বেশী ভাবে গড়ে

কুশায়ার ইবনে লাব্বান

উঠে ফলে কৃষ্টির অন্যান্য শাখার প্রভাবও সেই অনুসারে অনেকটা কম হয়ে পড়ে। তাই কুশায়ারকে বিজ্ঞান খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবান্বিত না করার মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

কুশায়ার ইবনে লাব্বান কৃষ্টির অন্য কোন বিষয় বা বিজ্ঞানের অন্য কোন শাখায় কিছু করেছিলেন কিনা জানা যায় না তবে গণিতের মধ্যে ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তার আনুসঙ্গিক জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এর মধ্যে ত্রিকোনমিতিতেই তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁদের সাধনায় শাখা প্রশাখা ছাড়িয়ে ত্রিকোণমিতি স্পষ্ট বিজ্ঞান রূপ লাভ করে কুশায়ার তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত। তবে তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে আবুল ওয়াফার প্রভাবই বেশী করে ফুটে উঠেছে। তিনি আবুল ওয়াফার ধারা অনুসরণ করেই প্রায় সমস্ত গণনা কার্যাদি সম্পন্ন করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Tangent theorem এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবুল ওয়াফার প্রবর্তিত Theorem এর উপর ভিত্তি করে কুশায়ার এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। তাঁর প্রস্তুত টেবলের মধ্যে এ আলোচনাই অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবে আবুল ওয়াফার হস্তে ত্রিকোণমিতির যে উন্নতির আরম্ভ হয় কুশায়ারের হস্তে সে আরও ত্বরান্বিত হয়ে উঠে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজের মধ্যে পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলি বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশ করে একটি টেবল তৈরী করাই তাঁর সর্বপ্রধান কীর্তি। এই টেবলটির নাম হোল "আজজিজ আজজামি ওয়াল বালিগ।"

কুশায়ার নিজে পারস্যবাসী এবং তাঁর মাতৃভাষা পারসী হোলেও তৎকালীন সুধী সমাজকে অনুসরণ করে তিনিও তাঁর কার্যাবলী আরবীতেই লিপিবদ্ধ করেন। এই টেবলটিও আরবীতে লিপিবদ্ধ হয়। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এবং লিপিকুশলতার অভিনবত্বে এ যে সমসাময়িক অন্যান্য টেবলগুলি থেকে বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রবর্তনের কিছু দিনের মধ্যেই পারসীতে এর অনুবাদ। আরবী থেকে পারসী অনুবাদে মনে হয় শুধু বৈজ্ঞানিক সমাজ নয় এমনি সুধী সমাজও এর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হন। এই টেবলের কিয়দংশ Ideler তাঁর Tab der Mathematischen und technischen chronologie তে জার্মান অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। জ্যোতিষবিদ্যা এবং অঙ্ক সম্বন্ধেও কুশায়ার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অঙ্কের গ্রন্থখানি হিব্রুতে অনুদিত হয়। এই অনুবাদখানি এখনও বর্তমান রয়েছে।

১০২৯ খৃঃ অব্দে কুশায়ার পরলোক গমন করেন।

আলবেরুনী, ইবনে সিনার মত বিশেষ পরিচিত না হোলেও এই সময়ে গণিত বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হিসাবে ইবনোল হোসায়নের নাম করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর কার্য্যকলাপ বেশ উচ্চ স্তরের হোলেও তিনি যে তৎকালীন সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারেন নাই তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর অখ্যাত অজ্ঞাত পরিচয়ের মধ্যেই। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ বা স্থানের বিশেষ কিছুই খবর পাওয়া

যায় না। তবে তাঁর কার্যাবলী থেকে জানা যায় যে তিনি আলখুজান্দীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনোল হোসায়েন।

গণিত শাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতিই তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর সমস্ত প্রতিভাই জ্যামিতি আলোচনায় নিবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয়। তিনি Rational right angled triangle সম্বন্ধে সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানি এখনও এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। আরবেরা যাকে "আল হান্দাসা আছ্ ছাবেত" বা স্থির জ্যামিতি বলে প্রচার করেন, তিনি তাঁর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। দুইটি রেখার মধ্যেকার দুইটি মধ্যম অনুপাত (mean proportional) জ্যামিতিক উপায়ে স্থির করবার জন্যেই তিনি আলহান্দাসা আছ ছাবেতের ব্যবহার সুরু করেন। তাঁর এই উপায়টির বর্তমান সংজ্ঞা হোল Kinematic method। এ সম্বন্ধেও তিনি একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থখানি উপেক (Woepke) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানি কারা দ্য ভো (Carra de vaux) কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

ইবনোল হোসায়েন

জ্যামিতি ছাড়া অন্য যে বিষয়ে তিনি মনোযোগ দেন সে হোল বীজগণিত। বীজগণিতের দ্বিমাত্রিক সমীকরণের সমাধানে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করেও নিজের মৌলিকত্ব দেখাতে সক্ষম হন। নির্দিষ্ট সংখ্যার বিভিন্ন প্রকারের অঙ্ক এবং

অনির্দিষ্ট সংখ্যা দুইটি বর্গ হোলে যে দ্বিমাত্রা সমীকরণের উদ্ভব হয় তারই সমাধানে তাঁর মৌলিকত্ব ফুটে উঠে। বর্তমান অঙ্কের লিখন প্রণালী অনুসারে একে লেখা যাবে $x^2+a=y^2$

ধর্মের পুরোপুরি অনুসরণ করেও যে বিজ্ঞানের চর্চা করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না ইসলাম প্রবর্তনের পর থেকেই তার বহু উদাহরণ নানা মুসলীম সুধীদের জীবনে পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতেও এমন আদর্শের অভাব নাই। ধর্মের সংজ্ঞাকে বিশেষ রূপ দেবার চেষ্টা করেই যিনি বিজ্ঞানের চর্চাতে অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং সেই অনুরাগ শুদ্ধ নীরস বিজ্ঞান পাঠের মধ্যেই নিঃশেষ না করে মৌলিক গবেষণাতে পর্যবসিত করেন, তাঁর নাম হোল আবু মনসুর আবদুল কাহির ইবনে তাহির ইবনে মোহাম্মদ আলবাগদাদী।

ইবনে তাহির

উত্তর কালে ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি হিসাবে বিখ্যাত হয়ে রইলেও নিশাপুর ওমর খৈয়ামের বহু পূর্ব থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আসছিল। নবম শতাব্দীতে আল আরজানি যে বিদ্যোৎসাহিতার সূত্রপাত করেন একাদশ শতাব্দীতে তার জের টেনে চলেন ইবনে তাহির।

তাঁর সর্ব প্রধান কাজ ছিল মুসলিম দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়ন। বিভিন্ন হাদিসবেত্তাদের মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যুক্তিপূর্ণ একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানির নাম হোল কিতাবুল ফারক্ বায়নোল ফারাক। এমনিতে তিনি ছিলেন শাফী মতাবলম্বী। হাদিস নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন

করতেই মুসলিম উত্তরাধিকার সূত্র অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে তাঁকে বিশেষ ভাবেই আলোচনা করতে হয় সেই জন্যেই তিনি উত্তরাধিকারত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ বলে পরিচিত হন। হয়ত এই দক্ষতাই তাঁকে গণিত আলোচনায়ও অনুপ্রাণিত করে। তিনি গণিত সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে "আত্‌তাকমিল" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়।

একাদশ শতাব্দীর মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ সুখের নয়। যুদ্ধ বিগ্রহ, বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ, রাজদরবারের অমাত্যদের কুচক্র, খামখেয়ালী নরপতির নানা অদ্ভুত আইন কানুন এই শতাব্দীর ইতিহাস ভরপুর করে রেখেছে। ফাতেমীয় বংশীয় খলিফাগণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে বংশের নাম জারী রেখেছেন বটে তাঁদের অনেকেই নাম মাত্র খলিফাতে পরিণত হয়ে পড়েন। মন্ত্রী ও দরবারী অমাত্যদের কার্যকলাপের বাইরে খলিফাদের কোন চিহ্নই চোখে পড়বার মত নয়। খলিফাদের জীবন ইতিহাসও বেশ বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। এই বৈচিত্র বেশী করে দেখা দিয়েছে খলিফা মুসতানসর বিল্লাহ এবং খলিফা আলহাকিমের জীবনে।

রাজত্বের দিক থেকে খলিফা মুসতানসর বিল্লাহর রাজত্বকাল সব চেয়ে সুদীর্ঘ (১০৩৬—১০৯৪)। বোধ হয় অন্য কোন মুসলিম নরপতির ভাগ্যে এত দিন রাজত্ব করবার সুযোগ ঘটে নাই। এই রাজত্বকালের দৈর্ঘে তিনি যেমন অন্য সবাইকে টেক্কা

দিয়েছেন সুখ দুঃখের চরম মাত্রার বিচিত্র সমাবেশেও তেমনি তাঁর জীবন ইতিহাস অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পান নি। এক সময় তিনি এমন দুরবস্থায় পতিত হন যে খাবার দূরের কথা, নামাজের বিছানা ছাড়া অন্য কোন সম্বলও তাঁর আপনার বলবার ছিল না। পরস্পর বিরোধী নানা গুণের সমাবেশের জন্য ঐতিহাসিকদের নিকট খলিফা আলহাকিম এক অভিনব সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছেন। কারুর কারুর মতে তিনি ছিলেন বদ্ধ পাগল। খুশী খেয়ালমত পরস্পর বিরোধী হুকুম দেওয়া তাঁর রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায়—ফলে রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ প্রধূমিত হয়ে উঠে। তা ছাড়া তাঁর নিষ্ঠুরতারও সীমা পরিসীমা ছিল না। সামান্য দোষে মৃত্যু দণ্ড, কারণে অকারণে রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদের প্রাণদণ্ড দেবার পাগলামি তাঁকে অনেক সময়েই পেয়ে বসত। এর সঙ্গে দেখা দেয় ধর্মের প্রতি অতি মাত্রায় অনুরক্তি। এই অতি মাত্রায় অনুরক্তি ও গোঁড়ামির ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে খোদার প্রেরিত পয়গম্বর বলে দাবী করেন এবং এক ধর্মমতও প্রচার করেন। তাঁর এই মতবাদ লেবাননের পার্বত্য জাতি দ্রুজদের মধ্যে এখনও প্রচলিত রয়েছে। ভারত সম্রাট আকবরের পূর্বাভাস মিসরের একাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে আলহাকিম কর্তৃক বোধ হয় সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়। এই পাগলামি নিষ্ঠুরতা ও গোঁড়ামির সঙ্গে দেখা দিয়েছে বিদ্যোৎসাহ, জ্ঞান

র প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং দয়া দাক্ষিণ্য। এক দিকে তিনি যেমন পাগলামি ও নিষ্ঠুরতার জন্য জগতের অন্যতম নিষ্ঠুর নরপতি হিসাবে ইতিহাসে নিন্দিত হয়েছেন অন্যদিকে জ্ঞান বিজ্ঞান কৃষ্টির প্রতি অতি উদারতা, সহানুভূতি ও উৎসাহের জন্য তিনি হয়ে রয়েছেন অতি বরণীয়। তাঁর সময় মিসর ও সিরিয়ায় যত মসজিদ কলেজ ও মানমন্দির স্থাপিত হয়েছে অন্য কোন সময় তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ ; রাজনৈতিক এমনি বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা রয়েছে অপ্রতিহত। দশম শতাব্দীতে খলিফা আল আজিজের উৎসাহে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় যে অনুপ্রেরণা আসে এ শতাব্দীর অস্থিরতা ও বৈচিত্রের মধ্যেও তাতে কিছুমাত্র ঘুণ ধরে নাই বরং আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান কৃষ্টির ইতিহাসে একাদশ শতাব্দীর মিসর সব বিষয়ে অগ্রণী হয়ে রয়েছে তার পর থেকেই তার রেশ মিইয়ে আসে, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাও অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে।

রাজনীতির দিক থেকে খলিফাদের কার্যকলাপ যাই হোক না কেন বিদ্যোৎসাহিতায় বাগদাদ ও স্পেনের নরপতিগণের সঙ্গে টেক্কা দেবার পণ তাঁদের অনেককেই পেয়ে বসে। দেখাদেখি পশ্চিম মিসরের কিউটা, তাঞ্জির, ফেজ, মরক্কোতেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মিসর, স্পেন ও বাগদাদের মধ্যে পূর্বেকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেশ জমে উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি সুস্থ সবল জ্ঞান পিপাসার রেষারেষি বোধ হয় অতীব বিরল। অন্তত

এ যুগের কথা অনুধাবন করলে, এ রেষারেষি অতীব বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। ইউরোপ তখন অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন। পোপের আদেশে ধর্মভীরু খৃষ্টানগণ বিদ্যাশিক্ষা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে বাইবেলের ব্যাখ্যা শুনেই দিন কাটাচ্ছে। অজ্ঞানতা খোদা ভক্তির প্রধান অঙ্গ এই কথাটাই ইউরোপের ঘরে ঘরে প্রচার হচ্ছে, কিন্তু সেই সময়ে সেই ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে তারই সংলগ্ন ও প্রতিবেশী মিসরের চলছে জ্ঞান বিজ্ঞানে রেষারেষি। পৃথিবীর অন্যত্র এমনি দৃশ্যের অবতারনা বোধ হয় খুব কমই হয়েছে। এই রেষারেষির ভাব সব চেয়ে বেশী করে ফুটে উঠে খলিফা আলহাকিমের সময়। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই উৎসাহের মধ্যে বিজ্ঞানও তাঁকে আঁকড়ে ধরে বলা চলে। মসজিদ কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার জন্য মানমন্দির স্থাপন করাও তাঁর অন্যতম কর্তব্যে পরিগণিত হয়। কলেজ ইত্যাদির মধ্যে সব চেয়ে মৌলিক এবং সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল ১০০৫ খৃঃ অব্দে স্থাপিত দারুল এলম বা দারুল হিকমা (Hall of Science)। প্রধানত এবং প্রথমত শিয়া মতবাদ প্রচলনের জন্য এর স্থাপন হোলেও, শেষ পর্যন্ত এর সীমা হয় বহুদূর বিস্তৃত। জ্ঞানবিজ্ঞান কৃষ্টির সমস্ত শাখারই যাতে বিশেষ আলোচনা ও সম্প্রসারণ হতে পারে নরপতি তার ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, কবিতা, সমালোচনা (criticism) আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, শব্দবিজ্ঞান (Lexicology) প্রভৃতি

কৃষ্টির সমস্ত শাখাই এখানে আলোচিত হতে থাকে। সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড প্রাসাদে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। যুগ যুগ ধরে বিদ্যোৎসাহী নরপতিদের আহরিত মূল্যবান গ্রন্থাবলী নরপতির বিশাল প্রাসাদের অসূর্যম্পশ্য স্থান থেকে চ্যুত হয়ে লাইব্রেরীতে স্থান পায়। একদিন যা ছিল সর্ব সাধারণের নাগালের বাইরে এইবার সেগুলি সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে পড়ে। পাঠের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব সাধারণের প্রবেশ ও পাঠের অধিকার নিয়ে সমস্ত দেশের জ্ঞানী ও সুধীর মিলনের স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ভাবের আদান প্রদানের জন্য প্রায়ই কায়রো এবং বহু দূর দূরান্তরের সুধীগণ এখানে সমবেত হতেন খলিফাও মধ্যে মধ্যে সমবেত সুধীগণকে নিজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে এ আলাপ আলোচনায় যোগদান করতেন এবং সুধীগণকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে বিদায় দিতেন। যাঁরা খামখেয়ালী নরপতির কার্যাবলীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভয়ে ভয়ে রাজপ্রাসাদে রাজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে উপস্থিত হতেন,—পাছে নিমন্ত্রণের অছিলায় পৈতৃক প্রাণটা খোয়ায়ে আসতে হয়—তাঁরাও অতীব বিস্ময়াভিভূত হয়ে ফিরে আসতেন যে নরপতি তাঁদের শির না নিয়ে সম্মানের শিরস্ত্রান দিয়ে বিদায় দিলেন।

শুধু বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং সুধীগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনাতেই এই খামখেয়ালী নরপতির বিজ্ঞান অনুরাগ শেষ হয় নাই। তিনি নিজেও সাধারণ বৈজ্ঞানিকের মত বিজ্ঞান

অনুশীলন করেন। তিনি নিজের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের জন্য মোকাত্তমের একটি ঢালু জায়গায় একটি মানমন্দির তৈরী করেন এবং নানা পরীক্ষা কার্য চালান। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের মতই এই সমস্ত স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের কোন পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ্য করবার জন্য তিনি কেরাফাতে অন্য একটি মানমন্দির তৈরী করা সুরু করেন। দুঃখের বিষয় এটি শেষ হয় নাই। শুদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে তিনি কতদূর কি করেছিলেন তার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি এখানে শুধু জ্যোতিষ চর্চা করতেন এবং অন্য কাউকে তাঁর লব্ধ ফলাফল জানতে দেন নাই। ১০২১ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিচিত্র গুণের অধিকারী নরপতির জীবনলীলা শেষ হয়। তাঁর মৃত্যুও রহস্যে আবৃত। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর অভ্যাসমত রাতের বেলায় পাহাড়ের দিকে রওনা হন। সারা রাত মানমন্দিরের ও অন্যান্য কাজ করবার পরে সকালে তিনি তাঁর অনুচর দুইটিকে বিদায় দেন এবং একাকী মরুভূমির দিকে রওয়ানা হন। এর পরে কয়েকদিন তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। পরে দেখা যায় তাঁর গাধাটি পাহাড়ের উপর খোঁড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং এর নিকটেই রয়েছে তাঁর সাতরঙা কোট। কোটের উপরে অনেকগুলি ছোড়ার আঘাত। কোট এবং গাধা পাওয়া গেলেও খলিফার কি তাঁর মৃতদেহের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। চার বৎসর পরে একজন লোক স্বীকার করে

যে সেই খোদা ও ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য খলিফা হাকিমকে হত্যা করেছে। অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করে নাই। দ্রুজদের মতে এখনও তিনি জীবিতই আছেন—তাঁর অন্তর্ধান শুধু আত্মগোপন মাত্র; তিনি নিজের খুশী মত ফিরে আসবেন ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে খলিফা আলহাকিমের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিশেষ কোন ছাপ পড়েছে কিনা জানা না গেলেও তাঁর উৎসাহে মিসরের জ্ঞান রাজ্যে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় সে সত্যিই অপূর্ব। নবম শতাব্দী থেকেই মিসর বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফেরায় কিন্তু তখন শুধু ফুটি ফুটি ভাবটাই ফুটে উঠেছে কাজ বিশেষ কিছুই হয় নাই। দশম শতাব্দীতে আবু কামিলের বিজ্ঞান প্রতিভা সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু অন্য দেশের (অবশ্য বিজ্ঞান আলোচনাকারী) প্রতিযোগিতায় তখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নাই বলা যেতে পারে। একাদশ শতাব্দীতে ইবনে ইউনুস এবং আলহাইছামের বিজ্ঞান প্রতিভায়ই মিসর বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইবনে ইউনুস

ইবনে ইউনুসের পূর্ণ নাম হোল আবুল হাসান আলি ইবনে আবু সাইদ আবদুর রহমান ইবনে আহম্মদ ইবনে ইউনুস আল আলা আস্ সাদাফি আল মিসরী। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখের কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতা সাইদ আবদুর রহমান বিন আহম্মদ কায়রোতে ৩৪৭ হিজরীতে (৯৫৮—

৫৯ খৃঃ অব্দ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাইদ আবদুর রহমান তৎকালে ঐতিহাসিক এবং হাদিসজ্ঞ হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পুত্র কিন্তু পিতার ইতিহাস এবং হাদিসের অনুরাগকে অনুসরণ না করে বিজ্ঞানের দিকেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন।

বিজ্ঞানের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সমস্ত প্রতিভাও এইদিকেই নিয়োজিত হয় বলা চলে। অতি অল্প বয়সেই খগোল শাস্ত্রে পারদর্শী হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেন এবং তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভাও অতি সহজেই সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজকীয় মসনদেও তাঁর নাম উল্লেখ হতে দেরী হয় না। এই সময়ে মিসরের খলিফা ছিলেন, আলআজিজ। বিদ্যোৎসাহী নরপতি বিজ্ঞানের এই নব প্রতিভাকে সম্মান করতে বিলম্ব করলেন না। তিনি প্রধানত মিসরে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য ইবনে ইউনুসকে রাজপদে নিযুক্ত করে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ফলক তৈরী করবার আদেশ দেন। খলিফার আদেশ অনুযায়ী ৯৯০ খৃঃ অব্দে ইবনে ইউনুস এই ফলক প্রস্তুত করা সুরু করেন। কিন্তু মুরব্বীর জীবনকালে তাঁর এ কাজ শেষ হয় নাই। খলিফা আলআজিজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পিতার উৎসাহে আরব্ধ কার্যকে নিজের বিজ্ঞানানুরাগের খাতিরে আরও বেশী উৎসাহ দিতে থাকেন। উভয়ে নরপতির উৎসাহে, বৈজ্ঞানিকের সুদীর্ঘ আঠার বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই ফলক তৈরী সম্পন্ন হয়।

খলিফার মনোরঞ্জনের জন্যই বৈজ্ঞানিক এর নামকরণ করেন "আল্‌জিজ্বোলকবিরুল হাকিমি"। অনেকেই একে জিজ-ই-ইবনে-ইউনুস নামেও অভিহিত করেন। যা হোক এই জিজকে মিসরের বিজ্ঞানের গৌরব গাথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য এবং ইবনে ইউনুসের সমস্ত আবিষ্কার এতে সুবিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিজ্ঞান জগতে বিপুল সাড়া পড়ে যায়, সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ ইবনে ইউনুসের বিজ্ঞানপ্রতিভার অভিনন্দন জানান। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবুল ওয়াফা এই ফলক তৈরীর বহু পূর্বেই, ইবনে ইউনুসের বিজ্ঞান প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলে অভিনন্দন করেন। আবুল ওয়াফার জীবনকালে এই বৃহত্তম কার্যের অংশ মাত্রও সমাপ্ত হয় নাই। তার মত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠতম কার্যের জন্য কিরূপ সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং বৈজ্ঞানিককে কিভাবে সম্মান জানাতেন সে সহজেই অনুমেয়। গ্রন্থখানির আভ্যন্তরীন সৌন্দর্যের বিষয় এইটুকু বললেই চলে যে সেই হস্তলিখনের যুগে যখন শীঘ্র প্রচারিত হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না, তখনও দেড়শত বৎসরের মধ্যেই তিনটি ভাষায় এর অনুবাদ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্যের কবি বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম গ্রন্থখানিকে পারসীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে নাসিরউদ্দিন তুসী তাঁর মঙ্গোলীয় ভাষার বিজ্ঞান পুস্তকে এবং চীনা বৈজ্ঞানিক চো চিউ

কঃ তাঁর বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানের পুস্তকে এর তথ্যাদির হুবহু উল্লেখ করেন। গ্রীসের The Syntax of Chrysococcaতে "জিজোল কবিরের" নানা তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। বলতে গেলে গ্রীক বৈজ্ঞানিক টলেমির এতদিনকার খ্যাতি "জিজোল কবিরের" দীপ্তিতে ম্লান হয়ে পড়ে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এতে গ্রহণ ও গ্রহগুলির সংযোগ বিষয়ে পুরাতন ও নূতন মতবাদ সম্বন্ধে সুবিস্তারিত আলোচনা ও জ্যোতিবৈজ্ঞানিক স্থির পরিমাপ সমূহের সঠিক মূল্য নিরূপণ করার বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিতির সন্ধান পাওয়া যায়। এই জিজ অনুসারে ক্রান্তিবৃত্তের আনতি (Inclination of the Ecliptic) ২৩°৩৫, সূর্যের অপভূর

* This masterpiece of Ibn Yunus soon displaced the work of that ancient Astronomer and Geographer Claudius Ptolemaeus (Ptolemy) who was also a native of Egypt. It was reproduced among the Persians by the Astronomer poet Omar Khayyam (1079); among the Greeks in the Syntax of Chrysococca, among the Mongols by Nasiruddin Tusi, the director of the Astronomical observatory at Maragha in the Zij-al-khani; and among the Chinese in the Astronomy of Co-Cheon-king in 1280 and thus what is attributed to the ancient civilisation of China is only a borrowed light from an Islamic fire, the first kindling whereof arose from a spark emitted from the intellectual furnace of the great Cairo University.

A Great Muslim Astrologer by Haroun M. Leon.

দ্রাঘিমা (Longitude of the Sun's apogee) ৮৬°১০´ স্বীকৃত হয়। বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্যের লম্বন (Solar Parallax) ৩´ না হয়ে ২´ হবে এবং অয়ন চলন (Precession) বৎসরে ৫৬°১৫´ হবে। Trepidation সম্বন্ধে কোন আলোচনার কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

খলিফা আলমামুনের উৎসাহে পৃথিবীর পরিমাপ করবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেই প্রতিষ্ঠানের বহু কার্যাবলীর আলোচনায়ও এর কিছু অংশ ব্যয়িত হয়েছে। এ সমস্ত থেকে স্বতই মনে হয় 'জিজ' তৈরী করতে ইবনে ইউনুসের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কাজ এবং তাঁদের লব্ধ ফলাফলগুলিকে পুনরায় বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে উন্নতি করা। খলিফার আলমুকাত্তম মানমন্দিরকে সবপ্রকারে বিজ্ঞানের কাজে লাগিয়ে নিতে যে বৈজ্ঞানিক পিছপাও হন নি এই ফলকই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইবনে ইউনুসের বিজ্ঞান প্রতিভা পরিস্ফুট হয় এই মানমন্দিরের মারফতই, সে কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ জিজখানি এখনও পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব এর অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। এর কিছু কিছু অংশ Leiden, Oxford, Paris, Escurial, Berlin এবং কায়রোতে পাওয়া গিয়েছে। অন্যতম বৈজ্ঞানিক M. Caussin এর কিছু অংশ প্রকাশ ও অনুবাদ করেন। তাঁর অনুদিত অংশটুকু Notices et extracts des mamuscutis de La Bibliothique

nationale vol. vii এ প্রকাশিত হয়েছে। এ অংশটুকুতে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গ্রহণ, গ্রহগুলির সংযোগ সম্বন্ধে অভিমত এবং গ্রন্থকারের নিজের পরীক্ষায় লব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইতিপূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হোলেও গোলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান (spherical astronomy) সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়েছিল বলে বলা চলে না অন্তত ইবনে ইউনুসের পূর্বে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক লম্ব অভিক্ষেপ (orthogonal Projector) দিয়ে এর সমস্যাগুলিকে সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন এমন কোন নজির পাওয়া যায় না . মধ্যতল (The plane of the horizon) এবং দিগন্তের (horizon) উপরে খগোলের (Celestial sphere) লম্ব অভিক্ষেপ প্রয়োগের দ্বারা তিনি গোলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বেকার অমীমাংসিত বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করেন এতেও তাঁর অভূতপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান নয় ত্রিকোণমিতিতেও ইবনে ইউনুসের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবুল ওয়াফার মত ত্রিকোণমিতিকে অত উন্নত স্তরে উন্নীত করতে না পারলেও এ যে তাঁর হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করে সে নিঃসন্দেহ। বর্তমানে প্রচলিত গণিতের আইন অনুযায়ী Logarithm ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ত্রিকোণমিতির পরিমাপকে নানা উপায়ে নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হত। এক এক বৈজ্ঞানিক এক এক ভাবে এর জন্যে চেষ্টা করেছেন। ইবনে ইউনুসও এদিক দিয়ে কম যান নাই।

তিনি নূতন ভাবে এ সমস্যার সমাধান করেন। Logarithm প্রচলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর আবিষ্কৃত ফরমুলাই প্রচলিত ফরমুলাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল বলা যেতে পারে। তাঁর প্রস্তাবিত ফরমুলাকে বর্তমান নামানুসারে বলা হয় Prosthapherical Formulae. গোলীয় ত্রিকোণমিতিতে এই Prosthapherical Formulae ব্যবহার করার কার্যে তিনিই সর্বপ্রথম। ত্রিকোণমিতির সমস্যাগুলির সমাধানে পূর্বেকার লম্বা লম্বা জটিল ষষ্টিক ভগ্নাংশের (Sexagesimal Fraction) গুণনের স্থানে শুধু যোগ দ্বারাই এই ফরমুলা অনুসারে সমস্ত সমস্যা সমাধান হতে পারে। তাঁর ফরমুলা অনুসারে—

$$\text{Cos}\,\alpha\ \cos\beta = \tfrac{1}{2}\{\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\}$$

এবং $$\text{Sin}\,1^\circ = \tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{8}{9}\,\text{Sin}\left(\tfrac{9}{8}\right)^\circ + \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{16}{15}\,\text{Sin}\left(\tfrac{15}{16}\right)^\circ$$

মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের উপর ইসলামের প্রভাব যে বিশেষ ভাবেই নিপতিত হবে সে স্বতঃসিদ্ধ। ধর্মের দিক দিয়ে যাই হোক না কেন মুসলিম যে কেউ যে ইসলাম এবং মুসলিমের পক্ষে আবশ্যকীয় জিনিসের প্রতি কিছু না কিছু অনুরাগ দেখাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। এই অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় কিবলা বা মক্কা শরীফের কাবাগৃহের সম্বন্ধে আলোচনায়। নামাজ মুসলমানদের অবশ্য পাঠ্য এবং সে নামাজ পাঠ করতে হবে কিবলামুখী হয়ে, তাই প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মক্কার দিক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা

থাকা অত্যন্ত দরকার। মুসলিমগণের এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে বৈজ্ঞানিকগণও অবহেলা করতে পারেন নাই। তাই প্রায় প্রত্যেক জ্যোতির্বিদের জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায় কিবলা সম্বন্ধে আলোচনাও স্থান পেয়েছে। প্রায় প্রত্যেক জিজেই এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। ছোট ছোট নগরে সাধারণত আনুভূমিক সূর্যঘড়িকে (horizontal Sundial) মক্কার দিক ঠিক করে রাখা হত এবং সেই অনুসারে নামাজও পড়া হত কিন্তু কায়রো, দামস্কাস প্রভৃতি বড় বড় নগরীতে সেখানকার বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকদিন সূর্য যখন তার আহ্নিকগতিপথে কেবলাভিমুখী হয় তখন তার উন্নয়ণ (altitude) ঠিক করে নিতেন এবং সেই অনুসারেই ধর্মকার্যাদিও সম্পন্ন হত। যদি স্থানটির দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকত তা হোলে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গণনা না করে সাধারণত গড়ভাবে গণনা (method of approximation) করা হত। আলবাত্তানি আবুল ওয়াফা প্রভৃতি অনেকেই এই গড় প্রথার উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। প্রথাটির সরলত্ব অতি সহজেই চোখে ধরা পড়ে—এখানে বর্ণনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একটি আনুভূমিক বৃত্তের (Horizon circle) উপরে অঙ্কন কার্য করতে হয়। মক্কা এবং স্থানটির মধ্যেকার দ্রাঘিমার পার্থক্য বৃত্তের দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিম অভিমুখে এবং উত্তর দিক থেকেও পশ্চিম অভিমুখে গণনা করা হয় অর্থাৎ SA এবং NB দুইটি সমান চাপ ঠিক করে নেওয়া হয়। A এবং B বিন্দু

দুইটিকে যোগ করা হয়। তেমনিভাবে দুইটি অক্ষরেখার মধ্যেকার পার্থক্যও পশ্চিমদিক থেকে দক্ষিণ অভিমুখে এবং

পূর্বদিক থেকেও দক্ষিণ অভিমুখে গণনা করে নেওয়া হয় এবং আগেকার মতই দুইটি চাপ কেটে নেওয়া হয়। দুইটি বিন্দু C এবং D যোগ করে দিলে AB, CD রেখা দুইটি K বিন্দুতে ছেদ করল। বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে K যোগ করে প্রসারিত করলেই মক্কার দিক পাওয়া যাবে

জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় ভূগোল অনুযায়ী কোন স্থান O থেকে মক্কার দিক, সেইস্থানের OM বৃত্তের O বিন্দুর উপর ট্যানজেন্টের (Tangent) সঙ্গে একই লাইনে অবস্থিত। P এবং P_1কে Pole ধরে নিলে এই POA, P_1 বৃত্তের সঙ্গে OM যে

কোণ (ধরা যাক α) সৃষ্টি করে আরব বৈজ্ঞানিকেরা তার নাম দেন "ইনহিরাফ"। এই ইনহিরাফ দিয়েই উত্তর লাইন থেকে কতটুকু বিচ্যুতি ঘটেছে তা নির্ণীত হয়। আবুল ওয়াফা
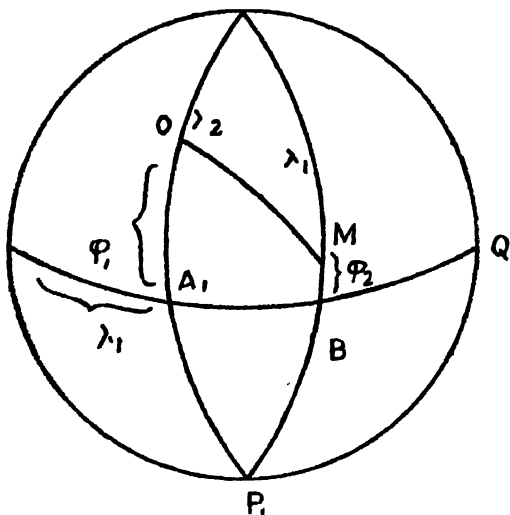
বাগদাদের জন্য "ইনহিরাফ" বের করেন। "আল মাজিস্তিতে" এ সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। তাঁর গণনা অনুসারে বাগদাদের ইনহিরাফ হোল α = ১৩° ৪৯′ ৯″ ১৯‴। আবুল ওয়াফার পদ্ধতি (Rule of Shadow) দশম শতাব্দীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক আলফজল বিন হাতেম আন্‌নাইরেজীর পদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ; কিন্তু গণনা পদ্ধতি এক হোলেও দুই জনের লব্ধ ফলে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। নাইরেজীর গণনা অনুসারে α = ২৯°৭′ এমনিতে AQ যদি বিষুবরেখা

(Equator) হয় এবং φ_1, φ_2, λ_1, λ_2, যথাক্রমে O এবং M দুইটি স্থানের অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা হয়, তা হোলে α কোণ বের করতে হোলে, গোলীয় ত্রিকোণমিতির (spherical trigonometry) সাহায্য লওয়া দরকার। কায়রোর জন্য ইবনে ইউনুস যে গণনা করেন তার বর্তমান অনুশীলন দাঁড়াবে—

$$\varphi_1 = 30^\circ, \quad \varphi_2 = 21^\circ \quad \varphi_1 - \varphi_2 = 9^\circ$$

$$\lambda_1 = 55^\circ \quad \lambda_2 = 67^\circ \quad \lambda_2 - \lambda_1 = 12^\circ$$

$$KG = \text{Sin}\,(\lambda_2 - \lambda_1),\ OG = \text{Sin}\,(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\text{Sin}\,\alpha = \frac{\text{Sin}\,(\lambda_2 - \lambda_1)}{\sqrt{\text{Sin}^2\,(\lambda_2 - \lambda_1) + \text{Sin}^2\,(\varphi_1 - \varphi_2)}}$$

বা $\text{Sin}\,\alpha = \frac{12}{15}$ $\alpha = 53^\circ$

ইবনে ইউনুস শুধু এই গড় পদ্ধতি (approximate method) দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই তিনি তাঁর "জিজ"এ এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গণনা পদ্ধতিও দিয়েছেন। তিনি এমনি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গণনার জন্য তিনটি পন্থার উল্লেখ করেছেন; তিনটিতেই তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রথমটি গোলীয় ত্রিকোণমিতিতে বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়। তাঁর প্রচলিত ফরমুলাটি বর্তমানে প্রচলিত ত্রিকোণমিতিক সংজ্ঞা অনুসারে দাঁড়াবে

$$\text{Cos OM} = \cos\alpha = \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos(\lambda_2 - \lambda_1) \pm \text{Sin}\,\varphi_1\ \text{Sin}\,\varphi_2$$

এবং $\text{Sin}\,\alpha = \dfrac{\text{Sin}\,(\lambda_2 - \lambda_1)\ \text{Cos}\,\varphi_2}{\text{Sin}\,\varphi_1}$

যদি φ_1 এবং φ_2 অক্ষরেখাদ্বয় দুইটি বিভিন্ন মণ্ডলে (Hemisphere) অবস্থিত থাকে তা হোলে Sin φ_1 Sin φ_2 গুণফল হবে নেগেটিভ, সেইজন্যে ফরমুলাতে $\pm$ দুইটির উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান কুশলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির অন্যতম পরিচয় পাওয়া যায় একই সময়ে দুইটি স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য নিরূপনের মধ্যে। আজকাল অবশ্য টেলিগ্রাম ও রেডিও দিয়েই এ কাজটি অতি সহজে সম্পন্ন হয় কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে যখন এই দুইটি বিষয় হয়ত কারও কল্পনায়ও আসে নাই তখনও আরব বৈজ্ঞানিকগণ এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। ব্যাপারটি হয় দুইটি স্থানের দ্রাঘিমা সঠিক ভাবে নিরূপিত হয়েছে কিনা সেই ঠিক করা নিয়ে। সাধারণত দুইটি স্থানের মধ্যেকার সময়ের পার্থক্য স্থান দুইটির দ্রাঘিমার পার্থক্যের সমান। যদি একই সময়ে দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের স্থানীয় সময় নিরূপন করা যায় তা হোলে তাদের দ্রাঘিমার পার্থক্যও অতি সহজেই ধরা পড়ে। বৈজ্ঞানিকগণ টেলিগ্রাম ও রেডিওর অভাব পূরণ করেন চন্দ্রের সাহায্যে। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে চন্দ্র গ্রহণ ঠিক কোন সময় আরম্ভ হয়েছে সেইটি ঠিক করে নিয়ে ঠিক সেই অনুসারে গণনা করলেই দুইটি স্থানের সময়ের পার্থক্যও গণনা করা যাবে। শুধু প্রস্তাব নয় এই অনুসারে তাঁরা কাজও করেন এবং ইবনে ইউনুস এই উপায়েই টলেমির ভূগোলের বহু ভুল সংশোধন করেন। সঠিক গণিতিক ভাবে যাতে কাজটি সম্পন্ন হতে পারে

সেই জন্যে তিনি গ্রহণের সময়কে অতি সূক্ষ্মভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেন এবং সেই অনুসারে গণনার কার্যাদিও চালান। এই পাঁচ ভাগে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর বিজ্ঞান কুশলতা বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের আচরিত পন্থাকে তিনি নিজের উদ্ভাবনীতে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন।

পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষকে একই পর্যায়ে ফেলা হত। তাই প্রায় প্রত্যেক জ্যোতির্বিদই জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইবনে ইউনুসও এদিক দিয়ে কম যান নাই। তাঁর কতকগুলি জ্যোতিষী মত এখন পর্যন্ত আরবদের মধ্যে বেশ প্রচলিত দেখা যায়। অতি সাধারণ একটা হোল তুলা রাশিতে জন্মগ্রহণ বিষয়ক। বৈজ্ঞানিকের মতে "মিজান" (Libra—তুলারাশি) হোল সমতা স্থাপকের চিহ্ন। যে সমস্ত ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করে তারা সাধারণত ধীর, স্থির, সমদর্শী এবং সদ্বিবেচক হয়। সমস্ত কাজে অপক্ষপাত আচরণ এবং প্রত্যেকটি বিষয় ধীর স্থির ভাবে বিবেচনার সঙ্গে কাজ করা তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তারা অমায়িক ব্যবহারের জন্য সবার প্রিয় হতে সক্ষম হয় এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন হয়। এ সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তারা এমনিতে অস্থিরমনা, পোষাক পরিচ্ছদ এবং স্বভাবে বেখেয়ালী ও অন্যমনস্ক ভাবের। উষ্মা বা ধমকানিকে তারা বিশেষ গ্রাহ্য করে না, এমনিতে সদাশয় এবং সদ্বিবেচক হয়। তারা ভাল বিচারক

এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়। তারা প্রগাঢ় প্রেমিক হয় এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা বেশী ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। প্রেমে তারা অন্ধ, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান বিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলে, সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতেও অক্ষম হয় সেই জন্যে তারা নিজেদের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করতে ভুল করে। পৃষ্ঠের বেদনা, বাত, প্রস্রাবের এবং মুত্রগ্রন্থির পীড়াতে ভুগবার আশঙ্কা তাদের খুব বেশী। কাব্য এবং গান তাদের অতি প্রিয়। তোষামোদীতে তারা সন্তুষ্ট এবং মুগ্ধ হয়। এই রাশিতে যে সমস্ত স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করে, হীরকের প্রতি তাদের অসাধারণ আসক্তি হয় কিন্তু মুক্তার প্রতি তাদের তেমন অনুরাগ থাকে না। নীল রং তাদের অতি প্রিয়। এই রাশি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ—এই সময়ে নিয়মের চেয়ে খুব বেশী ঘুমান উচিত। এবং তাজা ফল বিশেষ করে আখরোট খুব বেশী করে খাওয়া দরকার, অন্তত স্ত্রীলোকের পক্ষে। সূর্য যখন এই রাশিতে অবস্থান করে তখন স্ত্রী পুরুষ যে কেউ হোক না কেন যদি পেটের পীড়ায় ভোগে তা হোলে মরিচ দিয়ে ক্যামোমাইল চা (camomile tea)* ফুটিয়ে নিয়ে বা ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে পান করলে তাতেই পীড়ার উপশম হবে।

---

* ক্যামোমাইল (Camomile or Chamomile Anthemis noblis) এক প্রকার বর্ষস্থায়ী গুল্ম। এর পাতা এবং ফুল দুইই তীব্র গন্ধযুক্ত অবশ্য গন্ধটি সুগন্ধ না হোলেও অপ্রীতিকর নয়। ফুল পাতার চেয়ে বেশী তিক্ত এবং গন্ধযুক্ত। পূর্বেকার চিকিৎসকগণ পিত্তাধিক্য

যদি এই রাশিতে রবিয়ল আওয়াল মাস পড়ে এবং সেই মাসের ১০ তারিখে কারও জন্ম হয় তা হোলে সে জীবনে খুব ভাগ্যবান হবে বিশেষত যদি সেই সময়ে শুক্র গ্রহ উদয়ের পথে থাকে।

ইবনে ইউনুসের সিরিয়াস (Sirius and Procyon, the great and little dog stars) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে তিনি সিরিয়াসের উদয় এবং অস্ত (heliacal rising of the Sirius and the time of its declension) সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী বহু মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থেই এই গ্রন্থখানির নানা তথ্যাদির হুবহু উল্লেখ দেখা যায়। দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থখানির তথ্যাদি জ্যোতিষের দিক থেকে বেশ কৌতুহলকর। এখানে একটির উল্লেখ করা গেল—যদি শাবান মাসে সিরিয়াস নক্ষত্র আকাশে দৃষ্ট হয় এবং সেই মাসে কারুর জন্ম হয়, এবং যদি ঠিক জন্ম মুহূর্তে "শিরা আলগুমুস আল কালব" (Procyon, the little dog star) উদয়ের পথে থাকে এবং বিশেষ করে যদি সেই সময়ে এটি ঠিক জন্ম স্থানটির উপরেই দৃষ্ট হয় তা হোলে নবপ্রসূত খুব

জ্বর এবং স্নায়বিক রোগে এর ব্যবস্থা করতেন কিন্তু মিসরীয় চিকিৎসকগণ সর্ব প্রকার জ্বরের জন্যই এর ব্যবস্থা করতেন। বস্তুত ঔষধ হিসাবে মিসরীয়গণের নিকট এর এত সমাদর ছিল যে গ্যালেনের মতে মিসরীয় পুরোহিতগণ একে সূর্য উপসনায় উৎসর্গ করতেন।

ভাগ্যবান হবে। সে স্বাস্থ্যবান দীর্ঘায়ু এবং সুখীও হবে। তার জীবন সুখ শান্তিতে কাটবে, তার ব্যবহারও খুব অমায়িক হবে। তাছাড়া জীবজন্তু তার খুব প্রিয় হবে।

বৈজ্ঞানিকের আচার ব্যবহার জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধে ইবনে খাল্লিকান তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবু ওফিয়াতোল আইয়ান" এ কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা থেকে স্বতই মনে হয় সর্বকালে সর্বদেশে সত্যান্বেষী, জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুরক্ত মন প্রায় একই ভাবাপন্ন হয়ে থাকে। সত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়াও যে বাইরে অন্য একটি দুনিয়া রয়েছে, তার কার্য কলাপ হাব ভাব যে ঠিক বিজ্ঞানের ওজন মাফিক চলে না বরং অন্যভাবেই চলে তাঁদের অনেকেরই সে খেয়াল থাকে না। মুসলিম আর্কিমেডিস ইবনে ইউনুসও সেই দলেরই একজন। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান প্রতিভার পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকদের ইতিবৃত্ত থেকেই ইবনে খাল্লিকান তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বিজ্ঞান প্রতিভার কথা উল্লিখিত হয়েছে অবশ্য জিজকে কেন্দ্র করে। খাল্লিকান জিজের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন "এ একটি বৃহৎ গ্রন্থ। আমি এর চারটি খণ্ড দেখেছি। এতে তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং নিয়মাবলী প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন। এটি করতে গ্রন্থকার যে কি ভীষণ পরিশ্রম করেছিলেন এর প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশুদ্ধতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা সংযুক্ত বহু জ্যোতির্বিজ্ঞান

গ্রন্থ দেখেছি কিন্তু এর মত সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থও আমার নজরে পড়ে নাই। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন যে তিনি মিসরের প্রথম ফাতেমীয় খলিফা মুইজের পুত্র আল আজিজ বিল্লাহর আদেশ অনুসারে এখানি প্রণয়ন করেন। আল আজিজ বিল্লাহই কায়রোর "আল আজহার" বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যাহোক গ্রন্থখানির সমস্ত বিষয়গুলি এমন বিশুদ্ধ যে ইয়াহিয়া ইবনে আবু মনসুরের জিজএর মতই মিসরবাসীরা এটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনার আদর্শ হিসাবে শ্রদ্ধা করেন এবং এটি অনুসারে গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয় ও গণনা করেন।" এই অপূর্ব প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির বেখেয়ালী সম্বন্ধে বহু কাহিনী মিসরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। মিসরের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলমুখতারুলমুসাববিহি কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'ইবনে ইউনুস এক বেখেয়াল অন্যমনস্ক ভাবের লোক ছিলেন, তাঁর কার্যকলাপও অদ্ভুত ছিল। অনেক সময়েই দেখা যেত তিনি তাঁর উঁচু টুপির চারদিক পাগড়ী জড়িয়ে তার উপর তাঁর লম্বা জামা রেখে দিয়েছেন। এমনিতে তিনি ছিলেন খুব লম্বা। এই লম্বা লোকটি যখন তাঁর গাধায় চড়ে পথে বের হতেন তখন লোকেরা তাঁর আজব হাবভাব উস্কু খুস্কু চেহারা ও ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক দেখে হাস্য সংবরণ করতে পারত না বরং তাঁকে নানা উপহাসও করত কিন্তু তাঁর সে দিকে খেয়াল নেই।

তবে চেহারা এমন অদ্ভুত হোলে কি হবে জ্যোতির্বিজ্ঞান গণনায় তিনি ছিলেন অভ্রান্ত, এদিক দিয়ে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষন কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি বৈজ্ঞানিকের সহকারী, জ্যোতির্বিদ আবুল হাসান আত্তাবরাণীর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। আত্তাবরাণী ঐতিহাসিককে বলেছিলেন যে একদিন তিনি ইবনে ইউনুসের সঙ্গে মোকাত্তম পর্বতের মান মন্দিরে শুক্র গ্রহ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করতে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে ইবনে ইউনুস তাঁর আচকান ও পাগড়ী খুলে ফেললেন এবং মেয়েদের মত গাউন ও টুপি পরিধান করলেন। এ দুইটিই লাল রং এর। শুধু এই নয় এর পর তিনি সেতার (কিতার) বাজাতে সুরু করলেন এবং সম্মুখে সুগন্ধ দ্রব্যাদি জ্বালিয়ে দিলেন। বৈজ্ঞানিক সেতার বাজাচ্ছেন আর তাঁর সম্মুখে সুগন্ধ দ্রব্যাদি পুড়ে বেশ একটা সুস্নিগ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে—এ এক বিচিত্র দৃশ্য।

History repeats itself কথাটি বোধ হয় শুধু সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিই প্রযোজ্য নয় মনীষী জীবনীতেও প্রযোজ্য। ইবনে ইউনুস যখন কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন তখন আর কোন চিন্তা তাঁর মনে স্থানই পেত না। এতেই তাঁর বেখেয়ালী ভাব আরও বেশী করে প্রকাশ পেত। হয়ত যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু বিজ্ঞান চিন্তায় লিপ্ত মন সাধারণ আদব কায়দা আইন কানুনের দিকে কোন খেয়ালই করছে না, আশেপাশের অবস্থার দিকে

তাঁর নজরও পড়ছে না। সেই অবস্থায় এমন কাজ করছেন যা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতে করা সম্ভবপর নয়। আর্কিমেডিস যেমন গোসলখানায় গোসল করতে যেয়ে তাঁর সমস্যার সমাধান দেখতে পেয়ে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলে, নগ্ন অবস্থায়ই রাজপথে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ুতে থাকেন, বাইরের লোকে কি ভাবছে না ভাবছে সেদিকে খেয়াল না করেই বিজ্ঞানের সমাধানে মনের আনন্দে মত্ত হয়ে, ইবনে ইউনুসও তেমনি সমস্যার সমাধান মনে পড়তেই নৃপতি অমাত্য মন্ত্রীবর্গ প্রভৃতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই জুতা হাতে বেরিয়ে পড়েন নৃপতির খাস দরবার থেকে। সাধারণ সৌজন্য, আদব কায়দা কোন কিছুর কথাই তাঁর মনে উঠবার অবসর পায় নাই। মধ্যযুগের সামন্ত নৃপতির অহমিকার কথা তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। রাজনীতির দোর্দণ্ড প্রতাপ বর্তমান সময়েই যখন বৈজ্ঞানিকগণকে পিষে মারবার ফন্দি ফিকির করতে কোন সময়েই ত্রুটি দেখাতে রাজী নয় তখন মধ্যযুগের সামন্ত নৃপতির অহমিকা যে এর চেয়ে আরও শত সহস্রগুণে দেখা দিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মনে এসব এতটুকুও দাগ কাটে নাই তিনি বিজ্ঞানের সমস্যার সমাধান দেখেই আনন্দে ভরপুর ; সাধারণ সৌজন্যের খেয়াল আর তখন তাঁর কোথায়। ঘটনাটি ঘটে সুলতান আলহাকিম ইবনে আজিজ বিল্লাহ আলওবেদীর খাস দরবারে। ইবনে ইউনুসও এই খাস দরবারে নিমন্ত্রিত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন তিনি কোন এক বৈজ্ঞানিক গণনায়

লিপ্ত ছিলেন। তাই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে দরবারে হাজির হোলেও, দরবারের সাধারণ কায়দা কানুন মাফিক কাজ করবার মত খেয়ালই তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর ভারী জুতা দরবার গৃহের বাইরে না রেখে হাতে করেই ঘরে ঢুকে পড়েন। দরবারের সকলেই অবাক, সুলতানও অবাক। ঘটনাটির উল্লেখ করে সুলতান নিজেই বলেছেন, "তিনি এসে মাটীতে চুমা খেয়ে বসে পড়লেন। দেখি তাঁর হাতে রয়েছে ভারী জুতা জোড়া। আমি তাঁকে এবং তাঁর জুতা জোড়াকে বেশ ভাল ভাবেই দেখতে পেলুম। তিনি বসে রইলেন চুপচাপ করে কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন "মাওজুদ, মাওজুদ, আল হামদু লিল্লাহ—পেয়েছি, পেয়েছি, সবই আল্লার প্রশংসা"। বাস্ তার পর আর কোন কথা নেই। তখনই উঠে পড়ে মাটী চুমা করে জুতা টেনে নিয়ে চলে গেলেন। সভাসদেরা সাধারণ সৌজন্যের অভাব দেখে ত বিস্ময়ে অবাক। তাঁরা বৈজ্ঞানিকের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করতেও বিরত হোলেন না। সুলতান বৈজ্ঞানিকের খবর জানতেন, তিনি তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বললেন "লা শায়—এ কিছুই নয়। আলি ইবনে ইউনুস আকাশের নক্ষত্ররাজির মধ্যে বিরাজ করছিলেন নিম্নের এই পৃথিবীর ছোটখাট জিনিসের দিকে তাঁর নজর দেবার অবসর কোথায়।"

যা হোক শুধু বিজ্ঞানই নয় অন্যান্য নানা শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সেতারও বাজাতেন। তবে ইবনে খাল্লিকানের মতে এতে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কাব্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের গভীর তত্বানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেন। ওমর খৈয়ামের কাব্যের মত এগুলির তেমন আলোচনা হয় নাই তাই এগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন বিচার করাও চলে না কিন্তু এগুলি যে বিশেষ অবহেলার জিনিস নয় দুই একটিতেই সে কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর একটি কাব্যের অনুবাদ এস্থানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"বাতাস যখন ধীরে বইতে শুরু করে
প্রেমিকের প্রগাঢ় প্রেমবার্তা দিয়ে তখন আমি তাকে পূর্ণ করে দিই
যেন সে প্রেমিকার নিকট তাকে উপস্থিত করে
আমি তার কাছে আমার জীবন কোরবাণী করব
কেননা তারই আশা আমার আত্মাকে উজ্জীবিত করে
তার আগমন সমস্ত জগতকে আমোদিত ও সুবাসিত করে
জীবনের দোহাই যখন সে আমার থেকে চলে গেছে,
আমি আমার মদের পাত্র আর ছুঁই নাই
সে আমার থেকে অনুপস্থিত তাই এও অনুপস্থিত
তার প্রতি আমার প্রেম কোন সময়েই কমে না
আমার নিশীথ রাতের আঁধারে
স্বপনের মধ্যেও তার মূর্তি এসে দেখা দেয়
সকল সজাগ ঈর্ষাকাতর গুপ্তচরের দৃষ্টি এড়িয়ে।"

M. Caussinpere-এর মতে বৈজ্ঞানিকের এ কবিতাও আসলে বিজ্ঞানের কার্যাবলীর কথায়ই ভরপুর। এ প্রেমিক হোলেন তিনি নিজে এবং প্রেমিকা হোল যে গ্রহ বা নক্ষত্র সম্বন্ধে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন অথচ তখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পান নাই।

বৈজ্ঞানিক হিসাবেই যে শুধু তিনি মিসরবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তা নয় এমনিতেও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও মহান চরিত্রের জন্য তিনি সর্বত্র সমাদৃত ছিলেন। তাঁর দৃঢ় চরিত্র ও সত্য নিষ্ঠার প্রতি লোকের এমন অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল যে কাজী মোহাম্মদ বিন আন্‌নোমান তাঁকে ৩৮০ হিজরী জমাদিয়ল আউয়াল মাসে (৯৯০ খৃঃ অঃ জুলাই আগষ্ট) আদল নিযুক্ত করেন। রাজ্যশাসন পরিচালনা ব্যাপারে আদলের পদ কাজী বা প্রধান বিচারকের পদের অব্যবহিত নীচে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সময় থেকেই কোরাণ শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী এই পদের সৃষ্টি হয় (সুরা ২, ২৩২)। এই পদের জন্য শুধু প্রচলিত আইন কানুনে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকলেই চলবে না, তাঁর চরিত্রও হওয়া চাই অতীব মহান সকল প্রকার অসাধুতার অতীত। যাঁর চরিত্রে ঘুন মাত্র সন্দেহের কালিমা স্পর্শ করেছে তিনি অন্য দিক দিয়ে যত বড়ই হোন না কেন, এ পদের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবেন। কাজীর কর্তৃত্ব নিয়ে লোকের দলিল পত্র চুক্তিনামা ইত্যাদিতে রাজকীয় সাক্ষ্যহিসাবে কাজ করাই আদলের কাজ। তাঁরা এই সমস্ত দলিল পত্র

চুক্তি নামা ইত্যাদিতে শীলমোহর দিয়ে দলিল পত্রগুলিকে সরকারী আওতায় স্বীকার করে নেন এবং পরে দুই দলের মধ্যে এ নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হোলে রাজকীয় সাক্ষী হিসাবে কাজ করেন। মৌখিক চুক্তি হোলে আদল নিজেই দলিল প্রস্তুত করে নেন। ইবনে ইউনুস আদল হিসাবে নিযুক্ত হওয়াতেই বোঝা যায় তাঁর চরিত্রের জন্য তিনি কেমন শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

জীবনে সর্বপ্রকার সুখ শান্তি ভোগ করা বোধ হয় কারুর ভাগ্যেই হয়ে উঠে না। ইবনে ইউনুসের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি নিজে যেমন ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত তাঁর একমাত্র পুত্র ছিল তেমনি প্রচণ্ড মূর্খ। ইবনে ইউনুসের পূর্ব পুরুষগণ বিশেষ করে তাঁর পিতা ও পিতামহ পাণ্ডিত্যের জন্য মিসরে সুবিখ্যাত ছিলেন, ইবনে ইউনুস বংশের এই খ্যাতিকে আরও প্রদীপ্ত করে তোলেন কিন্তু তারপরেই প্রগাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দীক্ষার কোন আলোকই স্পর্শ করতে পারে নাই। শুধু শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকেই সে যে বংশের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে ফেলে ছিল তা নয় নির্বোধ কার্যের দ্বারা সে পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত মহামুল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত করেছে। তার পিতার মৃত্যুর পর সে তার পিতা ও পূর্বপুরুষগণের সমস্ত গ্রন্থ ও কার্যাবলী একটি সাবাননির্মাণকারীর কাছে বাজে কাগজ হিসাবে পাউণ্ড দরে বিক্রী করে দেয়। এ সমস্ত কাগজের মধ্যে কি মহামূল্য জ্ঞান সঞ্চিত ছিল তা কে বলবে? Harolen M

Leon এ সমন্ধে যে কবিতাটির উল্লেখ করেছেন সেইটি বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য।

The father ever learning did desire
The son consigned all to the fire.

আল মুসাববিহি, ইবনে ইউনসের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন "তিনি ৩৯৯ হিজরী ৩রা শওয়াল (জুন, ১০০৯ খৃঃ অব্দে) সোমবার সকালে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুরাতন কায়রোর বড় মসজিদে কাজী মালিক ইবনে সাইদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ছাওয়ারের এমামত্বে তাঁর জানাজার নামাজ সম্পন্ন হয় এবং তাঁর নশ্বর দেহ তাঁর নিজ গৃহেই সমাহিত করা হয়।

আলহাইছাম

বিজ্ঞান অনেক সময়েই যে যাদুবিদ্যার এক অংশ না হোক অন্তত সমকক্ষ বলেই পরিগণিত হত তার আভাস পাওয়া যায় যায় মিসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলহাইছামের জীবনীতে। আলহাইছাম ৯৬৫ খৃঃ অব্দে বসরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু আলি আল হাসান ইবনোল হাসান ইবনোল হাইছাম। অন্যান্য মুসলিম নামের মত তাঁর নামও ইউরোপীয়ান ভাষায় বিকৃতভাবে গৃহীত হয়—আলহাইছাম শেষ পর্যন্ত আলহাজেনে পরিণত হয়ে বিজ্ঞান জগতে স্থান লাভ করে। আলহাইছামের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি

যে অল্প বয়সেই বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুদূর মিসরের খলিফা আলহাকিমের দরবারে অতি সহজেই বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিযুক্ত হওয়াতে। খুব সম্ভব আলহাকিম খলিফার পদে প্রতিষ্টিত হবার কিছুদিন পরেই আল হাইছামের বৈজ্ঞানিক খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে মিসরে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল নীলনদের বার্ষিক প্লাবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। দুর্ভাগ্যক্রমে এ নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আলহাইছাম কোন উপায়েই নীলনদের বার্ষিক প্লাবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন নাই। বৈজ্ঞানিক অক্ষমতা কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনার পথকে কণ্টকিত করে তোলে। খলিফা তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধিতে আস্থা হারিয়ে তাঁকে রাজপদ থেকে অপসারিত করেন। রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইছামের খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই রসাতলে যায়। বিজ্ঞান যে যাদুবিদ্যা নয়, ফুমন্ত্র দিয়ে যে এখানে কোন কাজ হয় না জনসাধরেণ সে কথা বুঝতে পারে নাই। খলিফা নিজে বৈজ্ঞানিক হোলেও জনসেবার কাজের জন্য জনসাধারণের চেয়ে বিশেষ উচ্চতর আদর্শ নিতে পারেন নি। সাধারণের দুর্গতি অবমোচন করতে অসমর্থ হয়ে বৈজ্ঞানিকের উপরেই তাঁর নিষ্ফলতার ক্রোধ ফেটে পরে—হাইছামের জীবনও বিপন্ন হয়। জীবনের মায়ায় তিনি উন্মাদের ভান করে সময় কাটাতে থাকেন। খলিফার রুদ্ধ অভিমান তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত আর বৈজ্ঞানিককে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় নি। আলহাকিমের মৃত্যু পর্যন্ত

প্রকাশ্যে আলহাইছাম আর কোন কাজই করতে পারেন নাই। প্রতিভা যার মধ্যে নিহিত রয়েছে তাকে কোন কিছুই দমিয়ে রাখতে পারে না। আলহাইছামও প্রকাশ্যে কিছু না করতে পারলেও তাঁর গোপন বাসস্থানে বসে বসে পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের কার্যাবলী অধ্যয়ন করতেন এবং নিজের জন্য নকল করে রাখতেন। তা ছাড়া তাঁর পূর্বব্যবসায় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও অল্প অল্প চর্চা করতেন। আলহাকিমের মৃত্যুর পর আলহাইছাম পুনরায় প্রকাশ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্য সুরু করেন।

জীবনে এমনি বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আলহাইছাম বিজ্ঞানের চিন্তা জগতে যে বিপ্লব আনয়ন করেন সে শুধু সে যুগেই বিস্ময় সৃষ্টি করে নাই আজও বৈজ্ঞানিকদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তাঁর প্রস্তাবিত সমস্যা ও সমাধান ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণও 'horribly prolix' বলে অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছেন। যা হোক তাঁর কার্য প্রধানত পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। ইবনে আবি ওসাইবার মতে তিনি পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধেই তুশ' গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত শাখা বিশেষ করে optics, spherical এবং parabolic mirrors, spherical abberations এবং Dioptrics বৈজ্ঞানিককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং এ সমস্ত বিষয় নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে "কিতাবুল মানাজির" এবং প্রদোষকাল সম্বন্ধে গ্রন্থ (Treatise on twilight) পদার্থবিদ্যার দিক থেকে বিজ্ঞানজগতকে পূর্বেকার

চিরাচরিত সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে। 'Optics' শাখা নূতন জীবন পায়। গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের অনুসৃত ভ্রমধারণাগুলির প্রতিবাদ করে তিনিই সর্বপ্রথম "optics" শাখাকে বর্তমান বিজ্ঞানের পথে দাঁড় করিয়ে দেন বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের "দৃষ্টি"র কথা ধরা যেতে পারে। গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল, চোখ থেকে আলোক রশ্মি জিনিসের উপর পতিত হোলেই জিনিসটি দৃষ্টির গোচরীভূত হয়। আলহাইছামই প্রথম এর প্রতিবাদ করেন এবং বর্তমান মতবাদ প্রচলন করেন। পদার্থবিদ্যা খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

পদার্থবিদ্যা ছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রও আলহাইছামের দানে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি এ সমস্ত বিষয়েও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সমস্ত গ্রন্থগুলিই বৈজ্ঞানিকের পাণ্ডিত্যের নিদর্শনে ভরপুর। একই ব্যক্তির সর্ববিষয়ে এমনি অভিজ্ঞতা তখনকার দিনে বিরল না হোলেও প্রজ্ঞার দিক দিয়ে অতি বড়দের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে বীজগণিত, গতিবিদ্যা, তরলপদার্থ-বিজ্ঞান (Hydrostatics) ও জ্যামিতিতে তাঁর দান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। আলমাহানীর সমীকরণ বা তৃতীয় মাত্রার সমীকরণ আলমাহানীর উদ্ভাবনের পর থেকেই বৈজ্ঞানিকদের আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আলহাইছামও

এই আলোচনাতে যোগ দিয়েছেন তাঁর বীজগণিত গ্রন্থে। তাঁর সমাধান পন্থা এ বিষয়ে মৌলিকতার দাবী করতে পারে। প্যারাবোলার সমীকরণ $x^2 = ay$ এবং হাইপারবোলার সমীকরণ $y(c-x) = ab$—এই দুই সমীকরণের সাহায্য নিয়ে তিনি তৃতীয় মাত্রা সমীকরণের সমাধান করেন। বীজগণিত নিয়ে তিনি বেশী আলোচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে এই স্বল্প আলোচনার মধ্যেও বীজগণিত শাখায় তাঁর দান যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে সে বোঝা যায় পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থে তাঁর বীজগণিত গ্রন্থ সম্বন্ধে বহু উল্লেখেই। প্রসঙ্গত ওমর খৈয়ামের বীজগণিত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তরল পদার্থবিজ্ঞান (Hydrostatics) সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। ভাসমান বস্তুসমূহের ওজনের সঙ্গে তরল পদার্থের সম্বন্ধ, তরল পদার্থে নিমজ্জিত বস্তু সমূহের পুনরায় ভেসে উঠার গতি ও শক্তির সঙ্গে বস্তুটির ওজন ও তরল পদার্থের ওজনের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আলোচনায় বিজ্ঞান কুশলী মনের পরিচয় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সে সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা বিশেষ চমকপ্রদ। সমুদ্রের উপরিস্থ জাহাজ প্রভৃতি ভাসমান পদার্থের নিমজ্জনের কথাও তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

পদার্থ বিদ্যার উচ্চস্তরের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান। এমন কি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পদার্থ বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র একই সঙ্গে পড়ান হয়।

আলহাইছামের পদার্থ বিদ্যার আলোচনার মধ্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্কশাস্ত্রও এসে দেখা দিয়েছে। প্রধানত optics এর আলোচনার বেলায়ই এই সম্বন্ধটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। বস্তুত Geometrical optics সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থখানি এ বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব প্রথম পুস্তক। তাঁর পূর্বে অন্য কেউই এ বিষয়ে রীতিসঙ্গত ভাবে আলোচনা করেন নাই। এতে একদিকে যেমন হয়েছে optics সম্বন্ধে নানা নূতন ধারণার প্রবর্তন অন্যদিকে তেমনি হয়েছে আলোচনায় উদ্ভূত নানা কঠিন জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান। এ সমস্যাগুলি এই বিংশ শতাব্দীতেও বৈজ্ঞানিকদিগকে মানসিক পীড়া না দিয়ে ছাড়ে না।*

তাঁর একটি সমস্যা হোল কতকগুলি বিশিষ্ট অবস্থায় একটি গোলীয় লেন্সের (Spherical lens) ফোকস (focus) বের করা। সমস্যাটি বিশ্লেষক প্রণালীতে (analytical method) সমাধান করতে গেলে একটি চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত জ্যামিতিক সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে তার একটি আজ পর্যন্তও Alhazen's Problem নামে প্রচলিত রয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিক মহলে কি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ মার্কাস বেকারের

* Here he deals with the Problem which would be difficult to solve even now.—R. Siddique—Islamic Culture, 1941.

(Marcus Baker) ১৮৮১ খৃঃ অব্দে American Journal of Mathmetics (p. 327-331) Alhazen's problem নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে। সমস্যাটি হোল বৃত্তের তলে অবস্থিত দুইটি বিন্দু থেকে পরিধির উপরিস্থ একটি বিন্দুতে এমন কতকগুলি সরল রেখা টানা যে সেই রেখাগুলি সেই বিন্দুতে অঙ্কিত ট্যানজেণ্টের সঙ্গে সমান কোণ উৎপন্ন করে (From two points in the plane of a circle, to draw lines meeting at a point in the circumference and making equal angles with the tangents drawn at that point) আলহাইছাম ছাড়াও হাইগেনসের (Huyghens) সময় থেকে আজপর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম প্রথম বৈজ্ঞানিকেরা জ্যামিতিক সমাধানের চেষ্টা করেন পরে বিশ্লেষক প্রণালীতে এবং আরও অনেক পরে ত্রিকোণমিতিক সমাধানের চেষ্টা করেন। Baker তাঁর প্রবন্ধে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের নাম ও কার্যধারার একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তার কিছু অংশ এখানে উধৃত করা গেল। এ থেকেই বোঝা যাবে সমস্যাটি বৈজ্ঞানিক মহলে কি চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল।

ব্যারো (Issac D. D. Barrow)—১৬৬৯ খৃঃ অব্দ। তিনি সমস্যাটিকে "Horribly prolix" বলে অভিহিত করেছেন এবং opticsএ প্রযুজ্য কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। হাইগেনস (Christian Huyghens) ও স্লুজ

(Francis Rene Sluse)—১৬৭৩ খৃঃ অব্দ—অন্যান্য জ্যামিতিক সমাধানের মত হাইপারবোলা ও বৃত্তের দ্বারা এর সমাধান না করে স্লুজ প্যারাবোলা এবং বৃত্তের সাহায্যে এর সমাধান করেন। L' Hospital (Guillame Francois Antoine De)—১৭২০ খৃঃ অব্দ। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে সমস্যাটির সমাধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। Robins Benjamin—১৭৬১ খৃঃ অব্দ। Kaestner—(Abraham Gotthelf)—১৭।৬ খৃঃ অব্দ—ত্রিকোনমিতিক সমাধান করেন। Wales (Witham)—১৭৮১ খৃঃ অব্দ। লেবোর্ণ (Thomas Leybourn) ১৮১৭ খৃঃ অব্দ। হাটন—(Dr. Charles Hutton)—১৮১৭ খৃঃ অব্দ। সিজ (L. B. Seitz)—১৮৮১ খৃঃ অব্দ। তিনি বীজগণিতের সাহায্যে এর সমাধান চেষ্টা করেন। এতে অষ্টমশক্তির একটি সমীকরণের উদ্ভব হয়। সাধারণ ভাষায় একে বলা যেতে পারে দুইটি বিন্দু ও একটি বৃত্তের মধ্যেকার হ্রস্বতম ও দীর্ঘতম পথ ঠিক করা। বেকারও এর একটি সমাধান দিয়েছেন।

আলহাইছামের বৈজ্ঞানিক কুশলতা কি উচ্চস্তরের ছিল, ওময় খৈয়ামের বর্ণনা থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। বীজগণিতের সমীকরণগুলি যখন ভগ্নাংশে পূর্ণ হয় তখন কি ভাবে এদের সমাধান করা যেতে পারে সেই প্রসঙ্গে ওমরখৈয়াম তাঁর বীজগণিতের একটি পরিচ্ছেদই নিয়োগ করেছেন। এর সমাধান প্রসঙ্গেই আলহাইছামের কথাও স্থান পেয়েছে। "যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন বর্গটি তার বাহুর

'ঘন'র কতক অংশের সমান (what square is equal to several parts of the cube of its side) তা হোলে আমরা যে প্রস্তাবনা দিয়েছি তা দিয়ে এর সমাধান হবে না। কেন না তা হোলে দুইটি প্রদত্ত রেখার মধ্যে আরও চারিটি রেখা বের করতে হবে যেন এই ছয়টি রেখা ক্রমিক সমানুপাতিক (continuous proportion) হয় অর্থাৎ x, y, v, w এমন চারিটি সংখ্যা বের করতে হবে যে $1 : x = x : y = y : v = v : w = w : a$ তা হোলে $x^5 = a$ বা $x^2 = 1/x^3. a.$ আবু আলি ইবনোল হাইছাম (খোদা তাঁর মঙ্গল করুন) এ বিষয় প্রমাণ করেছিলেন। যা হোক তাঁর পন্থাটি বেশ জটিল এবং কঠিন এবং এ গ্রন্থের সঙ্গে তার ব্যবহার হতে পারে না।

কিংবা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে কোন ঘন ক্ষেত্র (cube) তার বাহুর কতক অংশের বর্গের সমান (what cube is equal to certain number of parts of the square of its sides—$x^3 = a. 1/x^2$) তা হোলে পূর্বোক্ত প্রস্তাব গুলির দরকার হবে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত উপায়ে এর সমাধান অসম্ভব। সাধারণভাবে এই সাতটি ক্রমিকের প্রথমটিকে ষষ্ঠটি দ্বারা গুণ করলে সমাধানের বেলায় দুইটি প্রদত্ত সংখ্যার মধ্যেকার চারিটি মধ্যমিকা সংখ্যার দরকার হবে বা $x^3.1/x^2$ সমস্যাটিও আসলে পূর্বোক্ত সমীকরণেই পর্যবসিত হয়। যদি পূর্বের সমীকরণ $x^3 = a. 1/x^2$কে x^3 দিয়ে গুণ করা যায় তা হোলে দাঁড়াবে $x^6 = ax$ বা $x^5 = a.$

প্রথমটিকে ষষ্ঠটি দিয়ে গুণ করার কথা বলে গ্রন্থকার $x^3 . x^2$: মনে করেছেন। প্রস্তাবিত সমীকরণের কার্যধারাকে নিম্নভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—

(1) $x^3 = a. \frac{1}{x^2}$ বা $x^5 = a$. (2) $x^2 = a. \frac{1}{x^3}$ বা $x^5 = a$

বৈজ্ঞানিক আবু আলি ইবনোল হাইছাম (খোদার অনুগ্রহ তাঁর উপর বর্ষিত হোক) এ বিষয়ে বিশেষ ভাবেই প্রমাণ করেছেন।

Optics এর সঙ্গে জ্যামিতির চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠতর বলা যেতে পারে। পদার্থবিদ আলহাইছামের জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলোচনাও তাই সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর পরিধি নিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক চন্দ্র সম্বন্ধেই তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে (১) মাকালা ফি দা আলকামার (২) মাসালা ফি ইখ্‌তিলাফ্‌ মানজারুল কামার এবং (৩) ফি মাইয়া আল আছারাললাজি ফি ওয়াজহুলকামার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় এর কোনখানাই এ পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় নি। Carl Schoy "Abhandlung des Schaichs IBn Ali Al Hasan ibn Al-Hasan ibn al-Haitham" নামে একখানা জার্মান অনুবাদ বের করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে চন্দ্রের লম্বন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। চন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানে লম্বন কি ভাবে পতিত হতে পারে সে সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক অবতারনা, বিজ্ঞানের দিক থেকে

অতীব চিত্তাকর্ষক। তৃতীয় গ্রন্থখানিতে তিনি চন্দ্রের উপরিস্থ কলঙ্কের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন বলে মনে হয়। গ্রন্থের একস্থানে বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এগুলি সম্বন্ধে তাঁর নিজ পর্যবেক্ষণের ফল দিয়েছেন। তাঁর মতে যদি কেউ এগুলিকে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করে তা হোলে দেখতে পাবে যে এগুলো সব সময়েই একই আকারের রয়েছে। তা ছাড়া এদের অবস্থান, পরিমাণ ইত্যাদিরও বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অন্যান্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মত আলহাইছামও কেবলার দিক নির্ণয় করতে পরাঙ্মুখ হন নাই। সরল অঙ্কনের সাহায্যে শুদ্ধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গণনায় কিবলা নির্দেশ করবার পন্থার মধ্যে বোধ হয় তাঁর প্রস্তাবকেই সবার উপরে স্থান দেওয়া যেতে পারে। পন্থাটি এখানে উল্লেখ করা গেল।

একটি কাঠের তলের উপর H কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকা যাক্। পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে AG এবং BD এমন দুইটি ব্যাস টানা যাক্। A থেকে বৃত্তের পরিধির উপর মক্কার অক্ষরেখার সমান করে AC চাপ কেটে নেওয়া যাক্। তেমনি ভাবে অন্য প্রান্তে স্থানের অক্ষরেখার সমান করে GR চাপ কাটা যাক্। সব শেষে দুইটি স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য $\lambda_2 - \lambda_1$-এর সমান করে AN চাপটি কেটে লওয়া যাক্। C থেকে AH এর উপর CT একটি লম্ব অঙ্কিত করা যাক্। H কে কেন্দ্র করে HT ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করা যাক্। এটি HN কে E বিন্দুতে ছেদ করবে। E থেকে AH এর উপর EF একটি লম্ব অঙ্কন করা

যাক্। HR ব্যাসার্ধে CTর সমান করে HK অংশ লওয়া যাক্ এবং K বিন্দুতে HR রেখার উপর KM একটি লম্ব অঙ্কিত করা যাক্। KM যেন FH এর সমান হয়। এইবার M

থেকে BH এর উপর MQ একটি লম্ব অঙ্কন করা যাক্ এবং MQর সমান করে FHর উপর FS অংশ কেটে নেওয়া যাক্। ESF কোণটি স্থানের ইনহিরাফ হবে। অতি সহজেই এই অঙ্কনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। HA ব্যাসার্ধকে ১ (এক) ধরে নিলে ক্রমিক সমীকরণগুলি দাঁড়াবে—

$$HT = \text{Cos}\,\varphi_2\,;\ FH = \text{Cos}\,\varphi_2\ \text{Cos}\,(\lambda_2 - \lambda_1) = KM$$

$$CT = \text{Sin}\,\varphi_2 = HK\,;\ HL = \frac{HK}{\text{Sin}\,\varphi_1} = \frac{\text{Sin}\,\varphi_2}{\text{Sin}\,\varphi_1}$$

$$KL = HK.\ \text{Cot}\ \varphi_1 = \text{Sin}\ \varphi_2\ \text{Cot}\ \varphi_1$$

$$ML = KM - KL = \text{Cos}\ \varphi_2\ \text{Cos}\ (\lambda_2 - \lambda_1) - \text{Sin}\ \varphi_2\ \text{Cot}\ \varphi_1$$

$$EF = \text{Cos}\ \varphi_2\ (\text{Sin}\ \lambda_2 - \lambda_1)$$

HKL এবং LMQ দুইটি সমকোণী ত্রিভূজ থেকে প্রমাণিত হয় যে

$$\frac{MQ}{ML} = \frac{HK}{HL}\ ;\quad MQ = ML. \frac{HK}{HL}$$

$$MQ = [\text{Cos}\ \varphi_2\ \text{Cos}\ (\lambda_2 - \lambda_1) - \text{Sin}\ \varphi_2\ \text{Cot}\ \varphi_1].\ \text{Sih}\ \varphi_1$$

$$= \text{Cos}\ \varphi_2\ \text{Cos}\ (\lambda_2 - \lambda_1)\ \text{Sin}\ \varphi_1 - \text{Sin}\ \varphi_2\ \text{Cos}\ \varphi_1$$

$$\text{Cot}\ \alpha = \frac{FS}{EF} = \frac{MQ}{EF}$$

$$= \frac{\text{Cos}\ \varphi_2\ \text{Cos}\ (\lambda_2 - \lambda_1)\ \text{Sin}\ \varphi_1 - \text{Sin}\ \varphi_2\ \text{Cos}\ \varphi_1}{\text{Cos}\ \varphi_2\ \text{Sin}\ (\lambda_2 - \lambda_1)}$$

$$= \frac{\text{Sin}\ \varphi_1\ \text{Cos}\ (\lambda_2 - \lambda_1) - \text{Cos}\ \varphi_1\ \tan\ \varphi_2}{\text{Sin}\ (\lambda_2 - \lambda_1)}$$

এ ফরমুলাটি হোল গোলীয় ত্রিকোণমিতির অতি পরিচিত কোট্যানজেণ্টের সমীকরণ এবং এ থেকে অতি সহজেই α কোণ বের করা যেতে পারে। গ্রন্থকার অবশ্য কোন সংখ্যা দিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই।

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারক হিসাবেই নিউটন জগৎবরেণ্য হয়ে রয়েছেন। মাধ্যাকর্ষণের কথা বলতেই নিউটনের কথাই মনে হয়। যুগ যুগ প্রচারের ফলে, নিউটন ছাড়া এ সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে অন্য কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন বা ভেবেছিলেন মনে করতেও বাধে। কোন বৈজ্ঞানিক থিওরী একদিনে একের কথাতেই খাড়া হয়ে উঠে নাই। অনেকের চিন্তাধারা একত্রিত হয়েই থিওরী আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়; তার পরে একজনের হাতে সে সংস্কৃত হয়ে সত্যিকার রূপ পায়। মাধ্যাকর্ষণের বেলায়ও সেই কথাই খাটে।

মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারের সঙ্গে নিউটনের নাম বিজড়িত কিন্তু পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী থেকে মনে হয় নিউটনের বহু পূর্বে থেকেই মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি বৈজ্ঞানিক মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক মওলানা রুমী তাঁর কাব্যের মধ্যেই বস্তুগুলির পরস্পর আকর্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবেই আলোচনা করেছেন। কবির কাব্যে বিজ্ঞানের এই দুরূহ সমস্যার আলোচনা দেখে স্বতই মনে হয় তখন বিষয়টি বৈজ্ঞানিক মহল ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি স্থির হয়েছিল বলে বলা চলে না। যাই হোক মাধ্যাকর্ষণের বৈজ্ঞানিক অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায় আলহাইছামের গতিবিদ্যার (Dynamics) গ্রন্থে। পতনোন্মুখ বস্তু সমূহের গতি বেগ, সময় ও বিচ্যুতির স্থানের মধ্যে সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি

গ্রন্থখানিতে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া পতনোন্মুখ বস্তুর গতি বেগ সম্বন্ধে এমনি আলোচনা কল্পনা করা যায় না। তাঁর আলোচনা দেখে মনে হয় মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

আলহাইছামের গ্রন্থাবলীতে এই আকর্ষণের প্রমাণ প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে দূরত্ব অনুসারে এর শক্তি নির্ধারিত হয় এবং দূরত্ব ও শক্তি বিপরীত সমানুপাতিক অর্থাৎ দূরত্ব যে অনুসারে বৃদ্ধি পায় শক্তি সেই অনুসারে হ্রাস পায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক গণনা অনুসারে অবশ্য এ ঠিক নয় বরং এই শক্তি দূরত্বের বর্গের বিপরীত আনুপাতিক। নিউটনই সর্বপ্রথম এই সঠিক বার্তার খবর দেন।* আলহাইছামের গণনায় একটি ভুলের জন্য সে সময়কার জগৎ নূতন আবিষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়. নিউটনের সংশোধনেই সে নূতন আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। আকর্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধেও আলহাইছাম সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নাই বলে মনে হয়। তিনি একে তদানীন্তন

* He recognises gravity as a force ; asserts that it diminishes with the distance ; but falls into the mistake that the diminution is as the distance and not as its square. He considers gravity as terrestrial and and fails to perceive that it is universal that was reserved for Newton. (A History of the intellectual development of Europe, Draper, Vol. II, Page 47).

দর্শন অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করতেন ; এর বিশ্বব্যাপী রূপের কথা তিনি হয়ত ভাবেন নাই। অবশ্য নিউটনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ ভুল মতের সংশোধনও হয় নাই। নিউটনই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে এই আকর্ষণ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।

আলহাইছামের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জ্ঞান অবশ্য তাঁর ভারকেন্দ্র (centre of gravity) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থেকেই উদ্ভূত। এই ভারকেন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ভারকেন্দ্র ও লম্বকেন্দ্রের (centre of suspension) সম্বন্ধ নিয়ে নিক্তি ও লৌহ নির্মিত তুলা দণ্ডের স্থিরমান ও দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পতনশীল পদার্থের দূরত্ব (distance), বেগ (velocity) ও সময়ের পারস্পারিক সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর নির্ভুল জ্ঞান ও কৈশিকার্ষণ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা সে যুগের বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

তেব্রিজের রুশ কনসাল জেনারল এম, খানিকফ The Book of the balance of wisdom (জ্ঞানের নিক্তি) নামে একখানা গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এর বিষয় বস্তু আলোচনা ইত্যাদি থেকে মনে হয় এখানাও আলহাইছামের প্রণীত। এতে বলবিজ্ঞান (mechanics) সম্বন্ধে নানা আলোচনা রয়েছে। এ আলোচনাগুলি শুধু সেকালের নয় একালেরও বিস্ময়। এতে বায়ুমণ্ডলের ভার ও বর্ধমান ঘনতার

সম্বন্ধ বিশেষভাবেই প্রদর্শিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছেন যে জিনিসের ওজন বায়ুর ঘনতার উপর নির্ভর করে এবং একই জিনিসের পাতলা ও ঘন বায়ুতে বিভিন্ন প্রকারের ওজন হবে। এ থেকে মনে হয় টরিসিলির (Torricelli) বহু পূর্বেই আরব বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের ভারের কথা জানতেন।

এ পর্যন্ত আলহাইছামের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ঃ—

১। ইউক্লিডের সংক্ষিপ্তসার ও ভাষ্য (জ্যামিতি ও অঙ্ক)।

২। ইউক্লিড ও এপোলোনিয়সের গ্রন্থাবলী থেকে জ্যামিতি ও অঙ্ক বিষয়ক আলোচনা সংগ্রহ (Collections of the elements of Geometry and Arithmetic drawn from the treatise of Euclid and Appollonius).

৩। ক্যালকুলাস ও ব্যবহারিক বিধি অনুযায়ী আলমাজেস্তের সংক্ষিপ্তসার ও ভাষ্য।

৪। ইউক্লিডের Element এ বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ক্যালকুলাসের উপাদান সংগ্রহ (Collections of elements of the calculas deduced from the principles laid down by Euclid in his Elements).

৫। জ্যামিতিক সমস্যা সমূহের সমাধান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

৬। আঙ্কিক সমস্যাসমূহের বীজগণিতিক ও ব্যবহারবিধি, অনুযায়ী সমাধান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

৭। জ্যামিতিক ও আঙ্কিক সমস্যা সমূহের সমাধান বিষয়ক গ্রন্থ।

৮। ইউক্লিডের Element অনুযায়ী সংখ্যামান সম্বন্ধে গ্রন্থ (Treatise on "measure" after the manner of Euclid's Elements).

৯। ব্যবসায়িক বিধির ক্যালকুলাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

১০। Conics Section প্যারাবোলা, হাইপারবোলা, উপবৃত্ত (Ellipse) জ্যামিতিক অঙ্কন প্রয়োগ করে সৌধাদি নির্মাণ ও খননকার্য সুসম্পন্ন করিবার বিধি সম্বন্ধে গ্রন্থ।

১১। এপোলোনিয়াসের কনিকসের সংক্ষিপ্তসার।

১২। ভারতীয় ক্যালকুলাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

১৩। কিবলার দিকনির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থ এবং টেবল।

১৪। ধর্মকার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্যে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান।

১৫। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সংবাদসমূহ প্রচারে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট পত্র।

১৬। জ্যামিতিক উপক্রমণিকা।

১৭। হাইপারবোলা এবং এর দুইটি অসীম পথ (asymptotes) যে একত্রে মিলিত না হয়ে অনির্দিষ্টভাবে

পরস্পরের নিকটবর্তী হয় তারই প্রমাণের বিরোধিতা সম্বন্ধে আলোচনা।

১৮। বাগদাদে গ্রন্থকারের নিকট উত্থাপিত সাতটি প্রশ্নের জওয়াব।

১৯। ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য জ্যামিতির বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ গ্রন্থ।

২০। "Universal Instrument" সম্বন্ধে গ্রন্থ (ব্রানিম ইবনে হানানের গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার)।

২১। পৃথিবীর দুইটি জায়গার ভিতরকার দূরত্বের জ্যামিতিক প্রমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থ।

২২। আঙ্কিক সমস্যা এবং সেগুলির বিশ্লেষণ সম্বন্ধে গ্রন্থ।

২৩। ইউক্লিডের পঞ্চম গ্রন্থ (Book V) সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন।

২৩। আর্কিমেডিসের প্রস্তাবিত ও অপ্রমাণিত সমস্যা, কোণকে ত্রিখণ্ডিত করবার উপায় এবং তার প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা।

২৫। ইউক্লিডের Book I এর কঠিন সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা।

২৬। Stereometre অংশের সন্দেহ সম্বন্ধে আলোচনা (Memoir on the solution of a doubt about the Stereometric portion).

২৭। Book XII সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন সম্পর্কে

আলোচনা (Memoir on the solution of a doubt about Book XII.)

২৯। Theorem of Exhaustion XI. এ উল্লিখিত দুই মানের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা (Memoir on the division of the two magnitudes mentioned in XI (Theorem of Exhaustion.)

২৯। ইউক্লিডের গ্রন্থের সংজ্ঞাগুলির সম্বন্ধে ভাষ্য। Stainschneider এর মতে সংজ্ঞার পরিরতে́ সাধারণ ভাব জ্ঞাপনার্থ অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। Suter এ গ্রন্থখানির নাম করেছেন "Commentary in the postulate of Euclid" অক্সফোর্ড এবং আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এর পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান।

লাইডেন (Leiden) বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য একখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এতে Book V পর্যন্ত ইউক্লিডের ভাষ্য রয়েছে।

৩০। ফি কাইফিয়াত আল আজনান—E. Weidmann কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে জার্মানীতে "Uber die Besch aften heit der shalton নামে অনুদিত।

৩১। ফিল মারোয়া আল মুহরিকা বিদ্ দওয়ায়েব—E. Weidmann কর্তৃক Uber parabolische Holspieget নামে অনুদিত।

৩২। ফি মিনাহাত আলমুজাস্সামুলমুকাদি—H. Suter

কর্তৃক ভাষ্য সহকারে "Uber die Ausmessung des Paraboloids নামে অনুদিত।

৩৩। ফিল মাকাল (uber den art)।

৩৪। ফি মাসালা আদাদিয়া (uber ein Zahlen Problem)।

৩৫। ফি শাকির বানিমুসা (Uber einen Satzder Banu Musa।

৩৬। ফি ওলোল মিসাহা (Uber die elements der Ausmessung.

৩৭। মাকালা ফিদা আলকামার।

৩৮। মাসালা ফি ইখতিলাফ মানজার আল কামার।

৩৯। কি মাইয়া আল আছারাললাজি ফি ওয়াজহুল কামার।

খলিফা আবদুর রহমানের শৌর্যবীর্য এবং আলহাকামের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া স্পেনের মুসলিম রাজনীতিতে স্থিরভাব প্রতিষ্ঠা করলেও আলহাকামের মৃত্যুর পরেই এর মধ্যে চঞ্চলতা এসে দেখা দেয়। হাকামের পুত্র দ্বিতীয় হিশামের অপরিণত বয়স এবং রাজ অন্তঃপুরের মহিলাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এই চঞ্চলতার উদ্বোধন করে বলা যেতে পারে। এই সুযোগে দূরদর্শী মন্ত্রী আলমনসুর স্পেনের মুসলিম রাজনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। খলিফা প্রকারান্তরে রাজশক্তি চ্যুত হয়ে পড়েন।

তবে মন্ত্রী আলমনস্থরের অসামান্য বিচক্ষণতায় রাজনীতিতে কোন বিশৃঙ্খলা দেয় নাই। কিন্তু আলমনস্থরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই এ নগ্নমূর্তিতে প্রকাশ পায়। দলগত প্রভাবের উপর রাজশক্তির স্থিরতা নির্ভর করা সুরু করে। ১০৩১ খৃঃ অব্দে ওমাইয়া বংশের শেষ নৃপতি কারারুদ্ধ এবং বোধ হয় নিহত হন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ওমাইয়া বংশের পতন হয় এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তিও লোপ পায়। এই বিশৃঙ্খলতার ফলে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই স্পেনের বিভিন্ন নগরে ও প্রদেশে ন্যূন্যাধিক বিশটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই দলগত প্রতিযোগিতায় দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়; বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষও প্রধূমিত হয়ে উঠে। প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্যে অনেকে খৃষ্টানদের সাহায্যভিক্ষা করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। খৃষ্টানরাজ আলফানসোও মুসলিম শক্তিকে পঙ্গু করবার এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রচেষ্ট হন। বহিরাগত এই রাজনৈতিক বিপদ সাহারা মরুভূমির আল মোরাবিত নেতার সাহায্যে কেটে গেলেও আভ্যন্তরিন কার্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল বলা চলে না। যা হোক রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ সুখের না হোলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিলোপ এবং প্রদেশে প্রদেশে পরস্পর ঈর্ষাবিজড়িত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নৃপতির অভ্যুদয়ে বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহ একটুও কমে নাই বরং অনেকাংশে বর্ধিত হয়েছে। রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাচর্চার যে

কোন ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়, এ ভাব ইসলামের ইতিহাসে পূর্বাপর সর্বত্রই বিরাজমান, স্পেনের ইতিহাসেও এ সত্যের অপলাপ ঘটে নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই শোণিতপিপাসু ছিলেন সত্য, কিন্তু ভদ্রতায় তাঁরা কারও কম ছিলেন না। প্রায় সবাই বিদ্যা ও বিদ্বানের সমাদর করতেন সবারই দরবার কবি, গায়ক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সুধীমণ্ডলে পরিপূর্ণ থাকত। এ বিষয়ে সোলতানদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতাও চলত। সে হিসাবে রাজ্যবিভাগের ফলে জ্ঞান চর্চার ক্ষতি সাধিত না হয়ে বরং অনেক উন্নতিই হয় বলা চলে।

আরব ঐতিহাসিক সত্যি সত্যিই বলেছেন "When after the breaking of the necklace and the scattering of its pearls the petty kings divided among themselves the patrimony of the Banu Ommeya the cause of Science and literature instead of losing gained considerably by the division."

সোলতানদের মধ্যেও অনেকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে সেভিলের সোলতান মোতামেদ, বাজাজোজের শাসনকর্তা মোজাফফর এবং জারাগোজার (saragosa) নৃপতি মোকতাদের ও তাঁর পুত্র ইউসুফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোলতান মেতামেদ কবি হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। কারুর কারুর মতে তিনি আন্দালুসিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং কবি হিসাবে তাঁর স্থান

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের সমতুল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের কোন নৃপতি এমন কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন বলে জানা যায় না। তাঁর পত্নী বেগম ইতিমাদও একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় মোজাফ্‌ফর খলিফা আলহাকামের উত্তরাধিকারত্বের দাবী করতে পারেন। শাসনকর্তার চেয়ে সুলেখক ও সুপণ্ডিত হিসাবেই তিনি ইতিহাসে বেশী পরিচিত।

সোলতান মোজাফ্‌ফর

খলিফা আলহাকামের মতই তিনি রাজকার্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায়ও মনোনিবেশ করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি আলহাকামকেও ছাড়িয়ে গেছেন বলা যেতে পারে। আলহাকাম কোন গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু মোজাফ্‌ফর পঞ্চাশ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। এত বড় গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষের মত সর্বজ্ঞানের আধার এমনি গ্রন্থ প্রণয়ন করা যে অতি সাধারণ পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভবপর নয় সে অতি সহজেই অনুমেয়। মোজাফ্‌ফরের জ্ঞান ও অধ্যাবসায়ের বিষয় এ থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

যেখানে নৃপতি নিজেই জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় যোগদান করেন সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা যে অতি সহজ ও স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবে সে অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জারাগোজার (saragosa) বেলায়ও সেই কথাই খাটে। মাত্র তিনটি জেলার সমাবেশে গঠিত হোলেও

বিজ্ঞানচর্চার দিক থেকে জারাগোজা বোধ হয় এই সময় স্পেনের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিল। এই সময়ে বনি হুদ বংশীয়েরা এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁদের সবাই বিদ্যোৎসাহিতার জন্য বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে আবার পর পর দুইজন নৃপতি, পিতাপুত্রের বিদ্যোৎসাহিতার সঙ্গে বিজ্ঞান অনুশীলনের অনুরাগও দেখা দিয়েছে। ফলে বিজ্ঞানচর্চায় সোনায় সোহাগা মিশেছে বলা যেতে পারে। এঁদের একজন হোলেন আহম্মদ আলমুকতাদির বিল্লাহ্ ও অন্যজন হোলেন তাঁর পুত্র ইউসুফ আল মোতামিন। আলমুকতাদির এই বিশৃঙ্খলার যুগে প্রায় সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে (১০৪৬—১০৮১) অনেকটা নিশ্চিন্ততার সঙ্গে রাজত্ব করে একদিকে যেমন রেকর্ড স্থাপন করেছেন বলা চলে অন্যদিকে পাণ্ডিত্যের জন্যও তিনি তৎকালীন স্পেনীয় নৃপতিদের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্কটের মতে তিনি দর্শন, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর দরবারের পণ্ডিতগণের চেয়েও অনেক বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন। যা হোক এ সমস্ত বিষয়ে চর্চা করলেও এ গুলিতে তাঁর দান কোন স্তরের কিম্বা আদৌ কোন দান আছে কি না সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁর প্রণীত কোন গ্রন্থ আছে বলেও জানা যায় না। তবে পুত্রের দানে পিতার এই আপাত অক্ষমতা একেবারে ঢাকা পড়েছে।

আল মুকতাদির বিল্লাহ

যে সমস্ত মুসলিম নৃপতি বিজ্ঞানজগতকে নিজেদের দান

সম্ভারে উন্নত করে তুলেছেন ইউসুফ আল মোতামিন তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করে রয়েছেন। বৈজ্ঞানিক নৃপতিদের মধ্যে উলুগবেগের পরেই হয়ত ইউসুফের স্থান। অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইহুদী বৈজ্ঞানিক জোসেফ বিন আকনিনের মত মেনে নিলে, ইউসুফকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া যেতে পারে। যতদূর জানা যায় রাজকার্যের চেয়ে বিজ্ঞানচর্চায়ই তিনি বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। পিতার সুদীর্ঘ নিশ্চিন্ত রাজত্বকাল ও বিদ্যোৎসাহিতার সুযোগকে তিনি বিজ্ঞানচর্চায় লাগিয়ে নেন ফলে রাজকার্যের চেয়ে বিজ্ঞানের দিকেই তিনি বেশী ভাবে আকৃষ্ট হন। ইতিহাসও তাই তাঁকে নৃপতির চেয়ে বৈজ্ঞানিক হিসাবেই বেশী শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। ইউসুফের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। রাজকার্যে তাঁর প্রতিভা কোন স্তরের ছিল সে বিষয়েও বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না। মাত্র চার বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি যে রাজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলেন এমন মনে করবারও কোন কারণ নাই। এ সব দুর্বলতাকে ঢেকে ফেলেছে তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা ও বিজ্ঞানঅনুরাগ। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। নিজে বৈজ্ঞানিক তাই তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

ইউসুফ আল মোতামিন

অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবেই তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে স্থান পেয়েছেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর প্রতিভা কোন স্তরের ছিল

জোসেফের মন্তব্য থেকেই তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। জোসেফের মতে ইউসুফের অঙ্ক গ্রন্থ ইস্তিকমাল, ইউক্লিড আলমাজেষ্ট ও মধ্যগ্রন্থের (Middle Book) সমতুল্য এবং সেগুলির সঙ্গেই এ পঠিত হওয়া উচিত। ইউক্লিড এবং আলমাজেষ্টের মত বিশ্ববিখ্যাত এবং বলতে গেলে বিজ্ঞানের বনিয়াদ গ্রন্থের সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে সে যে নিতান্ত সাধারণ স্তরের গ্রন্থ নয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। জোসেফ ও তাঁর শিক্ষক বিখ্যাত ইহুদী বৈজ্ঞানিক মোজেস বিন মায়মুন গ্রন্থখানির ভাষ্য রচনা করেন। দুঃখের বিষয় মূল গ্রন্থখানির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। নৃপতির লিখিত এবং বিজ্ঞানের এমনি আবশ্যকীয় গ্রন্থের এইরূপ ভাবে বিনষ্ট হওয়া সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। সারটন একে অদ্ভুত বলেই মত প্রকাশ করেছেন।*

একাদশ শতাব্দীর স্পেনের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইবনোস্‌সাফফার, আলজারকালি, ইবনে আবিররিজাল, ইবনোস্ সামাহ, আলকারমানি, ও ইবনে সাইদ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ইবনোস্ সাফফারের পূর্ণ নাম হোল আবুলকাসিম আহম্মদ ইবনে ওমর আলগাফিকি। নাম দেখে মনে হয় বংশ গরিমার

* It is strange that a work believed to be so important and written by a king should be lost—Sarton-Introduction to the History of Science, Vol. I, P. 759.

দিক থেকে আভিজাত্যের দাবী করবার মত সুযোগ বোধ হয় তাঁর ছিল না। আসসাফ্‌ফার অর্থ হোল তাম্রকার। এ থেকে মনে হয় তাঁর পূর্বপুরুষরা ব্যবসায়ে তাম্রকার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বিজ্ঞানচর্চা করেছিলেন বা বিজ্ঞান প্রতিভা দেখিয়েছেন বলেও জানা যায় না। এমনি অখ্যাত অজ্ঞাত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি বিজ্ঞানে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেই তাঁকে এবং তাঁর বংশকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করে রেখেছে। সাফফার ছিলেন কর্ডোভার অধিবাসী। ঐখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও অঙ্কুরিত হয়। তবে শেষ জীবনে তিনি দেনিয়াতে বসবাস স্থাপন করেন এবং সেইখানেই তাঁর জীবনলীলাও শেষ হয়।

ইবনোস্ সাফফার

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই তাঁর দানে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতির সবিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে সেগুলির কার্যাবলী ও ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষিত ফলের সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণের ফল মিশিয়ে একটি তালিকা প্রণয়নকরার সঙ্গেই ইবনোস্ সাফ্‌ফারের নাম বিজড়িত। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের উপর ভারতের প্রভাব এই সময়ে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল অন্তত পশ্চিম স্পেনে তার কোন নিদর্শনই বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। ইবনোস্ সাফ্‌ফার কিন্তু এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তাঁর কাজের মধ্যে ভারতের প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর তালিকা প্রণয়নে সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন। তাঁর আস্তারলব ব্যবহারবিধির

গ্রন্থখানি পরবর্তী কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ প্রভাব স্থাপন করে। প্লেটো (Plato of Tivoli) এখানাকে লাটিনে অনুবাদ করে জোহানেস্ হিসপালেনসিস্‌কে (Joannes Hispalensis) উৎসর্গ করেন। গ্রন্থখানি পরে প্রফেটিয়াস (Prophetius) কর্তৃত হিব্রুতে অনুদিত হয়। ১০৩৫ খৃঃ অব্দে বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

আলজারকালি

ইবনোল জারকালা ও কর্ডোভার অধিবাসী। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু ইসহাক্ ইবরাহিম ইবনে ইয়াহিয়া আন্‌নাক্‌কাস। তবে সাধারণত তিনি ইবনোল জারকালা বা আলজারকালি নামেই অভিহিত হতেন। আলজারকালি শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়ান ভাষাবিদদের কল্যানে আরজাকেলে (Arzachel) পরিণত হয়েছে। আন্‌নাক্‌কাস হোল তাঁর পদবী, এর অর্থ—খোদক। এ তাঁর বংশগত পদবী কি তাঁর নিজস্ব উপাধি সে জানা যায় না। তবে যতদূর জানা যায় তা থেকে মনে হয় এ তাঁর বংশগত পদবী। সে হিসাবে ইবনোস্ সাফ্‌ফারের মত তিনিও কোন অভিজাত বংশের বংশধর নন। সে যাই হোক বংশগত খোদাই কার্যের পারদর্শিতা যে তাঁকে বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিতে নানা অত্যদ্ভুত সংস্কার করতে বিশেষভাবেই সাহায্যে করেছিল যে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ৫২০ হিঃ (১০২৯ খৃঃ অব্দ) কর্ডোভায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই ১০৮৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্পেনের বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রথম দিকে জ্যোতিবিজ্ঞানের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। প্রায় সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রবিদই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন। বাগদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই স্পেনের বিজ্ঞান চর্চা গড়ে উঠে সে হিসাবে এই জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রীতি খুবই স্বাভাবিক। আলজারকালা অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগে বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেও তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের প্রচলিত প্রথার অনুকরণে বিশেষ ব্যতিক্রম করতে পারেন নাই। তাই তাঁর অন্যান্য কাজের চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজই বিশদ ও বিস্তারিত আকার ধারণ করেছে এবং উত্তর কালে তিনি জ্যোতির্বিদ হিসাবেই বিজ্ঞান ইতিহাসে স্থান লাভ করেছেন।

তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজের মধ্যে সূর্যের গতি, সূর্যের অপভূর (apogee) গতি, ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা (obliquity of the ecliptic), Toledean tables, আস্তারলবের উন্নতি সংসাধন প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যের অপভূ (apogee) যে স্থির থাকে না বরং তারও একটা গতি আছে আলজারকালার পূর্বে বিজ্ঞানের ভাষায় এর কোন প্রকাশই হয় নি, তিনিই সর্বপ্রথম একে বিজ্ঞান হিসাবে প্রকাশ করেন। তাঁর গণনা অনুসারে এ গতির পরিমাণ হোল বৎসরে ১২.০৪"। বর্তমানের স্থিরীকৃত পরিমাণ হোল ১১.৮"। একাদশ শতাব্দীর যন্ত্রপাতির সঙ্গে বর্তমানে উন্নত যন্ত্রপাতির তুলনা করলে বিশেষত দূরবীক্ষণের কথা মনে করলে, আলজারকালির এই

গণনা যে কত উচ্চস্তরের সে সহজেই অনুমেয়। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানে পারদর্শিতা ও কর্মকুশলতার এর চেয়ে বেশী কোন প্রমাণেরও হয়ত দরকার হয় না। অপভূর গতির মত ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতাও তাঁর চোখ এড়ায় নাই। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের মত তিনিও এর গণনা করেন। তিনি তাঁর গণনায় যে ফল পান পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গণনার ফলের সঙ্গে তার বেশ অমিল দেখা যায়। এই অমিল যে ক্রান্তিকোণের ক্রম অপস্থয়মানতার জন্যে, অন্য কোন কারণে নয় বৈজ্ঞানিক সেদিকে খেয়াল করেছিলেন কিনা বোঝা যায় না। গ্রন্থাদি থেকে মনে হয় তিনি এর বিজ্ঞানসম্মত কারণ অনুসন্ধান করার চেয়ে, পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গণনার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য করতেই বেশী প্রচেষ্ট হন। ফলে তিনি সাব্যস্ত করেন যে এই তীর্যকতা ২৩°৩৩′ এবং ২৩°৫৩′ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্ববর্তীদের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধায়ই হয়ত তাঁর পর্যবেক্ষণের এই আবিষ্কারকে বৈজ্ঞানিকের মত নূতন পথ ও মত নির্ধারণ করবার উপযোগী বলে মেনে নিতে বাধা জন্মায়। তাই তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের Trepidation of Equinoxes এর ধারণাকেই অনেকটা বদ্ধমূল করে তোলে।

ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের মধ্যযুগের প্রতি অত্যধিক বিতৃষ্ণার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্ত উন্নতি সাধারণত টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) কোপার্নিকাস, কেপলার ও তাঁদের পরবর্তী যুগের অবদান বলেই আজকাল পরিচিত। তাঁদের বহু বৎসর

পূর্বেই যে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ· উন্নতি সাধন করেছিলেন মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্যেই সে সমস্ত এতদিন লুকিয়ে ছিল। সুখের বিষয় বর্তমানে পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় এ অন্ধকার আস্তে আস্তে দূরীভূত হচ্ছে। টলেমির পদ্ধতিতে যে অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়ে গেছে, কোপার্নিকাস ও কেপলারের বহু পূর্বেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ সে বিষয়ে বিশেষ ভাবেই অবহিত হন। তাঁর ভ্রম প্রমাদের সংশোধনের জন্য নানা বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা পূর্বেও বলা হয়েছে আলজারকালাও এদিক দিয়ে কম যান নাই। তিনিই সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে গ্রহগুলি অণ্ডাকার কক্ষে ভ্রমণ করে এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত টলেমির পদ্ধতির ভ্রম সংশোধনের জন্য অণ্ডাকার কক্ষ স্থাপনের প্রয়োজন।

নূতন মত ও পথ দেখলেই রক্ষনশীলেরা যেমন চমকে উঠেন, কিছুতেই সেগুলোকে আমল দিতে চান না বরং যে কোন প্রকারে হোক বাধা দিতে উঠে পড়ে লেগে যান, বিজ্ঞানের পথেও মানব মনের এই রক্ষনশীলতার অভাব হয় নাই। আলজারকালির এই নূতন প্রস্তাবেরও বাধা পেতে দেরী হয় না। তাঁর সমসাময়িক রক্ষনশীল বৈজ্ঞানিকেরা এই নূতনতম প্রস্তাব দেখে চমকে উঠেন। বিজ্ঞানসম্মত গণনা, এই গণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ফলের মিল, কোন কিছুতেই তাঁরা পূর্বের ধারনাকে বদলিয়ে নিতে সক্ষম হন নাই এবং আলজারকালির প্রস্তাবকেও মেনে নিতে রাজী হন নাই। এমন কি অনেকে তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে

'আলোচনা করতেও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। এর কারণ অবশ্য পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অন্ধভক্তি। এঁরা টলেমির আলমাজেষ্টের বিরুদ্ধ বাণীকে বিজ্ঞানের আসন দিতে রাজী হন নি।* যা হোক এই বিরুদ্ধতা আলজারকালিকে দমিয়ে দিতে পারে নাই। শুধু প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হন নাই তিনি একে কাজেও লাগিয়ে নেন এবং সেই ভাবেই পর্যবেক্ষণ কার্য স্থরু করেন। সঠিক গণনা করবার জন্যে তিনি কি পরিশ্রম করতেন তার অন্যতম প্রমান পাওয়া যায় সূর্যের গতি নির্ধারণ করবার বেলায়। তিনি এই জন্যে ৪০২ চারশ দুবার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। এমনি নিরানন্দ কাজে নিজেকে চারশ দুবার নিয়োজিত করবার অধ্যবসায়কে রবার্ট ব্রুসের তুলনায় কোন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে সে সুধীগণের বিবেচ্য। এই অসাধারণ অধ্যবসায়ের জন্যই তাঁর প্রাপ্ত ফল এবং বর্তমান জ্যোতির্বিদদের গৃহীত সংখ্যার পার্থক্য এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে।†

এশিয়ার মুসলিম রাজ্যের অধিবাসী দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ খলিফা ও সুলতানদের সহায়তায় যেমন একত্রিত হবার সুযোগ

---

* He suggested that the planets moved in ellipses but his contemporaries with scientific intolerances declined to argue about a statement which was contrary to that made by Ptolemy in the Almagest [Ball. A Short History of Mathematics, P. 170.]

† Scot, iii, 477.

পেতেন, পশ্চিম ইউরোপের মুসলিম রাজ্যের পণ্ডিতগণও তেমনি সুযোগ পেতেন কিনা জানা যায় না। বিবাদরত সুলতানগণ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ যোগালেও বিভিন্ন রাজ্যের পণ্ডিতগণকে একত্র সমাবেশ করবার জন্য সেরূপ ওৎসুক্যের পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা কিম্বা তাঁদের ওৎসুক্য রাজনৈতিক বিবাদের অন্ধকারে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নাই সে সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে রাজনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদ যে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে নাই আলজারকালার Toledean Tableই তার প্রমাণ। বিজ্ঞানের কাজে শুধু মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণই নন, ইহুদী বৈজ্ঞানিকগণও মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে হাত মিলাতে পরাঙ্মুখ হন নাই। টলেডোর মুসলিম ও ইহুদী বৈজ্ঞানিকগণের পর্যবেক্ষণের প্রাপ্ত পরিমাপের সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ ও গণনাকৃত পরিমাপ (ফল) একত্র করে তিনি এই টেবলটি তৈরী করেন। টেবলটির আভ্যন্তরিক মূল্য কত অধিক পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাবলীতে এর বহু উল্লেখেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলি জিরার্ড (Gerard of Cremona) কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয় এবং সর্বসাধারণেরও মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করে। টেবলগুলি এ পর্যন্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নি। এর সংখ্যাও খুব কম ছিল না বলেই মনে হয়। Steinschneider আটচল্লিশখানা পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গেই জলঘড়ি (clepsydra)

নির্মাণের দিকেও আলজারকালার মন যায়। তিনি টলোডোর রাজকীয় প্রমোদ উদ্যানে দুইটি চৌবাচ্চা নিয়ে একটি জলঘড়ি তৈরী করেন। জলঘড়িটি এমন সুকৌশলে নির্মিত হয় যে চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে চৌবাচ্চার জলও নিয়ন্ত্রিত হত। প্রথম চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চৌবাচ্চায় জল প্রবেশ আরম্ভ করত, এবং চৌদ্দ তারিখে একেবারে জলে পূর্ণ হয়ে যেত। তারপর আবার জল কমতে আরম্ভ করত এবং আটাশ তারিখে বিন্দুমাত্র জলও অবশিষ্ট থাকত না। শুধু এই নয় চৌবাচ্চায় জল ঢেলে দিলে বা কিছু জল বের করে ফেললেও জলের পরিমাণের কোন তারতম্যই দেখা দিত না। যন্ত্রটির কৌশলে আপনা থেকেই অতিরিক্ত জল তৎক্ষণাৎ বের হয়ে যেত বা বের করে দেওয়ার সম পরিমাণ জল ভিতরে চলে আসত। দিন রাতের পরিবর্তনশীল বৈষম্য অনুযায়ী জলের গতিও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হোত। প্রথম দিন সূর্যোদয়ে $\frac{1}{২৪}$ ও সূর্যাস্তে $\frac{1}{14}$ জল আসত। যে যন্ত্র এমন অসাধারণ ফল দেখাতে পারে তার আবিষ্কারে কিরূপ প্রতিভার প্রয়োজন সে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য কাজের সঙ্গে আস্তারলবের উন্নতি সাধন করে তাকে আরও বিজ্ঞান সম্মত করে তোলাই তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলা যেতে পারে। এর পূর্বে যে সমস্ত আস্তারলব ব্যবহৃত হত সেগুলি ছিল স্থান বিশেষেরই উপযোগী। এর উপরকার চিহ্নাদি শুধু স্থান বিশেষের জন্যই

খোদিত হত তাই এক স্থানের যন্ত্র অন্য স্থানে ব্যবহৃত হতে পারত না। সর্বত্র ব্যবহৃত হতে পারে এমন আস্তারলবের জন্য অনেকগুলি টেবলেটের দরকার হত। তা ছাড়া বিষুবের অয়নচলনের (precession of equinoxes) জন্যে এমনি সাধারণ আস্তারলব দিয়ে বেশী দিন কাজও চলত না। আলজারকালির পূর্ব পর্যন্ত এই সমস্ত অসুবিধা নিরসন করে সর্বত্র ব্যবহারোপযোগী কোন যন্ত্রই উদ্ভাবিত হয় নাই, বৈজ্ঞানিকদের অসুবিধাও দূর হয় নাই। আলবেরুনী "উস্তয়ানী" নামে যে আস্তারলবের পরিকল্পনা দেন সে কাগজেকলমে সর্বাঙ্গসুন্দর হোলেও কাজে লাগানর উপযোগী নয়। আলজারকালিই বৈজ্ঞানিকদের এ অসুবিধার হাত থেকে রেহাই দেন বলা যেতে পারে। তিনি পূর্বেকার stereographical polar projection এর স্থানে horizontal projection ব্যবহার করেন। এতে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি থাকে দিগন্তের (horizon) পূর্ব বা পশ্চিমের দিকে অর্থাৎ দুইটি ক্রান্তি বিন্দুর (equinoctial points) যে কোন একটিতে। তাতে Projection এর তলই মকর-বৃত্তের (solistitial colure) তল হয়ে দাড়ায়; দুইটি খ বৃত্তের (celestial sphere) projection ও এক হয়ে যায়, ফলে দুইটির জন্যই একই চিহ্নাদিতেই কাজ চলে। এমনিভাবে যে সম্পূর্ণ আস্তারলবটি তৈরী হয়, বৈজ্ঞানিক তার নাম দেন আব্বাদিয়া। নামটি হয় অবশ্য সেভিলের নৃপতি আলমুতামিদ বিন আব্বাদের নাম অনুসারেই। সমস্ত যন্ত্রটিতে একটি মাত্র

টেবলেট এবং দুইটি সাহায্যকারী অংশ থাকত। Stereographical horizontal projection এর টেবলেটের উপরে, সমান্তরাল এবং আনতি চক্র সমেত বিষুব এবং দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার চক্র এবং ক্রান্তিবৃত্তও দেখান যেত। এতে যে আস্তারলবটি শুধু সর্বস্থানের উপযোগীই হত তা নয়, দুইটি গোলকের projection, ক্রান্তিবৃত্ত এবং বড় বড় নক্ষত্রের co-ordinates র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য আস্তারলবের "জাল" এর কাজও এতে চলে যেত। টেবলেটের কেন্দ্রে স্থাপিত একটি লৌহশলাকা দ্বারা সাধারণ আস্তারলবের অন্যান্য কাজ হত। এটিকে বিষুব রেখার দিকে একটু ঈষৎ বাঁকিয়ে নিলে পর্যবেক্ষণ স্থানটির চক্রবাল পাওয়া যেতে পারত এবং তখন এর উপরকার টেবল থেকে পূর্ব পশ্চিমের বিস্তারও অনায়াসে বের করা যেতে পারত। টেবলেটের পিঠে অবশ্য অন্যান্য আস্তারলবের মতই দাগ কাটা থাকত। এমনিভাবে শুধু একে সর্বত্র ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই একে যাতে অন্যান্য কাজে লাগান যেতে পারে তার ব্যবস্থাও করেন। অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সঙ্গে মিশিয়ে না নিয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই যাতে চন্দ্রের গতিবিধির পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে সেজন্য তিনি যন্ত্রটির সঙ্গে একটি চন্দ্রের বৃত্তও যোগ করে দেন। এতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চন্দ্রের গতিবিধির পর্যবেক্ষণ করা যেত। অন্যদিকে এর সঙ্গে এঁটে দেন ত্রিকোণমিতিক বর্গ। এই বর্গ থেকে অতি সহজেই সোজা এবং

উল্টো ছায়ার (আজলাল মাবসুতা ওয়াল মানকুস) পরিমান বা কোণের ট্যানেজেন্ট এবং কোট্যান্‌জেন্ট বের করা যেত। আরব বৈজ্ঞানিকেরা এই সহজ ও সম্পূর্ণ যন্ত্রের নাম দেন আস সাফিহা আলজারকালিয়া। ইউরোপে এটি Saphaea নামে খ্যাত হয়ে পড়ে।

"সাফিহা শাকাদিয়া" নামে অন্য একটি আস্তারলবও আলজারকালি প্রস্তুত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটির সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ কিছু জানা যায় না।

আস্‌সাফিহার ব্যবহার ও প্রণয়ন বর্ণনা করে তিনি একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এই যন্ত্র ও গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে একটি সাহিত্যই গড়ে উঠে।* মণ্টেপেলিয়ারের এক ইহুদী এখানাকে লাটিনে অনুবাদ করেন। ক্যাষ্টাইলের নৃপতি আলফানসো স্পেনীয় ভাষায় এর দুখানা অনুবাদ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মহান যন্ত্র সম্বন্ধে (the noble instrument of the safiha) উথ্বত সমস্যাগুলিকে সংগ্রহ করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস তার De Revolutionibus orbium coelestium গ্রন্থে আলবাত্তানীর সঙ্গে আলজারকালির গ্রন্থেরও বহু উল্লেখ করেছেন।

---

* He invented an astrolabe, a safiha, on which he wrote a treatise out of which a whole literature was developed.—Legacy of Islam, P. 394.

জ্যোতিষের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বস্তুত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনায়ই হয় জ্যোতিষের আলোচনা প্রসঙ্গে। তাই পূর্বের জ্যোতির্বিদ মাত্রেই জ্যোতিষ নিয়েও আলোচনা করতেন। আলজারকালিও এর ব্যতিক্রম করতে পারেন নাই। তিনিও জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগেও আলাজারকালির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ত্রিকোনিমিতিই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্বে স্পেনের অন্য কোন বৈজ্ঞানিক ত্রিকোণমিতি নিয়ে তেমন আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না। অন্তত মৌলিকতার দিক দিয়ে কারুর উল্লেখযোগ্য দান আছে বলে মনে হয় না। আলজারকালিই স্পেনীয় বৈজ্ঞানিকদের এই শাখার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন বলা যেতে পারে। তাঁর অন্যান্য আলোচনার মধ্যে Sine এবং verse এর তালিকা প্রণয়নেই সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তালিকা প্রণয়নে তিনি নিজস্ব একটি পন্থা প্রবর্তন করেন। সাধারণত গ্রীক এবং আরব বৈজ্ঞানিকগণ ব্যাসার্ধকে সমান ৬০ ভাগে ভাগ করে, সেগুলির প্রত্যেকটিকে আবার সমান ৬০ ভাগে ভাগ করে নিতেন। হিন্দুগণ ব্যাসার্ধকে পরিধির অংশ হিসাবে প্রকাশ করতেন; তাঁদের মত ব্যাসার্ধ হোল পরিধির ২১৬০০ ভাগের ৩৪৩৮ ভাগ। আলজারকালি এর কোনটিই অনুসরণ করেন নাই। তিনি ব্যাসার্ধকে ১৫০´ ধরে

নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রেজিওমণ্টেনাস (Regiomontanus) এই দুইটি sine table তৈরী করতে একটিতে ব্যাসার্ধকে ৬০০,০০০ ভাগে অন্য একটিতে ১০,০০০০০০ ভাগে ভাগ করে নেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে বর্তমানে প্রচলিত ডিগ্রী শব্দটি উদ্ভব হয় এই বৃত্তকে কেন্দ্র করেই। গ্রীকগণ বৃত্তের ৩৬০ ভাগের এক ভাগকে চাপের পরিমান নির্ধারণের জন্য unit হিসাবে ধরে নেন এবং এর নাম দেন μoiμa (moira) আরব বৈজ্ঞানিকগণ এর অনুবাদ করেন "দারাজা"। বৈজ্ঞানিক Nesselman এর মতে "দারাজা'ই ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের কল্যাণে Degree তে রূপান্তরিত হয়।* শুধু Sine এবং verse এর টেবলই নয়, তিনি ত্রিকোণমিতির সমস্ত সম্বন্ধগুলির টেবল প্রস্তুত করবার পন্থা বর্ণনা করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি "Canones sive regulae tabularim astronomiae নামে লাটিনে অনুদিত হয়।

পেশাতে চিকিৎসক হয়েও যাঁরা অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক অবদানের জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে রয়েছেন আলকারমানি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুল হাকাম ওমর ইব্‌নে আবদুর রহমান ইবনে আহম্মদ ইবনে আলি আলকারমানি। আলকারমানি অর্থ হোল কারমানার অধিবাসী। তিনি ৯৭৬ খৃঃ অব্দে

আলকারমানি

* Smith, History of Math., Vol. II, P. 232.

কার্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল কারমানাতে অতিবাহিত হয় এবং সেই হিসাবেই উত্তরকালে তিনি আলকারমানি নামে পরিচিত হন।

আলকারমানি ছিলেন দশম শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাস্‌লামা বিন আহম্মদ আল মাজ্‌রিতির শিষ্য। দশম শতাব্দীতে এখ্‌ওয়ানুস্‌ সাফার গ্রন্থাবলী বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের চেয়ে এর প্রচারও হয় অতি দ্রুত গতিতে। স্পেনের বৈজ্ঞানিক মহলেও এ দোলা না দিয়ে ছাড়েনি। আলকারমানি কি তাঁর গুরু এ গ্রন্থাবলীগুলি স্পেনে প্রকাশ করেন।

১০৬৬ খৃঃ অব্দে জারাগোজায় ৯০ বৎসর বয়সে এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়।

আলমাজরিতির সাক্ষাৎ শিষ্য না হোলেও তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে যে সমস্ত স্পেনীয় বৈজ্ঞানিক একই সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের নানা শাখায় মনোনিবেশ করেন ইবনোস্‌ সামাহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলজারকালির পূর্বে স্পেনের অন্য কেউ একই সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় ইবনোস্‌ সামাহর মত সুকৌশলী বিজ্ঞান জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

ইবনোস্‌ সামাহ

তিনি ব্যবসায়িক অঙ্ক গ্রন্থ (আল মুয়ামালাত Commercial Arithmetic) মানসিক ক্যালকুলাস (হিসাবুল হাওয়াই Mental Calculas) সংখ্যার প্রকৃতি (The nature of numbers) জ্যামিতি, এবং

আস্তারলব প্রণয়ন ও ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সমস্ত গ্রন্থই তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। কিন্তু এই সময়কার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের মোহ তিনিও ত্যাগ করতে পারেন নাই। আস্তারলব প্রণয়ন ছাড়াও তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা পর্যবেক্ষণের ফল সন্নিবেশ করে একটি টেবলও প্রস্তুত করেন। ইবনোস্ সাফ্ফার মত তাঁর কাজেও ভারতের প্রভাব বিশেষ ভাবেই দৃষ্ট হয়। এই টেবল প্রণয়নে তিনি গ্রীক বা তাঁর পূর্বতম আরব বৈজ্ঞানিকদের পন্থা অনুসরণ না করে সিদ্ধান্তের পন্থাই অনুসরণ করেন। একদিক দিয়ে তিনি কিন্তু টেবল প্রণয়নকারী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের ছাড়িয়ে গেছেন। এতে তিনি শুধু পর্যবেক্ষণের ফল সন্নিবেশ করেই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এতে কাঠখোট্টা নীরস অঙ্কের বহর পাঠককে নিস্তব্ধ করে রাখে না, তার ব্যাখ্যাগুলি মনকে খানিকটা সরস করে তোলে বলা যেতে পারে।

ইবনোস্ সামাহর অনেকগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে জ্যামিতি সম্বন্ধে দুইখানা এবং আস্তারলব সম্বন্ধে দুইখানা। The Libros del Saber এ (Vol. 3, 241-271) De cuemo puede ell ome fazer, una Lamina a cada planeta Segund que to mostro el Sabio Abul Cacim Abnachm নামে একখানি গ্রন্থের

সন্ধান পাওয়া যায়। এখানি খুব সম্ভব ইবনোস্ সামাহ্‌র টেবল থেকে সংগৃহীত।

ইবনোস্ সামাহ্‌র পূর্ণ নাম হোল আবুল কাসিম আসবাগ ইবনে মোহাম্মদ ইবনোস্ সামাহ্। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। খুব সম্ভব তিনি ৯৭৯ খৃঃ অব্দে গ্রানাডাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই ৫৬ বৎসর বয়সে ১০৩৫ খৃঃ অব্দে ২৯ মে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এক সঙ্গে ইতিহাস এবং বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং উভয় বিষয়েই অভাবনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন জগতের ইতিহাসে এমন উদাহরণ বিরল। ইতিহাস ও বিজ্ঞান এক শ্রেণীর জিনিস নয় তাই সাধারণত কেউ একই সঙ্গে এই দুইটি নিয়ে আলোচনাও করেন না বা করতেও পারেন না কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন স্পেনের ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ইবনে সাইদ। ইবনে সাইদের পূর্ণ নাম হোল আবুল কাসিম সাইদ ইবনে আহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সাইদ আলকুরতুবী আল আন্দালুসী। কাজী সাইদ নামেও তিনি অভিহিত হতেন। আলমেরিয়া নামক স্থানে কর্ডোভার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১০২৯-৩০ খৃঃ অব্দে তাঁর জন্ম হয়। জন্মস্থান হোলেও কার্ডোভায় তিনি প্রতিভা স্ফুরণের বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। যতদূর জানা যায় টলেডোতেই তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই ১০৭০ খৃঃ অব্দে ১০ই জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজ্ঞানের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানই তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে তিনিও টলেডোর মানমন্দিরে গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণে রত হন। তাঁর পর্যবেক্ষণের কার্যাবলী যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের মনে বেশ শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল সে বুঝা যায় আলজারকালির টলেডিয়ান টেবল থেকেই। এই টেবলটিতে টলেডোর অন্যান্য মুসলিমও ইহুদী বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণ ফলের কথা উল্লেখ থাকলেও ইবনে সাইদকেই আলজারকালি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন; তাঁর গণনাকেই অভ্রান্ত হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকে স্বতই মনে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি সেই সময়ে স্পেনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

ইবনে সাইদ

বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর দান অন্যান্য বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদদের চেয়ে হীন না হোলেও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক হিসাবেই তিনি বেশী পরিচিত। তিনি মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস নিয়েও বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং ১০৫৭ খৃঃ অব্দে "কিতাবুত্ তারিফ বি তাবাকাতুল উমাম" নামে সমস্ত পৃথিবীর একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করেন। এর পূর্বে এমনি সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়নের কোন প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে জানা যায় না। যা হোক এই ইতিহাসেও তাঁর বৈজ্ঞানিক মন কাজ না করে ছাড়ে নাই। তিনি এর মধ্যে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক নিজে যেখানে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন সেখানে বিজ্ঞান এবং ইতিহাস দুইই যে যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্থান পায় সে নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থের বেলায়ও সেই কথাই খাটে। গ্রন্থকারের মতে বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে পৃথিবীর আটটি জাতির অবদান। এই আটটি জাতি হোল হিন্দু, পারসী, ক্যালডিয়ান, গ্রীক, লাটিন (প্রাচ্য দেশের খৃষ্টানদের নিয়ে), মিসরী, মুসলিম এবং হিব্রু। ইবনে সাইদের মতে বিজ্ঞানে মুসলিম ও গ্রীকদের দানই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। তাই সবার সম্বন্ধে আলোচনা করলেও মুসলিম ও গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনাই বিস্তারিত আকার ধারণ করেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল কিফ্‌তি এবং ইবনে আবিওসাইবা তাঁদের গ্রন্থ প্রণয়নে ইবনে সাইদের গ্রন্থখানি থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। Barhebraensও তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নে এ গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য নিয়েছেন। গ্রন্থখানি Instructio de classibus gentium নামে লাটিনে অনুদিত হয়। পাদ্রি লুই চিখো (Louis Cheikho, S. J.) বাইরুথ থেকে ১৯১২ খৃঃ অব্দে ভাষ্যসহ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এখানির এখনও কোন ইংরাজী অনুবাদ হয় নাই। এই ইতিহাস ছাড়া মুসলিম ও অন্যান্য জাতির বিদ্বানবর্গের জীবনী নিয়েও তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খুব সম্ভব এখানি পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই অংশবিশেষ।

দুইটি দেশ একই ব্যক্তিকে নিয়ে গৌরব করে, সাধারণত এমন সৌভাগ্য কারুর ভাগ্যে ঘটে না। মুসলিম বৈজ্ঞানিক ইবনে আবির রিজালের বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার তিউনিস উভয়ই তাঁর জন্মস্থানের গৌরব দাবী করে। কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। কারুর কারুর মতে তিনি স্পেনের কর্ডোভা বা অন্য কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ আবার তিউনিসকে তাঁর জন্মস্থান বলে নির্দেশ করেন। এই মতদ্বৈধের কারণ হোল তাঁর তিউনিসে অবস্থান। তিনি ১০১৬ খৃঃ অব্দ থেকে ১০৪০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তিউনিসের সুলতান জিরিদ মুইজ বিন বদিস বিন আলমনসুরের (৪০৬ হি—৪৫৪ হি, ১০১৬ খৃঃ অব্দ—১০৬২ খৃঃ অব্দ) দরবারে বৈজ্ঞানিক হিসাবেই অবস্থান করেন। এ থেকেই অনেকের ধারণা তিনি তিউনিসের অধিবাসী। তাঁর গ্রন্থাদি থেকে মনে হয় তিনি ১০৪০ খৃঃ অব্দের পরে কোন এক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুল হাসান

ইবনে আবির রিজাল

আলি ইবনে আবির রিজাল আস্‌সায়বানি আলকাতিব আল মাগরিবি। লাটিনে তিনি আলবোহাজেন (Albohazen), আলবোয়াছেন (Alboacen) এবং আবেন রাজেল (Aben Ragel) নামে পরিচিত। আবেন রাজেল ইবনে আবির রিজাল এর বিকৃত পরিণতি। তবে এতে পিতার নামই পুত্রের নাম হিসাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে বুয়াইদ নৃপতি শরফউদ্দৌলার আমন্ত্রণে বাগদাদে যে বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান হয় অনেকের মতে আবির রিজালও তাতে নিমন্ত্রিত হন এবং শুধু তাই নয়, বাগদাদের তৎকালীন প্রসিদ্ধ গণিতবিদ আলকুহীর অধীনে মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ কার্যও চালান। নামের সাদৃশ্য থেকেই বোধ হয় এ ধারণার উদ্ভব হয়েছে। আলকুহীর মানমন্দিরে আবুল হাসান আলমাগরিবি নামে এক বৈজ্ঞানিকও কাজ করতেন। তাঁর নামের সঙ্গে "আলমাগরিবি" তাঁকে স্পেন বা পশ্চিমদেশীয় বলে নির্দেশ করে। কিন্তু এ সব দিক সাদৃশ্য থাকলেও তারিখ দেখে মনে হয় এই দুই ব্যক্তি এক নন। শরফউদ্দৌলার আমন্ত্রিত বিজ্ঞান অনুষ্ঠান ৯৮৮ খৃঃ অব্দে বাগদাদে অনুষ্ঠিত হয়, আবির রিজাল ১০৪০ খৃঃ অব্দের পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ধরে নিলেও, এই বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের সময় তাঁর বয়স ১৮ বৎসরের বেশী হতে পারে না। এত অল্প বয়সেই তিনি বিশেষ বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিজ্ঞানসভায় আমন্ত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনাতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা জ্যোতিষকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছে বলা চলে। জ্যোতিষের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন বলে ধারণা হয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানির নাম হোল "আলবারি ফি

আহকাম আন্ নজুম বা গ্রহ নক্ষত্রাদির সংযোগস্থলের অবস্থান অনুযায়ী কোষ্ঠি প্রণয়নের বিশিষ্ট গ্রন্থ (Distinguished book on horoscopes from the constellations)। জ্যোতিষ বিষয়ে গ্রন্থ হোলেও মধ্যযুগে ইউরোপে এটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থখানি প্রথমে জুদাবিন মোজেস (Juda ben Moses) কর্তৃক আরবী থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনুদিত হয়। এই স্পেনীয় অনুবাদ থেকে Aegidius de Tabaldis এবং Petrus de Regio পুনরায় লাটিন অনুবাদ করেন। এই লাটিন অনুবাদখানির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মূল আরবী গ্রন্থখানি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস, প্যারি, বার্লিন, এসকুরিয়াল প্রভৃতি স্থানের লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে।

এ ছাড়া তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে উরজুজাও প্রণয়ন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আহম্মদ বিন আল হাসান আল কুসতুনতুনিয়া এর একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

দ্বাদশ শতাব্দী

জগতের সভ্যতার ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দী একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ রেখা টেনে দিয়েছে। এতদিন যা চলছিল সোজা সরল রেখায় মুসলিম জগতকে অগ্রবর্ত্তী করে এইবারে তাতে দেখা দিয়েছে বক্রতার আভাস। মুসলিম জগত অগ্রে থাকলেও এতদিন যারা তার অতি পিছনে পড়েছিল, এইবার তারা এসে তাকে ধর ধর করে নিয়েছে। তার অগ্রবর্ত্তিতা আপনিই পিছিয়ে পড়ছে।

সপ্তম শতাব্দী থেকে মুসলিম জাতির যে অভিযান সুরু হয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায়, এতদিন তাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার কেউ ছিল না, সে চলেছিল অপ্রতিহত গতিতে মস্তক উন্নত করে, দুনিয়ার সবার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। তার ভাষা আরবী হয় সমস্ত জগতের কৃষ্টির ভাষা, তার সংস্কৃতি হয় সমস্ত জগতের সংস্কৃতির পরিবাহক, তার উপর আর কেউ কথা কইবার ছিল না। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে তার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্বতায় ঘুন ধরে। এতদিন যারা ছিল মেষ শাবকের মত নিরীহ, নীরবে বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করেই যাদের দিন কাটত যাদের অস্তিত্বের খবরই পাওয়া যেত না এখন তারা প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। মুসলিম জাতি এবং আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বকে অগ্রাহ্য না করলেও তাদিগকে আর

শত সহস্র হাত দূরে থেকে কুনিশ জানাতে কেউ রাজী নয়, এখন তার কাছে ঘেঁসে আলাপ আলোচনা করতেই সমুৎসুক।

মুসালম জগতেও আর পূর্বের মত শত সহস্র ধারায় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রেরণা আসছে না। যা আসছে, সে শক্তিতে, তেজে, মৌলিকতায় কোন অংশে কম না হোলেও সে আসছে নিতান্ত নিঃসঙ্গ একক ভাবে। অন্য চতুর্দিক থেকে আগের মত একের পর এক স্রোত ধারা এসে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না। ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ আরব গুরুদের নিকট শিক্ষা করে নিজেরাও আস্তে আস্তে জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে মন দিচ্ছে, তারাও আস্তে আস্তে মৌলিক গবেষণার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের রথ চলে যাচ্ছে। এতদিন যে সারথি তাকে চালিয়ে যাচ্ছিল এবং যে অশ্ব তাকে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের দুইজনের মধ্যেই এসেছে ক্লান্তি। তারা সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে। এবার সারথি বদল হবে, এবারেই নুতন ঘোড়া জোড়া হবে আগের ঘোড়ার জায়গায়। কিছু পরেই পূর্বের সারথি ও ঘোড়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দেওয়া হবে। দ্বাদশ শতাব্দী এই বদলানর সরাইখানা, এখানে হাত মিলান হচ্ছে, তার পর এক জন পড়ে রইবে চিরজীবনের মত পিছনে কিন্তু রথ চলবে অতি দুর্দাম গতিতে এগিয়ে. নুতন সারথি নুতন ঘোড়ার সহায়তায়। এ রথ কোনদিন পিছনে ফেরে না, এ চিরকালই সম্মুখের দিকেই এগিয়ে যায়। যে একবার এর থেকে ছুটে বাইরে পড়ে তার আর এগোবার পথ থাকে না, শক্তিও থাকে না।

মোট কথা মুসলিম প্রাধান্য কমে যাচ্ছে বটে কিন্তু অন্য কেউ তার স্থান দখল করবার মত শক্তিশালীও হয়ে ওঠে নি। তাই চালে মুসলিম প্রাধান্যই বজায় রয়ে গেছে। অবশ্য এ প্রাধান্য ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদের ছাদের মত ধসে পড়ার জন্যেই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মুসলিম জাতির এই অবনতির কারণ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মত দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের মতে এর কারণ হোল ধর্মের গোঁড়ামির প্রতি অনুরক্তি; ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রাধান্য না দিয়ে কাঠামোকে প্রাধান্য দেওয়া। It would as if the spirit which has inspired the greatest intellectual endeavours of Islam was flittering away under orthodox pressure into the minds of the Jews and Christian Doctors. Be it as it may, the fact is that in the 12thC we can not speak any longer of a Muslim or Arabic Supremacy but we can not yet speak of another Supremacy. It is distinctly a period of transition. Culture is being transmitted as fast as possible from one group of mankind to another (Sarton, Introduction to the History of Science, vol. II, P. 109.)

এ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস প্রধানত ক্রুসেডের ইতিহাস। ধর্মের নামে কি বীভৎস কাণ্ড চলতে পারে, ধর্মের

দোহাই দিয়ে মানুষ কতটা জ্ঞান হারা হয়ে কাজ করতে পারে ক্রুসেড তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ধর্মমতে বিভিন্নতার জন্যেই যে পাশবিক লীলার কি তাণ্ডব নৃত্যের সৃষ্টি করা যেতে পারে, ইউরোপীয় খৃষ্টানদের এই ক্রুসেডের ইতিহাস সেই কথাই জানিয়ে দেয়। তবে এ মুসলিম জগতের যত ক্ষতিই করে থাকুক না কেন ইউরোপের পক্ষে দেখা দিয়েছে মৃতসঞ্জীবনী সুধার রূপ নিয়ে। অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন ইউরোপ এই ক্রুসেডের ফলেই প্রথম সভ্যতার স্বাদ পায়। শিক্ষা দীক্ষায় নিজের হীনতা তার বোধগম্য হতে থাকে, সে চোখ মেলে চাইতে সুরু করে, তার রেনেসাঁর সুরু হয়।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাগদাদের খলিফা নামে মাত্র খলিফায় পর্য্যবসিত হন। এই শতাব্দীতেও তার কিছু মাত্র উন্নতি হয় নি। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুকগণ নামে মাত্র খলিফার অধীনে থেকে নিজেরাই শাসন কার্য পরিচালনা করেন। শতাব্দীর শেষভাগে মালিকশাহের মৃত্যুতে সেলজুক বংশেও ভাঙ্গন ধরে। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃবিরোধ, হিংসা দ্বেষ প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে দেরী হয় না। আসাসিন সম্প্রদায় তাদের রক্তপিপাসু জিঘাংসাবৃত্তিও সুরু করে দেন। এমনি অন্তর্বিদ্রোহের সঙ্গে যোগ দেয় ধর্মোন্মত্ত খৃষ্টানদের পাশবিক যুদ্ধলীলা। এই সমস্ত জড়িয়ে সব দিক দিয়েই এক ওলোট-পালটের সৃষ্টি হয়। মিসরের এতকালকার ফাতেমীয় বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। মিসর থেকে শিয়া মত চিরকালের

স্কন্ধ বিদূরিত হয়ে সুন্নীমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আজ পর্যন্ত তার কোন নড়চড় হয় নাই।

শুদ্ধ মুসলিম জগতেও জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার দিক দিয়েও বেশ একটা পরিবর্তন আপনিই চোখে পড়ে। একাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় যে জোয়ার স্রোত দেখা দেয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তাতে ভাটার টান পরিলক্ষিত হয়। সে টান তখনও উপলব্ধির যোগ্য নয়, তখনও সে নগ্ন মূর্তিতে দেখা দেয় নাই কিন্তু ভাটা যে আসছে সে নিদর্শন পদে পদেই ফুটে উঠেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা চলছে—কিন্তু পূর্বের শতাব্দীর তুলনায় মনীষীর সংখ্যা নিতান্তই কম। বাগদাদ তার যে প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেছিল রাজনীতির দিক থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দিক থেকেও তার সেই প্রতিপত্তির আসন টলটলায়মান হয়ে উঠেছে। স্পেন হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়েই তার প্রতিদ্বন্দী। কোন কোন বিষয়ে সে শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবী করছে।

এই মরণোন্মুখ দ্বাদশ শতাব্দীকে যাঁরা অসাধারণ প্রতিভার অবদানে জগতের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হোলেন আলগাজ্জালী এবং ওমর খৈয়াম।

মুসলমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক হিসাবেই আলগাজ্জালী ইতিহাসে সুপরিচিত। মোতাজলীয় ও অন্যান্য মতবাদের আক্রমণে ইসলাম যখন জর্জরিত, জনসাধারণ যখন পণ্ডিতদের কূট তর্ক ও বাদবিতণ্ডায় ধর্মের সত্যতত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত সেই সময়ে আলগাজ্জালী তাঁর

অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে ইসলামের আভ্যন্তরিন দর্শন সৌন্দর্য ও মহিমা প্রচার করে অন্যান্য মতবাদকে চিরকালের জন্য নীরব করে দেন। তাঁরই চেষ্টায় ইসলাম জন সাধারণের মনে আবার তার পূর্ব স্থান ফিরে পায়। বস্তুত ইসলাম প্রচারিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত যাঁরা দিকে দিকে এর মহিমা প্রচার করে ধন্য হয়েছেন আলগাজ্জালী তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্মজগতের সঙ্গে এমনিভাবে লিপ্ত থাকলেও তিনি যে জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যদিককে উপেক্ষা করেন নাই তার প্রমাণ হোল তাঁর গণিত আলোচনা। আজকাল যাঁরা ধর্মের ভান করে বিজ্ঞানচর্চাকে ধর্মদ্রোহের পর্যায় ফেলতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না তাঁদের নিকট এ হয়ত উপকথার মতই শোনাবে, কিন্তু ধর্মরাজ্যের এই চিন্তানায়কের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এমন অপভাষণ বোধ হয় কোনদিন স্বপ্নেও জাগে নাই। তাই তিনি ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা খাপ খাওয়াতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আনুসঙ্গিক ভাবে বিজ্ঞান আলোচনা করলেও, এতেও তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায় ও অভিজাত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

আলগাজ্জালীর জীবনও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। খোরাসানের অন্তর্গত তুসনগরে ৪৫০ হিঃ (১০৫৮ খৃঃ অব্দে) তাঁর জন্ম হয়। পিতৃমাতৃ স্নেহ ভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ঘটে উঠে নাই ; অতি শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। এই অনাথ বালকদের

ভার নেন, তাঁদের পিতৃবন্ধু আহম্মদ আররাধখানি। প্রতিভা যার মধ্যে থাকে তাকে কোন কিছুই দমিয়ে রাখতে পারে না। নিঃসহায় পরাশ্রয়ী হোলেও, আলগাজ্জালীর অদম্য প্রতিভা সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে সিদ্ধিলাভের পথ উন্মুক্ত করে নেয়। প্রথমে তিনি পিতৃবন্ধুর নিকট ও দেশের কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করবার উপকরণের অভাব অতি সহজেই তাঁর ও তাঁর মুরব্বীর নিকট ধরা পড়ে। ফলে তিনি স্বদেশ ছেড়ে নিশাপুর ও কুরজান (গুরগাঁও) প্রদেশে গমন করেন তাঁর জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করতে। এখানে তাঁর শিক্ষাগুরু হন যথাক্রমে ইমাম উলহার এবং ইমান আবুনসর আলইসমাইলি। এমনি অকাতর অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রজ্ঞার জন্যে তিনি অতি সুকুমার বয়সেই সুপণ্ডিত বলে পরিচিত হয়ে পড়েন। কুরজান থেকে ফিরবার পথে দস্যুর হাতে লাঞ্ছনাও জ্ঞানস্পৃহার এক নুতন পথ উন্মুক্ত করে দেয় বলা যেতে পারে। দস্যুরা তাঁর সমস্ত লুটে নিয়ে যায়। এর মধ্যে ছিল নানা বিষয়ে তাঁর নোট। তিনি দস্যুদের পিছনে পিছনে দৌড়ে যেয়ে তাঁর নোটগুলোকে ফিরিয়ে দিতে সকাতর অনুরোধ জানান। এই অস্বাভাবিক অনুরোধ দস্যু সর্দারকে বিস্মিত করে। সে তাঁকে অন্য সমস্ত ধন সম্পত্তি ত্যাগ করে এই সামান্য নোটগুলির প্রতি এমনি আগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করে। জ্ঞানভিক্ষু আলগজ্জালী জানান যে এই নোটের মধ্যেই তাঁর

সমস্ত জ্ঞান আবদ্ধ রয়েছে এবং এরই জন্যে তিনি দেশত্যাগ করে বিদেশে এসেছিলেন। দস্যুসর্দার সুউচ্চ হেসে উত্তর করে "তবে তুমি কেন ভান কর যে এই সমস্ত বিষয় শিখে নিয়েছ। আমরা তোমার নোটগুলো নেওয়াতেই তুমি জ্ঞান-হারা হয়ে পড়েছ?" আলগাজ্জালী সেইদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেন যে যা জানবার সেই সবই ভালভাবে শিখে হৃদয়ঙ্গম করে নেবেন যেন এর পর নোট চুরি হোলে আর অনুতাপ করতে না হয়।

নিশাপুরে তিনি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে কতকগুলি পুস্তিকাদিও প্রণয়ন করেন। তার গ্রন্থের অসাধারণত্ব অতি সহজেই মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যোৎসাহী প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুল্‌কও তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। ধর্মের উন্মাদনা যাকে পেয়ে বসে কলেজের অধ্যাপনা তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে না। আলগাজ্জালীর বেলাও এই চিরস্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি চার বৎসর সসম্মানে অধ্যাপনা করার পর, সংসার ত্যাগী হয়ে হজ যাত্রায় গমন করেন এবং এই হজ উপলক্ষে মুসলিম জগতের বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময়ে সিরিয়ায় অবস্থান কালে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ইহ্‌য়িয়া অলউলুমুদ্‌দীন (Revivification of the religious Sciences) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি আরবীতে লিখিত হয়, পরে সংক্ষেপে,

কিমিয়ায়ে সায়াদত বা সৌভাগ্য স্পর্শমণি নামে পারসীতে এর অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগতের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব এনেছিল এখনও তার জের মেটে নাই বলা চলে। এখনও সমস্ত মুসলিম জগত একে ধর্মব্যাখ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে অভিহিত করে। অনেকের মতে ধর্মগ্রন্থ কোরাণ যদি কোনদিন কোন কারণে ধ্বংস হয় তা হোলে এই ইহিয়া-অলউলুমই ইসলামকে জগতে জীবিত রাখতে সক্ষম হবে। সিরিয়া থেকে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করে তিনি ধর্মপ্রচার কার্য স্থুরু করেন। পুনরায় কিছুদিনের জন্য নিজামিয়া কলেজেও অধ্যাপনা করেন। শেষ বয়সে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বসবাস স্থাপন করেন। এই স্থানেই তিনি ৫০৫ হিজরী ১৫ই জমাদিয়স্সানি (১৮ই ডিসেম্বর, ১১১১ খৃঃ অব্দ) সোমবার পরলোক গমন করেন।

ইসলামিক দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হুজ্জতুল ইসলাম (Proof of Islam) নামে অভিহিত হতেন এবং উত্তরকালে এই নামেই সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়ে পড়েন। এমনিতে তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আলতুসী আশ্‌শাফী আলগাজ্জালী।

আলগাজ্জালী বহু গ্রন্থ রচনা করেন দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্তগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ব্রকেলম্যান (Brockelman) এ পর্যন্ত সতরখানা গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। এর প্রায় সবগুলিই ধর্মের দর্শন নিয়ে এবং এ সবগুলিই ধর্মসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ

সম্পদরূপে মুসলিম জগতে সম্মানিত। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি নক্ষত্রাদির প্রকৃতি ও গতিবিধি সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের একখানা সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করেন। এর দ্বিতীয় গ্রন্থখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব এখানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সারটনের মতে এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানা খুব সম্ভব প্রথমখানারই অন্যতম সংস্করণ। জ্যোতিবিজ্ঞান ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রের অন্য যে দিকটার তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন সে হোল ম্যাজিক স্কোয়ার। ম্যাজিক স্কোয়ার অবশ্য বিজ্ঞান হিসাবে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে নাই; ছাবেত ইবনে কোরার পর অন্য কেউ এদিকে সেরূপ মনোযোগ দিয়েছিলেন বলেও মনে হয় না। আলগাজ্জালী কিভাবে এর প্রতি আকৃষ্ট হন সে তেমন স্পষ্ট বোঝা যায় না।

আলগাজ্জালীর প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলিই আরবীতে লিখিত। এর কতকগুলি তখন তখনই পারসীতে অনুদিত হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এগুলি ইউরোপে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে; এর অনেকগুলিই লাটিনে অনুদিত হয়। বর্তমানে ইউরোপের সমস্ত প্রধান ভাষায় অনেকগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যেতে পারে।

(১) ইহিয়ায়ুল উলুমুদ্দীন (Revivifying the Sciences

of the faith) এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। D. B. Macdonald "Emotional Religion in Islam as affected by Music and Singing" নামে এর একখানি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। (২) কিতাবুদ দুররা আল ফখিরা ফি কাশফুলওলুম আলখিরা। (৩) কিমিয়ায়ে সাআদৎ—The Alchemy of happiness "সৌভাগ্য স্পর্শমণি" নামে এর একখানা বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে: Claud Field এর একখানি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। (৪) মিশকাতুল আনোয়ার—W. H. P. Gairdner ১৯২৪ সনে এর একখানি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। (৫) কিতাবুত তাহাফাতুল ফালাসিফা—The Internal contradiction (or vanity) of Philosophy. (৬) কিতাবুল মনকিদ আদদালাল—The liberation from error. Claud Field কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে।

ওমর খৈয়াম

মানুষ কোনদিনই মরতে চায় না। সে চায় বেঁচে থাকতে, যে কোন প্রকারে হোক যেমনভাবে হোক। তবে এই ফল পুষ্প পরিশোভিত সুনীল আকাশ ঘেরা পৃথিবীতে জলজ্যান্ত মানুষ হিসাবেই যে সে বেঁচে থাকতে চায় তা নয় প্রকৃতির খেয়ালে যখন তার জীবনী শক্তিতে ঘুণধরে শুকনো পাতার মত যখন সে ঝড়ে পড়ে যায় পৃথিবীর দেহ হতে, তখনও তার এ বেঁচে

থাকার আগ্রহ একেবারে ক্ষান্ত হয় না। রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে মানুষের চোখের সম্মুখে উপস্থিত থাকবার আশা ফুরিয়ে গেলেও, সে চায় মানুষে স্মৃতির কোণে একটু বাসা, একটা স্থায়ী আসন। সে চায় মানুষ তার কথা স্মরণ করুক, তার কথা মনে রাখুক, তার কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলুক, শরীরী আত্মার শেষ হোলেও তার এই অশরীরী আত্মা যেন উবে না যায় পৃথিবী থেকে একেবারে মিলিয়ে না যায়। জীবনের অভীষ্ট কাজে যাঁরা সাফল্য লাভ করেন তাঁদেরই শুধু এই আকাঙ্খা পরিপূর্ণ হয়, জীবনে এবং জীবনের পরে তাঁরাই শুধু এই চিরআকাঙ্খিত অমরত্ব লাভ করেন।

এই অমরত্বও কিন্তু অনেক সময় মন মত পথ ধরে আসে না। স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি বাহ্যত যাঁরা জীবনের কাজে সাফল্য লাভ করে এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁরাও ঠিক তাঁদের মনোমত সফলতা লাভ করেছেন কিনা নিঃসন্দেহভাবে বলা চলে না। ধর্ম জগতে যাঁরা মহাপুরুষ বলে আখ্যা পেয়েছেন তাঁদের প্রকৃত কথা কি তা নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নাই। শিষ্য প্রশিষ্যসহ নানা দলের কথা থেকে সে মহাপুরুষদের প্রকৃত কথা বা বাসনাকে বেছে বের করে নেওয়া শুধু শক্ত নয় বরং দুঃসাধ্য ব্যাপার বলা যেতে পারে। অন্য জগতে এর চেয়েও বেশী ওলোট পালোট দেখা গিয়েছে। অনেকের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁদের জীবনের সমস্ত প্ল্যানই যেন বদলে গিয়েছে। যা ছিল তাঁদের আজন্ম সাধনার ধন, যা নিয়ে

তাঁরা দিনের পর দিন একটু একটু করে রক্ত বিন্দু ক্ষয় করেছেন সে পড়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গর্ভে, কিন্তু যা ছিল তাঁদের সাময়িক খেয়াল সেই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই তাঁদের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবার ক্ষীণ আশাকে সফল করে তুলেছে। এ সাফল্য তাঁদের মনোমত পথ ধরে নয় এ এসেছে সম্পূর্ণ নুতন ভাবে নুতন পথে। তাঁদের অশরীরী আত্মা যদি শরীর নিয়ে ফিরে আসে তা হোলে এই সফলতায় আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করতে পারবেন কিনা বলা যায় না। প্রকৃতির খেয়াল তাঁদের সমস্ত প্ল্যানকে ভেঙ্গে চুড়ে অন্য ভাবে গড়ে তুলেছে। এ মূর্তির সঙ্গে পূর্বের মূর্তির কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। আমাদের কবির "আজি হতে শত বর্ষ পরে" কবি হিসাবে পরিচিত হবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা থাকলেও প্রকৃতির এমনি উদ্ভট খেয়াল তাঁর সে আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ হতে দেবে কিনা স্থির নিশ্চয়ভাবে বলা চলে না। শত বর্ষ পরে না হোক, পাঁচ শত বা সাত শত বর্ষ পরে তিনি যদি কবি হিসাবে পরিচিত না হয়ে বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিচিত হয়ে পড়েন, তাতে আর যাই হোক আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না। এমনি ওলোট পালোট এমনি দুর্ভাগ্য অনেকের ভাগ্যেই দেখা দিয়েছে।

থেলস (Thales) এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে খ্যাত। সর্বপ্রথম গ্রীক দার্শনিক এবং পৃথিবীর সাতজন মহাদার্শনিকের অন্যতম বলেই তিনি পরিচিত কিন্তু তাঁর জীবন কেটেছিল অঙ্কের নীরস গবেষণায়। তিনি যে সর্বপ্রথম গ্রীক

Mathematician, অঙ্কের সংখ্যার মারপ্যাঁচের মধ্যেই যে তাঁর জীবনের অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছিল, সে কথা এখন কারও মনে জেগে উঠবার সুযোগ পায় না। এরিষ্টটল আজীবন অঙ্কশাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম Infinitesimals এর প্রবর্তন করে principle of continuity এর প্রচলন করেন। কেভলরি এবং কেপলার এর উন্নতি সাধন করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিউটন এবং লাইব্‌নিজ (Leibniz) এর সহায়তায় Infinitesimal Calculas আবিষ্কার করেন। অঙ্ক শাস্ত্রের এমনি এক অত্যাবশ্যক আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁর নাম বিজড়িত থাকলেও, এরিষ্টটল Mathematician হিসাবে পরিচিত নন, পরিচিত হোলেন দার্শনিক হিসাবে। অঙ্ক শাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যাকে দর্শনের পর্যায়ভুক্ত করে নিলে, থেলস ও এরিষ্টটলের এই আপাত অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্য করে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু ওমর খৈয়ামের বেলায় এতেও কুলোবে না। বিজ্ঞানের বা অঙ্কের নিছক নীরস হিসাব নিকাশের কারবারকে কাব্য রসের ফোয়ারা বলে স্বীকার করে নিতে বিবেক বুদ্ধিতে বাধবে। যেমন এখন বাধবে রবীন্দ্রনাথকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিচিত করবার প্রচেষ্টা কিংবা আইনষ্টাইনকে রবীন্দ্রনাথের স্থানে বসিয়ে কাব্য খ্যাতি দিয়ে মুড়িয়ে দেবার প্রয়াস। তবুও প্রকৃতি তার উদ্ভট খেয়ালে এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দিয়েছে।

বর্তমানে আমরা ওমরকে কবি ছাড়া অন্য কোন ভাবে

ভাবতেই পারি না। সরাব, সাকী আর রুবাইয়াত ছাড়া ওমরের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করতেও বাধে। ওমরের নাম করলেই মনের কোণে ফুটে উঠে একটি রসিক কবির ছবি, সঙ্গে সঙ্গে সরাব, সাকী এবং অনিন্দ্যসুন্দর একটি তরুণী কবিপ্রিয়া। প্রিয়ার প্রেমে বিমুগ্ধ, সরাবে মাতোয়ারা কবির মুখে শুধু শোনা যায়

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর
সেইত সখি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর

এই সরাব সাকী, এবং নাস্তিকতায় পূর্ণ জগতের সবকিছুকে মুচড়িয়ে ভেঙ্গেচুড়ে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেওয়া খোস খেয়ালী কবিতা ছাড়া তাঁর জীবনের গম্ভীরতা বলে কোন কিছু ছিল এ কথা ক্ষণেকের তরেও কারও মনে জেগে উঠে না। এই কবিতাতেই যেন তাঁর জীবনের সব সুর সব ছন্দ সব আদর্শ জড় হয়ে রয়েছে। কিন্তু ওমরের রক্তমাংসের জীবনে এগুলির কোন প্রভাব ছিল কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্তমানের ছবি তাঁর জীবনের প্রকৃত প্রতিকৃতি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ বিরাজমান। নৈরাশ্যবাদের ছন্দ তাঁর সমস্ত কাব্য গাথাকে ঘিরে থাকলেও তাঁর জীবনের পথে এ কোন খোরাক জুগিয়েছিল কিনা বলা যায় না। প্রাচ্যের নৈরাশ্যবাদ জ্ঞানের প্রগতির পথে যে প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে

দেয় ওমরের জীবনে সে প্রতিবন্ধকের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। হয়ত তাঁর জীবনের খাপছাড়া কয়েকটি মুহূর্তে এমনি একটা নৈরাশ্যবাদ, এমনি একটা বিষাদ মাখা ছবি জেগে উঠেছিল—আর সেইগুলিই তাঁর স্মৃতিকে আজ আমাদের কাছে জাগরূক রেখেছে। এখন আমরা ওমর খৈয়ামকে জানি কবি বলে, আমাদের রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গেই পাখীর কল কূজন, লোকের কোলাহল, যন্ত্রের বীভৎস আওয়াজ তাঁর "রাত পোহাল শুনছ সখি দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক" মনে পড়িয়ে দেয়, আমাদের অবসাদ মুহূর্তে, নিরাশের অন্ধকারময় কোণে স্বতই মনে পড়ে "কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল পৃথ্বীমাঝ ; আসছি ভেসে কিসের স্রোতে হেথায় বা মোর কিসের কাজ" কিন্তু ওমরের জীবনে এগুলির বিশেষ প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না।

ওমর যে কবি, তাঁর কাব্যে যে মানুষের বেদনার সুর জেগে উঠেছে, খোদার প্রতি মানুষের অভিযোগ থরে থরে জমা হয়ে দেখা দিয়েছে, সে কাব্য যে মানুষকেও চিন্তান্বিত করে তুলতে পারে এ কথা ওমরের সমসাময়িক কেউ ভাবত না। তখনকার ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ওমরের বন্ধু বান্ধব, শিষ্য প্রশিষ্য কেউ তাঁর কাব্যকে কাব্য আখ্যা দেয় নাই, তার মধ্যে নুতন আদর্শ, খুঁজে পায় নাই। ইরাণের চিরাচরিত প্রথা, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ছন্দগাথা মধুরতা, সবার মনকেই নাড়া দেয়, শিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সবারই হৃদয় প্রকৃতির এক অজ্ঞাত আকর্ষণে আপনি উদ্বেলিত হয়ে উঠে, মুখের ভাষায় সে সৌন্দর্যের

স্তব করতেই বেরিয়ে আসে ছন্দ গাথা রুবাইয়াত, এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নাই, অসম্ভবও কিছু নাই। মিল দেওয়া সুর দেওয়া কয়েকটি পয়ার রচনা করলেই তাকে কবি বলে মেনে নিতে হবে, সম্মান করতে হবে, ইরাণের লোকের মনে একথা কোন দিন জেগে উঠে নাই। ওমরও যদিই বা তাঁর অবকাশের মধ্যে, অবসাদের মুহূর্তে ছন্দ গাথা দুই একটা রুবাইয়াত রচনাই করে থাকেন তাতে তাঁর দিকে নজর দেবার এমন কি আবশ্যকতা আছে! সত্যিই যে সে আবশ্যকতা তখনকার শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই অনুভব করেন নাই, তাঁদের কার্যকলাপ থেকেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ওমরের যুগে ইরাণে কবিদের কাব্য গাথা সর্বসাধারণকে কেমন ভাবে পেয়ে বসেছিল তার নিদর্শন হোল তাঁদের জীবনী সংগ্রহ। অন্য কোন বিষয়ের লেখক বা সম্মানিত ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহে তেমন বিশেষ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমন জীবন ইতিহাসের সংখ্যা খুবই কম অন্তত কবি জীবনীর তুলনায়। ওমরের সমসাময়িক এমনি এক কবি-জীবনী সংগ্রহকারক হোলেন মোহাম্মদ আওফি। তিনি বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তখনকার কবিদের জীবনী কথা জেনে নিয়ে "লুবাবোল আলবাব" গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর সমসায়িক বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম যে পরবর্তী কালে বিশ্ব কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে পারেন, সে কথা তাঁর ধারণারও অতীত ছিল বলে বোধ হয়। তিনি ভুলেও কোথাও ওমরের নামোল্লেখ

করেন নাই। অবশ্য এ থেকেই বলা চলে না যে তিনি ওমরের রুবাইয়াতের কোন খবরই রাখতেন না। পারস্যের অন্য সাধারণ কবিদের মত, ওমরের রুবাইয়াত ও কাব্যের কোন ধার ধারে না, সেগুলি তাদের রচয়িতাকে কবি জগতে স্থান দেবার মত স্পর্ধা করতে পারে না, সেই হিসাবেই আওফি রচয়িতাকে নীরবে এড়িয়ে গিয়েছেন।

সর্বকালেই শিষ্যগণ গুরুদের ভক্তি দেখাতে গিয়ে বেশী রকম মাতামাতি করে ফেলে। গুরুদেবের সর্বগুণ দেখে এবং দেখিয়েও তাঁদের শান্তি হয় কিনা বলা যায় না। তাঁদের মধ্যে যে গুণের সন্ধান প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না, সেগুলোও বের করে নিতে শিষ্যদের আগ্রহের আতিশয্য দেখা যায়; প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব হোলেও পরোক্ষ প্রমাণ দিয়ে, সে গুণের উল্লেখ করতেও তাঁদের যুক্তির প্রাচুর্যের অভাব হয় না। ওমরের সময়ে যে এ গুণের অভাব ছিল তেমন মনে হয় না বরং এর আতিশয্যই প্রকাশ পেত মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে ফেরেস্তাদের সমান করে পীর বলে সম্মান করে। ওমরের এমনি এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন সমরকন্দের নিজামী আরুজী। এই অন্ধবিশ্বাসী ভক্ত ওমরের অলৌকিক সকল ভবিষ্যদ্বানীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ উল্লেখ করে তাঁর মহত্বের কথা প্রকাশ করলেও, তিনি যে কবি ছিলেন, তাঁর কবিতায় যে অভাবনীয় নুতন দর্শন কিছু ছিল, সে কথা ভুলেও উল্লেখ করেন নাই। তিনি কবিদের কথা জানতেন না, কি নীরস

বৈজ্ঞানিকদের মত কবি এবং কাব্য নিয়ে কোন আলোচনাই করেন নাই তা নয় বরং তাঁর গ্রন্থ "চাহার মাকালার" প্রথম "মাকালায়" তিনি কবিদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন। এতেই বোঝা যায় গুরুর কবিপ্রতিভা শিষ্যকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারে নাই।

কোন কিছুতে গুণ না থাকলে দোষও থাকবে না এমন কোন কথা নাই। কবিতার মধ্যে যাঁরা কাব্য দেখেন তাঁরা ওমরের কবিতার মধ্যে কাব্যের কোন সন্ধান পান নাই, তাই তাঁকে কবি বলে স্বীকার করে নিতে অপারগ হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা ফুলে ফুলে মধু না খুঁজে কাঁটা খুঁজে বেড়ান তাঁরা একে তেমন ভাবে ছেড়ে দেন নাই। ওমরের কবিতায় কাব্যের রসাস্বাদ না পেলেও তাঁর মধুর হুলের আঘাত তাঁদের বেশ বেজেছিল। এ হোল গোঁড়া সুফী সম্প্রদায়। কাব্য আলোচনা করবার বা কাব্যের রস আস্বাদন করবার মত ধৈর্য ও মানসিক অবস্থা তাঁদের ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু তাঁদের অন্ধবিশ্বাসী যুক্তিতর্কহীন ধর্মমতকে যে যে কোন ভাবেই আঘাত করুক না কেন সে আঘাতকে শান্ত সমাহিতভাবে সহ্য করবার শক্তি তাঁদের ছিল না। দার্শনিক ওমরের যুক্তি ও তর্কজালকে সুফী সম্প্রদায় কোনদিনই ভাল চোখে দেখতে পারেন নাই। তাঁদের মত অন্ধবিশ্বাসী না হয়ে ওমর নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবেন এ তাঁরা কোনদিনই পছন্দ করতেন না। ফলে ওমরের রুবাইয়াত কাব্য হিসাবে খ্যাতিলাভ না করলেও তার মধ্যেকার নাস্তিকতার

আভাস তৎকালীন গোঁড়া সমাজকে ক্ষুব্ধ ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যেখানে গোঁড়া সুফীদের আড্ডা বসত সেইখানেই ওমরের নাস্তিকতা নিয়ে আলোচনা চলত। শেষে সুফীদের এই আলোচনায় জনসাধারণও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে ওমরকেও অনেক সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হোত। এইজন্যেই তাঁর কাব্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করতে না পারে এও বোধ হয় তাঁর আন্তরিক অভিলাষ হয়ে দাঁড়ায়।

গোঁড়া সুফীদের এই বিরাগকে তখনকার দিনে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করবার মত সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। সুফীদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জনসাধারণের কথা বাদ দিলেও শিক্ষিত সমাজেও তাঁদের প্রভাব খুব কম ছিল না। এই প্রভাবের নিদর্শন পরবর্তী কালেও পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ সুফীদের এই বিরাগকে ওমরের জীবনী ও কার্যকলাপের সমালোচনার মধ্যে টেনে এনেছেন। ধর্মের প্রতি ওমরের কতখানি বিশ্বাস ছিল সে নির্ণয় করা কঠিন অন্তত তাঁর কাব্য থেকে তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। উচ্চদরের কাব্যকে ইচ্ছামত বাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্তু সেই ব্যাখ্যারই যে কবির দর্শন বা জীবনের সঙ্গে মিল আছে এমন মনে করবার সঙ্গত কোন কারণ নাও থাকতে পারে। ওমরের কাব্যের মধ্যে প্রকাশ্য নাস্তিকতার আভাস থাকলেও তাঁর জীবনের কার্যকলাপের মধ্যে ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। খোদাভক্ত

ধার্মিকের মতই পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামাজ পড়া, হজ্জ করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁর প্রাত্যহিক কার্যাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল--এ সবের মধ্যে কোন তাচ্ছিল্যভাবও প্রকাশ পায় নাই কিন্তু কয়েকজন ঐতিহাসিক একে ঠিক ধর্মের নিদর্শন বলে মেনে নিতে নারাজ। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে আলজাইজানি অন্যতম। তাঁর ধারনা ওমরের ধর্মের প্রতি এই অনুরাগ ভাণমাত্র। বিমুগ্ধ সুফীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত জনসাধারণকে তাঁর জীবনের দর্শন ও আদর্শ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করবার জন্যেই তিনি ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ; শুধু তাই নয় তিনি প্রাণ ভয়ে অনেক সময়ে কাব্য প্রকাশেও বিরত থাকতেন। জামাল উদ্দিন ইবনোল কিফতি ওমরের মক্কা গমনের মধ্যে হজের উদ্দেশ্য বা ধর্মের কোন আভাসই দেখতে পান নি। তাঁর মতে এতে শুধু মক্কা শরীফ দেখে নাস্তিকের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করবার বাসনাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ওমরের জীবনে ধর্ম এবং পুণ্যের উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার করবার মত মানসিকতার বিশেষ অভাব ছিল বলেই তাঁর ধারনা।

এমনি বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে ওমর খৈয়ামের কাব্যের উৎস স্বতপ্রবাহ ভাবে প্রবাহিত হতে পারে নাই তাই তাঁর কাব্য প্রতিভা কতকগুলো রুবাইয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য এ থেকেই যে তাঁর কাব্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না কিংবা তাঁর দর্শনের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু উপরোক্ত বাধা বিঘ্নের জন্যই তাঁর প্রতিভার

পূর্ণ বিকাশ হতে পারে নাই এবং প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দর্শনকে বিস্তারিত রূপ দেবার অবকাশও তাঁর ঘটে নাই। দর্শনের এই নুতন বাণী, মানব জীবনের এই অভিনব অভিজ্ঞতা তখনকার দিনে কোন সমাদরই লাভ করতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ বোধ হয় কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হয় নাই। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতির দাবীকে স্থান না দিলেও পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকগণ তাঁর কাব্যকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম ঐতিহাসিক মোহাম্মদ হামিদুল্লা মুস্তোফী তাঁর 'তারিখ-ই-গুজিদা'তে ওমরের কাব্যের উল্লেখ করেছেন যদিও কবি হিসাবে ওমরকে স্থান দেওয়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয় না। এই শতাব্দীর অন্যতম ঐতিহাসিক ইমাম উদ্দিন খাতিব তাঁর "ফারিদাতুল আসর" গ্রন্থে ওমরকে কবি তালিকাভুক্ত করেছেন বটে কিন্তু সমগ্র পারস্যের অন্যতম কবি হিসাবে নয়, পারস্যের অন্যতম প্রদেশ খোরাসানের প্রাদেশিক কবি হিসাবে অর্থাৎ মৃত্যুর দুই শত বৎসর পরে ওমরের কাব্য কাব্যহিসাবে কিছু কিছু পরিচিত হতে সুরু করে। এর আরও দুই শত বৎসর পরে আরও একটু উন্নতি দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম কাব্যসমালোচক দৌলত শাহ তাঁর "তাজকিরাতুস শোয়ারা" গ্রন্থে অন্যান্য কবির সমালোচনা করতে গিয়ে ওমরের কবিতাও উধৃত করেছেন, যদিও ওমরের কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিশেষ উচ্চ

ছিল বলে মনে হয় না। তিনি ওমরের কাব্য উধৃত করলেও তাঁর কবি প্রতিভা সম্বন্ধে একেবারেই নীরব রয়ে গেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর নির্ভুল জীবনীকার ও প্রসিদ্ধ সমালোচক তকি কাশীর ওমরের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে ধারণা দৌলত শাহের অপেক্ষা উন্নত স্তরের হোলেও তার মধ্যে নুতন আদর্শ, দর্শন বা ভাবধারা কিছুই খুঁজে পান নাই। তিনি তাঁর "খুলাসাতুল আমর" নামক ইরাণের কবিদের জীবনীতে ওমরকে কবি হিসাবে উল্লেখ করে তাঁর ষোলটি রুবাইয়াত উধৃত করেছেন। এই শতাব্দীর অন্যতম কবি-জীবনী সংগ্রহকারক সৈয়দ আলি বিন মোহাম্মদ আল হুসেনীও ওমরকে কবি হিসাবে স্থান দিয়েছেন। তিনি তাঁর "বাজমারাই" গ্রন্থে ওমরের কাব্য সম্বন্ধে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন "ওমর খৈয়াম চিন্তাশীল দার্শনিক হোলেও, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর রুবাইয়াতও রচনা করেছেন।" তিনিও যে ওমরকে ঠিক কবি হিসাবে দেখেন নি সে বোঝা যায় তাঁর অন্য মন্তব্য থেকেও "ওমর নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যেই কাব্যের অনুশীলন করতেন"। আরও দুই শতাব্দী পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লুৎফ আলিবেগ ওমরকে কবি হিসাবে সম্মান দেখিয়েছেন তাঁর "আতশকাদা" গ্রন্থে কবির কতকগুলি রুবাইয়াত উধৃত করে, তবে তিনিও আলহুসেনীকে অনুসরণ করেছেন বলা চলে। তাঁর মতেও ওমর প্রধানত দার্শনিক হোলেও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর আরবী ফারসী রুবাইয়াতও রচনা করেন।

ওমরের কাব্য এমনি কারুর কারুর মনে স্থান পেলেও এর মধ্যেকার দর্শন কাউকে আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে হয় না। কাব্যের সৌন্দর্য ও দর্শনের কথা কেউই উল্লেখ করেন নাই, মধ্যে মধ্যে দুই চারটা রুবাইয়াত উধৃত করেই তাঁদের কাব্যপ্রীতি শেষ করেছেন। পারস্যে ওমরের কবি খ্যাতি এমনি কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়লেও পারস্যের বাইরে তাঁর কোন স্থানই হয় নাই এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোথাও তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নাই, তাঁর দর্শন ও যুক্তিবাদও কাউকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নাই। এখন প্রাচ্যে সাধারণত কোন মতবাদই স্থান পায় না যতদিন না পাশ্চাত্য থেকে তার সমর্থন আসে। এডওয়ার্ড ফিজরয়ান্ডের অনুবাদই সর্বপ্রথম ওমরকে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত করে দেয়। অবশ্য এই অনুবাদও প্রথম প্রথম কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় নাই। দৈবানুগ্রহেই যেন ওমরের কবিখ্যাতি লাভ হয়ে পড়ে। ফিজরয়াল্ড ১৮৫৭ সালে রুবাইয়াতের অনুবাদ করে পার্কারকে পাঠিয়ে দেন ছাপিয়ে প্রকাশ করার জন্যে। কিন্তু প্রকাশকদের সুচিন্তিত দূরদৃষ্টি এর মধ্যে ভবিষ্যতের কোন আশা দেখতে পায় নাই। পার্কার দুই বৎসর অমনি ফেলে রাখেন, নিজেত প্রকাশ করেনই নাই পাণ্ডুলিপিখানি গ্রন্থকারকে ফেরৎ দেওয়ার কথাও তিনি ভুলে যান। যা হোক গ্রন্থকারদের স্বীয় কার্যের প্রতি স্নেহাতিশয্যের জন্যই ফিজরয়াল্ড প্রকাশকের দূরদৃষ্টিতে সাবধান না হয়ে নিজেই আড়াইশ কপি ছাপিয়ে ফেলেন এবং দাম রাখেন

পাঁচ শিলিং। তাঁর দূরদৃষ্টবশত এর একখানিও বিক্রী হয় নাই ফলে তাড়াতাড়ি বইএর দাম কমাতে হয়। পাঁচ শিলিং থেকে চার শিলিং, তিন শিলিং, দুই শিলিং, এবং শেষ পর্যন্ত এক শিলিং কমান হোল কিন্তু তাতেও কিছু হোল না তখন একেবারে কমিয়ে এক পেনি করা হোল। এইবারে সবগুলিই বিক্রী হয়ে গেল। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হোল এই যে এর আর্থিক মূল্য কমার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত মূল্য বেড়ে গেল। দান্তে ল্যাব্রিয়েন রোসেটি এই এক পেনী দামের বই একখানা কিনে নিয়ে পড়ে এত মুগ্ধ হোলেন যে তিনি তাঁর ছাত্রদেরও বইখানি কিনে পড়তে বললেন। এই বারেই বইয়ের সত্যিকার আদর হোল। অতি তাড়াতাড়ি বইএর সংস্করণ পর সংস্করণ বের হয়ে সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচ্যের ওমর খৈয়াম কবি হিসাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সর্বত্র পরিচিত হয়ে পড়লেন। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে ওমর খৈয়ামের কাব্যই বোধ হয় ইউরোপ আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা বেশী সমাদর লাভ করেছে। আমরা প্রাচ্যবাসীরা এতদিনে তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছি।

বর্তমানে আমরা ওমরকে কবি ছাড়া অন্য কোন ভাবে ভাবতেই পারি না। সরাব সাকী আর রুবাইয়াত ছাড়া ওমরের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করতেও বাধে কিন্তু ওমরের রক্ত মাংসের জীবনে এগুলির কোন প্রভাব ছিল কি না এবং থাকলেই বা কতটুকু ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি

যে কবি হিসাবে সমসাময়িক ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নাই তার কারণ তাঁর কাব্য প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করবার অক্ষমতার মধ্যে যত না হোক, তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী এবং তাঁর কার্যাবলীর মধ্যেই নিহিত। ওমর খৈয়ামের কাব্য আমাদের মুগ্ধ করলেও তাঁর জীবনে এ কাব্যের স্থান ছিল নিতান্ত নগণ্য। কোমল নমনীয় দার্শনিক কবির ভাব বিলাসিতার পূজারী না হয়ে তিনি ছিলেন নীরস বাস্তব কঠোর সত্য বিজ্ঞানের পূজারী। কাব্য ও দর্শন যতই মহিমান্বিত হোক না কেন কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা ওমরের বোধ হয় কোনদিনই ছিল না—

আস্তি নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান

এ শুধু কাব্যের খাতিরেই তিনি বলেন নাই সত্যি সত্যিই তাঁর জীবনে বীজগণিতের বা বিজ্ঞানের সূত্ররেখাই ধ্যান ছিল। শুধু যৌবনে নয় বৃদ্ধ বয়সেও এ ধ্যানের শেষ হয় নাই। বিজ্ঞান ছিল তাঁর আজীবন সাধনার ধন। প্রকৃতির কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত অজানা গুপ্তধনকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সেই স্থির লক্ষ্য নিয়েই তিনি জীবনের কাজ করে গেছেন এবং সে বিষয়ে যে তিনি যে সফলকাম হয়েছিলেন সেও নিঃসন্দেহ সত্য।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে ওমর যে তখন অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার

করেছিলেন সমস্ত ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রত্যেক ঐতিহাসিক, জীবনী লেখক, সমালোচক ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভার অজস্র প্রশংসা করেছেন। ওমরের জীবনের প্রত্যেক কার্যকে বিরূপ সমালোচনা করতে, ঐতিহাসিক আলজাইজানি বোধ হয় আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন কিন্তু তিনিও ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভার নিকট মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন। নানা বিরূপ সমালোচনা, ধর্মের অনুরাগকে নাস্তিকতার ভাণ বলে বিদ্রূপ কটূক্তি করতে চতুর্মুখ হয়েও তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের সমালোচনায় আলজাইজানি ওমরকে খোরাসানের ইমাম (নেতা) সেই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ বলে উচ্ছসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে ওমর গ্রীক বিজ্ঞানে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী, রাজনীতি এবং দর্শনেও তাঁর ছিল অসাধারণ বিচক্ষণতা। অন্যতম ঐতিহাসিক আলকুয়াজিনিও ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভাকে সর্ববরেণ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে "ওমর ছিলেন তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তবে বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে গণিত বিজ্ঞানেই ছিল তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব"। তাঁর নব নব গবেষণা তৎকালীন পণ্ডিত সমাজকে সচকিত ও মুগ্ধ করে। তিনি যে পণ্ডিত সমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন পরবর্তী কালের ইতিহাসেও সে বিষয়ে বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

ওমরের মৃত্যুর তিন শতাব্দী পরে ইবনে খালদুনের উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পারস্যের সীমা ছেড়ে ওমরের

বিজ্ঞান প্রতিভার খ্যাতি পশ্চিমের স্পেনেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভার প্রতি পণ্ডিত সমাজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার অন্য বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় হাজী খলিফার ফিহরিস্ত গ্রন্থে। হাজী খলিফা ফিহরিস্তে অপক্ষপাত ভাবে সমস্ত মনীষী, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। সবারই কাজের পরিচয় দেওয়াই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই প্রত্যেকের কাজেরই শুধু দরকারী কতকগুলো বিষয়ই তিনি তাঁর ফিহরিস্তে উধৃত করেছেন এবং প্রায় প্রত্যেকের বেলায়ই দুচার কথাতেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। ওমরের বেলায় এসে কিন্তু তিনি তাঁর স্বল্পলিখ স্বভাবকে ঠিক রাখতে পারেন নাই। ওমরের বিজ্ঞান গ্রন্থ বিশেষত বীজগণিত থেকে প্রচুরভাবে ফিহরিস্তে উধৃত করেছেন। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক হামিদুল্লা মুস্তোফি তাঁর তারিখ-ই-গুজিদাতে ওমর খৈয়ামকে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ওমর খৈয়াম গণিতশাস্ত্রে বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছিলেন স'বশেষ পারদর্শী। জামাল উদ্দিন কিফতী তাঁর "তাওয়ারিখুল হুকামা"তেও ওমর খৈয়ামকে সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে উল্লেখ করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্য একখানা ইতিহাস "ফেরদৌস অততাওয়ারিখে" ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে এমনি উল্লেখ দেখা যায়। সেখানেও তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিক বলেই অভিহিত করা হয়েছে। এমনিভাবে প্রায় সমস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থেই ওমর খৈয়ামকে বৈজ্ঞানিক হিসাবেই পাওয়া

যায়। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, গণিতশাস্ত্রে বিশেষত বীজগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্বত্রই ঘোষিত হয়েছে। এ সবে কাব্য ও কবিত্ব বিজ্ঞানের প্রতিভায় নিষ্প্রভ হয়ে লোক চক্ষুর অগোচরেই ডুবে গেছে।

৪৯০ হিজরীতে (১০১৯ খৃঃ অব্দ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে ওমরের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল গিয়াছউদ্দিন আবুল ফতেহ ওমর ইবনে ইবরাহিম আলখৈয়ামী। গিয়াসউদ্দিন অর্থ হোল বিশ্বাস আশ্রয়ী। এ উপাধি তাঁর দেশবাসীই তাঁকে প্রদান করেন কিন্তু এ তাঁর ধর্মের অনুরক্তির জন্য না অন্য কোন কারণে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু জানা যায় না। তাঁর উপর গোঁড়া সুফীদের আক্রোশ দেখে মনে হয় এ উপাধির কারণ হোল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। আলখৈয়ামী হোল তাঁর ভনিতা—এর অর্থ হোল তাঁবু নির্মাতা। এ তাঁর নিজস্ব ব্যবসায়ের পরিচায়ক কি তাঁর কৌলিক ব্যবসায়ের পরিচায়ক সে বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রবাদ কবির পিতা বস্ত্র বয়নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন পরে তিনি বস্ত্রবয়ন ত্যাগ করে তাঁবু নির্মাতার কাজ সুরু করেন এবং সেই থেকেই খৈয়ামী বা তাঁবু নির্মাতা নামে অভিহিত হতেন। কারুর কারুর মতে কবিও পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করেন তবে কবির প্রাচীন চরিতাভিধানে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। খুব সম্ভব এটিও তিনি রূপক হিসাবেই ব্যবহার করেছিলেন।

ওমরের জন্মস্থান নিশাপুর নানা বিষয়েই একাদশ শতাব্দীতে

পারস্যের মধ্যে এক অভিনব স্থান অধিকার করে। এমনিতে এ পারস্যের অন্যতম প্রাচীন সহর। পিসদাদিয়ান নৃপতি শাহ তামুরস্ প্রথমে এর প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তখন এর নাম নিশাপুর হয় নি। তামুরস কর্তৃক নির্মিত হবার কিছুদিন পর এ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। কিছুকাল পরে পুনরায় পারস্যের শাহ আরদ্‌শির বাপাকান এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর নাম করেন "নি" বা সহর। তাঁর পুত্র শাহপুর খোরাসানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পিতার অনুমতি ক্রমে নিজের নামও এর সঙ্গে যোগ করে দেন, তখন থেকেই এ নিশাপুর নামে অভিহিত হয়ে আসছে। নিশাপুরকে বলা চলে প্রকৃতির রম্যভূমি। তার গোলাব কুঞ্জ, সুরভি কানন, থরে থরে সাজান নদনদী, গিরি বন, কবি প্রাণকে আকুলিত করে তোলে, কাব্যের সহস্র মন্দাকিনী এখানে বয়ে যায়, লোকও হয় তাই সাধারণত কবি প্রকৃতির। কিন্তু শুধু কাব্যই নয়, দর্শন বিজ্ঞান কোন কিছুই এর অঙ্গন থেকে বাদ পড়ে নাই। অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা, একে উজ্জল মহিমময় করে তুলেছিল। নিশাপুর যত কবি, সাহিত্যিক, ও বৈজ্ঞানিকের জন্মস্থান হিসাবে গৌরব করতে পারে, পারস্যের অন্য কোন স্থান একক ভাবে তেমন গৌরবের দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ। মহাকবি ফেরদৌসী, আনওয়ারী, ফেরদৌসীর সাহিত্যগুরু কবি আসাদী, সুফী কবি ফরিদউদ্দিন আত্তার, কবি নিজামই আসিরী, কবি সাহিত্যিক নিজামই আরুজী, কবি রফিই নিশাপুরী,

জ্যোতির্বিদ হাকিমি মওসিলি, দূরবীক্ষণ আবিষ্কারক হাসান, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ হাসান ইবনে ইসহাক্‌, দার্শনিক ধর্মগুরু ইমাম গাজ্জালি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য সমালোচক আলবয়হকী, দার্শনিক ও দার্শনিকগণের বিবরণী লেখক আস্‌শহরস্তানী, প্রভৃতি অসংখ্য মনীষী জন্মগ্রহণ করে খোরাসান ও তার রাজধানী নিশাপুরকে চির গৌরবান্বিত করে 'প্রতিভার সূতিকাগার' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে গেছেন। এমনি স্থানে জন্মগ্রহণ করে ওমর খৈয়ামও যে জগৎ বরেন্য মনীষীর স্থান লাভ করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ওমরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অন্যান্য মনীষীদের মত এও রয়েছে অন্ধকারে ঢাকা। তাঁর পিতা ছিলেন মধ্যবিত্ত অবস্থার। কিন্তু আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না হোলেও পুত্রের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। তিনি পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন ত্রুটি ঢুকতে দেন নাই, তাই আর্থিক অস্বচ্ছলতা স্বত্বেও তিনি ওমরকে নিশাপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

ইমাম মওফিকউদ্দিনের অধীনে ওমরের শিক্ষা সুরু হয়। মওফিকউদ্দিনের ছিল তখন পারস্যের জ্ঞান জগতে অপরিসীম প্রভাব। তাঁর কাছে যে কোরাণ, হাদিস, তফসির শিখবে সেই উত্তরকালে সুবিখ্যাত ও সর্বজন বরেন্য হয়ে দাঁড়াবে—পারস্যের জন সাধারনের মনে এ ধারনা সংস্কারের মতই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যের বেলায় এ ধারনা কতটা সত্য হয়েছিল সে

ইতিহাসের গবেষণার বিষয় কিন্তু ওমরের বেলায় এযে বিশেষ. মিথ্যা হয় নাই, সে দেখা যায় তাঁর কার্যকলাপেই। ওমর ইমাম মওফিকউদ্দিনের বিদ্যালয়ে কোরাণ হাদিসও ফেকাহ অধ্যয়ন করেন। একটি বিষয় কিন্তু খুবই আশ্চর্যের মনে হয়। ইমাম মওফিকউদ্দিনের নিকট যখন তিনি অধ্যয়ন সুরু করেন তখন তাঁর বয়স তেইশ বৎসর। এর পূর্বে তিনি কোথায় অধ্যয়ন করেছিলেন সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

ওমর ছয় বৎসর কাল এখানে অধ্যয়ন করেন। এই ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও স্থানীয় মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দর্শন গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী বলে বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং "হুজ্জতুল হক" (সত্য প্রমাণকারী) উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু অধ্যয়ন সমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিকূল পার্থিব অবস্থা তাঁকে ঘিরে ধরে। এতদিন যে স্নেহচ্ছায়ায় পার্থিব চিন্তা থেকে দূরে থেকে তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করছিলেন এতদিনে তার অবসান হয়। শিক্ষা সমাপন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পরেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দারিদ্র্যের করাল মূর্তি তাঁর সম্মুখে এসে দেখা দেয়।

তখনকার দিনে দর্শন (Philosophy) অন্যতম বিশিষ্ট বিষয় বলেই গণণীয় হোত। ওমর খৈয়ামও বিশিষ্ট দার্শনিক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য দর্শনের অধ্যাপনা সুরু করেন। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি থাকলেও,

অধ্যাপনায় এ খ্যাতি তাঁর কোন কাজেই আসে নাই এবং জীবিকা নির্বাহের পথেও কোন সহায়তা করতে পারে নাই। ফলে বৈজ্ঞানিক কঠোর সমস্যায় পতিত হন। জ্ঞানবিজ্ঞান, গবেষণার পথ ত্যাগ করে অন্যভাবে অর্থোপার্জন করার চিন্তাও তাঁর মনে জেগে উঠে। বিজ্ঞানী মন আপনিই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। এই দোদুল্যমান সমস্যায় একজন সদাশয় গুণগ্রাহী আমীরের স্বতপ্রবৃত্ত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তাঁর বিজ্ঞানী মনকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। এই গুণগ্রাহী হোলেন আবুতাহির। এমনিতে আবুতাহিরের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

দারিদ্র্যের নিষ্করুণ পেষণ থেকে রক্ষা করে প্রতিভাকে নিজপথে অগ্রসর হতে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের নিজের প্রতিভা থাক বা না থাক জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁরাও অমর হয়ে থাকেন। ওমরের পৃষ্ঠপোষক আবুতাহির যতই অপরিচয়ের অন্তরালে থেকে যান না কেন, ওমরের প্রতিভাই তাঁকে দুনিয়ায় চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ম্যাসিনাস যেমন কবি ভার্জিলের ভার্জিলত্ব প্রকাশ পেতে সাহায্য করে দুনিয়ায় অমর হয়ে রয়েছেন, আবুতাহিরও তেমনি ওমরের ওমরত্ব প্রকাশ পেতে সাহায্য করে পৃথিবীর কৃতজ্ঞভাজন হয়ে রয়েছেন। এই বন্ধুত্বের পর থেকেই ওমর দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। তিনি নিশ্চিন্ত মনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হন।

আমীর আবুতাহির ওমরকে শুধু অর্থ সাহায্য করেই ক্ষান্ত

হন নাই ওমরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যাতে সত্যি সত্যি উপযুক্ত আদর হয় তিনি তারও চেষ্টা করেন। মালিকশাহের মন্ত্রী নিজামউলমুলক্ ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই ওমরের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা মন্ত্রীকেও বলেন এবং ওমরকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মন্ত্রী নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক, তাই ওমরের আদর হতে দেরী হয় না। মন্ত্রীও আবুতাহিরের মত ওমরকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেন। এমনি ভাবেই দরিদ্র ওমর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বন্ধুতে পরিণত হন।

ওমর খৈয়াম ও প্রধান মন্ত্রী নিজাম উলমুলকের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রসিদ উদ্দিন অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে ওমর খৈয়াম, নিজামউলমুলক্ হাসান আলী ইবনে ইসহাক এবং হাসান ইবনে সাববা নিশাপুর বিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। তিনজনের মধ্যে অগাধ ভালবাসা ছিল। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই তিনজন প্রতিজ্ঞা করেন যে উত্তরকালে যে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী হবে সে অন্য দুইজনকে জীবনযাত্রার পথে সহায়তা করবে। হাসান আলী ইবনে ইসহাক কালক্রমে যখন রাজমন্ত্রী হন, তখন পূর্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করেই ওমর খৈয়ামের গবেষণার জন্য খোরাসানের রাজসরকার থেকে বার্ষিক ১২০ মোহর বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন। ওমর খৈয়াম নিশাপুরে থেকেই এই বৃত্তি পেতেন এবং এতেই তাঁর জীবন যাত্রা নির্বাহ হত।

'অধ্যাপক ব্রাউনের মতে এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। যা হোক যেমন ভাবেই ওমর নিজামউলমুলকের সহায়তা পেয়ে থাকুন না কেন এর পরেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়।

এর কিছুদিন পরেই ওমর তাঁর বীজগণিত গ্রন্থ 'আলজাবর' প্রকাশ করেন। আবুতাহিরের সাহায্যের কথা তিনি ভুলেন নাই। এইবার অর্থহীন সাহিত্যিকের যা একমাত্র উপায় সেইভাবেই তিনি আমীরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আবুতাহিরের নামেই উৎসর্গ করেন। গ্রন্থের একখণ্ড মন্ত্রী নিজামউলমুলকেও উপহার প্রদান করেন। মন্ত্রী এই নব প্রকাশিত গ্রন্থে ওমরের অসাধারণ অধ্যবসায়, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও অভূতপূর্ব গবেষণার পরিচয় পেয়ে বিশেষ মুগ্ধ হন। এমনি পাণ্ডিত্য অবহেলিত হয়ে থাকবে তাঁর সাহিত্যিক মন একথা মেনে নিতে পারে নাই। ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভা যাতে যথাযোগ্য রাজসম্মানে ভূষিত ও পুরস্কৃত হয় সেজন্য তিনি ওমরের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা মালিক শাহেরও কর্ণগোচর করেন। সুলতানও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। তিনি ওমরকে দরবারে আনয়নের জন্য আদেশ দেন। সুলতানের আদেশ প্রতিপালিত হতে দেরী হয় না। ওমর তখন তাঁর নিশাপুরের পর্ণকুটীরে দীন জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর অদৃষ্টে যে রাজকীয় কোন সাহায্য কোনদিনও আসতে পারে সে কথা হয়ত তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। রাজদূতের মুখে আদেশ পেয়ে ওমর যথাসময়ে রাজ দরবারে উপস্থিত হন

সুলতান তাঁকে বিদ্বান পরিষদের অন্যতম সদস্যরূপে নিযুক্ত করেন। ওমরের দুঃখ ও দারিদ্র্যের অবসান হয়। তিনি নিশাপুরের পর্ণকুটীর ত্যাগ করে রাজধানী মারভ নগরে বসবাস স্থাপন করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি মুনাজ্জিম-ই-শাহীর (রাজজ্যোতিষী) উচ্চপদে উন্নীত হন। শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারুর প্রতিভা স্বীকৃত না হোলে সাধারণত তাঁর প্রতিভার কদর হয় না; অন্তত বাইরের লোক তাঁকে কদর দেখাতে রাজী হয় না। এই পদ প্রাপ্তির অনেক পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর তেমন আদর হয় নাই; এর পর থেকেই তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা সত্যিকার মর্যাদা পেতে থাকে।

রাজ দরবারে স্থান পাওয়ার পর ওমরের জীবনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই বলেই মনে হয়। এর পর শুধু বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য আলোচনা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজেই তাঁর সদানন্দ জীবন অতিবাহিত হত। আলজাবর প্রণয়নের পর তিনি হান্দাসা (জ্যামিতি) মসাহাবা (পরিমিতি) এবং ত্রিকোণমিতির কঠিন উপসিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে টীকা রচনা করেন এবং কিছুদিন পরে শুদ্ধ অঙ্কের বর্গমূল ও ঘণমূল বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এমনিভাবে একের পর এক বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে— লোকেও তাঁর অনন্য সাধারন প্রতিভার পরিচয় পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি আবুআলি সিনার অবতার বলে সাধারনের মধ্যে পরিচিত হয়ে পড়েন।

যতদূর জানা যায় ৫১৭ হিজরীতে (১১২৩-২৪ খৃঃ অব্দ) ওমর খৈয়ামের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুতারিখ নিয়েও বেশ মতভেদ দেখা যায়। অধ্যাপক ব্রাউন এ তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান। তাঁর মতে ১১১০-১১৩৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ওমরের মৃত্যু ঘটে থাকবে এবং খুব সম্ভব ১১৩৫ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়েই তাঁর মৃত্যু ঘটে ছিল। ওমরের মৃত্যুও তাঁর কবি প্রতিভার মতই আশ্চর্যজনক বলতে হবে। মৃত্যু বিবরণ থেকে মনে হয় জ্যোতিষী যেন নিজের মৃত্যুর দিন ও সময়ের কথা অনেক পূর্বে থেকেই জেনে রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক শাহরজুরীর বিবরণ থেকেই এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি হবে।

"একদিন ওমর খৈয়াম আবু আলি সিনার দার্শনিক গ্রন্থ "কিতাবুস শীফা" অধ্যয়ন করছিলেন। গ্রন্থের যে অধ্যায়ে "ওহাদৎ কসরত" আলোচিত হয়েছে, সেই অধ্যায়টি পড়তে পড়তে তিনি পাতার মধ্যে সোনার দাঁতকাঠি রেখে উঠে দাঁড়ান। তখন মগরেবের সময়, তিনি নামাজ পড়া স্থুরু করেন। সেদিন তিনি রোজাও রেখেছিলেন। যে কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে তিনি নামাজ পড়ছিলেন তাতেই রুকু অবস্থাতেই তিনি সহসা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন 'খোদা যথাসাধ্য আমি তোমাকেই চেয়েছি। আজ এই ভিক্ষা জানিয়ে আত্মনিবেদন করছি যেন তোমার করুণা ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত না হই'। এর পর আর তাঁর নত মস্তক উন্নত হয় নাই।"

ঐতিহাসিকের এ বিবরণের মূলে রয়েছে ওমরের ছাত্র ইমাম মোহাম্মদের প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ। ইমাম মোহাম্মদের বর্ণনাও অনুরূপই। তাঁর বর্ণনাও এখানে উধৃত করা গেল "ওমর খৈয়াম আবু সিনার দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। গ্রন্থের "ওহাদৎ কসরত" অধ্যায় পড়তে পড়তে তিনি পাতার মধ্যে একটা জিনিষ রেখে আমাকে বললেন "সকলকে ডেকে আন আমি শেষ উপদেশ দিয়ে যাই"। আদেশমত আমরা সকল ছাত্র একত্রিত হয়ে তাঁকে ঘিরে বসলুম। কিন্তু তিনি যেন আমাদের কথা ভুলে গিয়ে নামাজ পড়া স্থুরু করলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি সেজদাতে যেয়ে বলতে লাগলেন "খোদা যথাসাধ্য আমি তোমাকে খুঁজেছি আমার সে অক্ষম অন্বেষণ ক্ষমা কর। তোমাকে যে চেয়েছি সেই জন্যেই আমার সকল ত্রুটি সকল অপরাধ মাফ করে দাও। আমি আজ তোমাতেই আত্মনিবেদন করছি" এই কথাগুলো বলতে বলতেই তিনি সেজদা দেন। এর পর আর তাঁর জ্ঞান হয় নাই।

এই বিবরণের মূলে যে সত্য আছে তাতে সন্দেহ করবার কোন বৈধ কারণই নাই। এটি দেশদেশান্তরের বিভিন্ন ভাষায় আজ প্রামাণ্য বলেই গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ওমরের রুবাইয়াত তাঁর নাস্তিকতার যত বড় অখণ্ডনীয় প্রমাণই দেখাক না কেন এযে তাঁর সময়ে জনসাধারনের মনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই, তার অন্যতম

প্রমাণ হিসাবে তাঁর জানাজার নামাজের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি হাফেজের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্যে ধর্মদ্রোহী ভাব আছে বলে অনেকেই তাঁর জানাজার নামাজ পড়তে অস্বীকার করেন। কিন্তু ওমরের বেলায় এমন কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নাই। এ বিষয়ে তাঁকে হাফেজের চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যবানই বলতে হবে।

ওমরের সর্বতোমুখী প্রতিভা শুধু সেকালেরই নয় একালেরও বিস্ময়। তাঁর কাব্য আনন্দরসের খোরাক যোগায়, দর্শন দার্শনিকদিগকে ভাবিয়ে তোলে; আবার বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার বিজ্ঞানের ছাত্রদের মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে। একাধারে এমনি সর্ববিদ্যাবিশারদ যে কোন যুগেরই গৌরব। আলবেরুনী, ইবনে সিনার মত তিনিও মনীষার অবতার হিসাবেই তখন পূজিত হতেন। আলবেরুনীর মত দেশবিদেশ ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু তিনি আলবেরুনীর মতই নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আলবেরুনী গ্রীকভাষা জানতেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু ওমরের বিষয়ে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। ঐতিহাসিক জামালউদ্দীন কিফতি তাঁর "তারিখুল হুকামাতে" ওমরের গ্রীক ভাষার উপর অবাধ অধিকারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে ওমর শুধু নিজেই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি নিজের দেশবাসীকেও বিশেষ উপকারী বলে গ্রীকপদ্ধতি অনুসরণ করতে

উপদেশ দিতেন। "আকবরুল উলেমাতে"ও ওমরের গ্রীকভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। আরবী পারসীর উপর তাঁর অগাধ অধিকারের প্রমাণ তাঁর সাহিত্যগ্রন্থ। এমনি ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে জুটেছিল তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি। ওমরের স্মরণশক্তির কথা পারস্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে পড়ে। "নুজহতুল আরওয়াতে" প্রদত্ত বিবরণী থেকে তাঁর স্মরণ শক্তির প্রখরতা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যেতে পারে। একবার ইস্পাহানে অবস্থানকালে ওমর খৈয়াম একখানি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে এত মুগ্ধ হন যে উপর্যুপরি ঐ গ্রন্থখানি সাতবার পাঠ করেন। এতেই গ্রন্থখানি তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। ইস্পাহান থেকে নিশাপুরে ফিরে এসে তিনি কোন শিষ্যকে পুস্তকখানির শ্রুতিলিপি দেন। মূল পুস্তকের সঙ্গে ওমরের প্রদত্ত শ্রুতলিখনে সামান্যই গরমিল দেখতে পাওয়া যায়।

ওমরের অলৌকিক প্রতিভা যে তাঁর সময়কার পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট করেছিল তার অন্যতম প্রমান পাওয়া যায় চরিতাভিধানকার সৈয়দ আলী বিন মোহাম্মদ আল হুসেনীর "বাজমারাই" গ্রন্থে। গ্রন্থকারের ভাষায় "ওমর এরূপ অনন্য সাধারন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন যে তাঁকে অকুতোভয়ে জ্ঞানআকাশের ধ্রুব নক্ষত্র, জ্ঞান সমুদ্রের মুক্তারূপে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখান যেতে পারে। পারস্যের পণ্ডিত সমাজ তাঁর ক্রীতদাস ছিল। তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এক বাক্যে ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আরবী বিদ্বানগণও

একবাক্যে ওমর খৈয়ামকে অদ্বিতীয় জ্ঞানীরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। তিনি এরূপ মনীষাসম্পন্ন ছিলেন যে গ্রীক মনীষী ইউক্লিডকেও জ্ঞানের উৎকর্ষে অতিক্রম করেছিলেন; তাঁর প্রতিভার নিকট এরিষ্টটলের প্রতিভাও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে।"

"নুজহতুল আরওয়া" গ্রন্থে ওমরের সঙ্গে আলগাজ্জালীর কথোপকথনের বিবরণ ওমরের প্রতি তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রদ্ধার প্রমান হিসাবে উত্থাপন করা যেতে পারে। আলগাজ্জালী ওমরকে আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রশ্ন শুনে ওমর প্রথমে জানান যে তিনি তাঁর "এরাইয়াস্নুন নফিসা" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন, আলগাজ্জালী যদি সেই পুস্তকখানি পাঠ করেন তা হোলেই জানতে পারবেন। গাজ্জালী কিন্তু তখনই তাঁকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করবার জন্য অনুরোধ জানান এবং ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ এক প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে পৃথকভাবে জানা কিরূপে সম্ভব?" ওমর গাজ্জালীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তখনই ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। দ্বিপ্রহর থেকে অপরাহ্ন আছরের নামাজ পর্যন্ত এ ব্যাখ্যা শেষ হয় নাই। আলগাজ্জালী মুগ্ধ চিত্তে ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন এবং উঠবার সময় বলেন "সত্যমূর্তির দর্শন পেয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করলুম। মিথ্যা যবনিকা অপসারিত হয়েছে। পূর্বে আমার যে ধারণা

ছিল সেই মিথ্যা, সত্যসাধক ওমরের ব্যাখ্যায় সত্য প্রকাশিত হয়েছে।"

তাঁর এই অনন্যসাধারন প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্যে তিনি যে শুধু জন সাধারনের নিকটেই যুগ মানবরূপে শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন তা নয়, দেশের সুলতান, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাতেন। সুলতান মালিকশাহের দরবারে বিদ্বান পারিষদ ও মুনাজ্জিম-ই-শাহী হিসাবে নিযুক্ত থাকলেও সুলতানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর নর্ম সখা ছিলেন। মালিকশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সঞ্জরও ওমরের প্রতি পিতার মতই শ্রদ্ধা দেখাতেন। তিনি সিংহাসনের দক্ষিণ পাশে বৈজ্ঞানিকের আসন নির্দেশ করে দেন। বোখারার শাসনকর্তা খাকান শামস্ উলমুলকও ওমর খৈয়ামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও সঞ্জরের মতই সিংহাসনের পাশেই বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করে দেন।

ওমরের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্য যখন রুবাইয়াতের বন্দীশালায় গুমরিয়ে মরছিল, তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা তখন সমস্ত জগতে তাঁর কীর্তি কাহিনী বিঘোষিত করছিল। ইউরোপের অজ্ঞান কুয়াসা যখন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে, ধর্মোন্মাদনা যখন মুষল হস্তেও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির পথ আটকিয়ে রাখতে পারছে না, সেই রিনাসাঁর যুগে অন্যান্য মনীষীদের জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ওমরের গ্রন্থাবলীও বিজ্ঞান জগতে এক নুতন উন্মাদনা এনে দেয়। আবুল ওয়াফা, আলকারখি প্রভৃতির বীজগণিতের সঙ্গে

ওমরের বীজগণিতও অবশ্য পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়। তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনাও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নূতন পথ প্রদর্শন করে।

বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। এ হস্তক্ষেপ শুধু শিক্ষকের শিক্ষা দান প্রবৃত্তির পরিচয় নয় এ অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের হস্তক্ষেপ। সমস্ত জিনিসকে ভাল করে জানবার এবং জানাবার প্রবৃত্তিই ওমরকে বিজ্ঞানের সর্বশাখায় হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহান্বিত করে তোলে। এ আগ্রহের ফলে তিনি সর্ব বিষয়েই প্রায় সমান অধিকার লাভ করেন, যদিও সবগুলিতে তাঁর সমান স্নেহদৃষ্টি পড়ে নাই। চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং গণিত, বিজ্ঞানের এই চার শাখাতেই ওমরের অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে এর মধ্যে গণিতই তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ওমরের যে গ্রন্থগুলি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এক রুবাইয়াত নিয়েই ইদানীং বিশেষ আলোচনা হয়েছে। অনেকে হাত দেবার পর এ এখন স্বরূপে এসে দাঁড়িয়েছে বলা চলে। ওমরের রুবাইয়াত বলে প্রায় পাঁচ হাজার রুবাইয়াত একের পর এক জমা হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশই অজ্ঞাতনামা লেখকের বা কবি খ্যাতি প্রয়াসীর রুবাইয়াত বলে ধরা পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় বিজ্ঞানের গ্রন্থের মধ্যে এমনি কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতনামা খ্যাতি প্রয়াসীর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায় না। ছন্দগাথা কাব্য বা রুবাইয়াত রচনা করা, অনেকের পক্ষেই বিশেষ করে

মন মাতান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ঘেরা ইরানের অধিবাসীদের পক্ষে হয়ত অনেকটা সহজ সাধ্য, কিন্তু বিজ্ঞানের কঠোর সত্য আবিষ্কার করা বা যুক্তিজাল বিস্তার করে তাকে রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা তত সহজসাধ্য নয় বলেই বোধ হয় এদিকে কারুর নজর পড়ে নাই। সাধারনত বিজ্ঞান গ্রন্থে এমনি অযথা হস্তক্ষেপ বা প্রক্ষেপ না থাকার কারণও বোধ হয় এই। ওমরের রুবাইয়াত হিসাবে প্রচলিত রুবাইয়াত তাঁর সত্যিকার রুবাইয়াতের একশ গুণ ছাড়িয়ে গেলেও বিজ্ঞান গ্রন্থের কোন রদবদল হয় নাই, তবে নকলনবীশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাণ্ডুলিপির মধ্যে নানা অনৈক্য ও ভ্রম প্রমাদ প্রবেশ করেছে। আরবী ভাষার লিখনীর জড়তাও এই অনৈক্য ও ভ্রম প্রমাদের পথে সহায়তা করেছে বলা চলে।

ওমরের বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে বীজগণিতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যেতে পারে। এতে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানবুদ্ধি সম্পূর্ণ স্বপ্রনোদিতভাবে স্বাধীন পথে এগিয়ে গেছে কারুর আদেশ উপদেশের তোয়াক্কা না করেই, অন্য কারুর সাহায্য না নিয়েই। ফলে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান প্রতিভা এতে পূর্ণভাবে প্রকটিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

বীজগণিত গ্রন্থখানি দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ত্রিমাত্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনাগুলি একত্রিত করে নিলে একে ছয়টি বিশিষ্ট আলোচনায় পর্যবসিত বলা চলে। ১। মুখবন্ধ ও বীজগণিতের প্রাথমিক সংজ্ঞা সমূহের ব্যাখ্যা

সমেত ভূমিকা। ২। সরল (Binomial) এবং যৌগিক (Trinomial & Tetranomial) সমীকরণ সমেত যে সমস্ত সমীকরণের সমাধানের প্রস্তাবনা করা হয়েছে সেগুলির তালিকা ৩। প্রথম এবং দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের আঙ্কিক ও জ্যামিতিক সমাধান। ৪। কনিকসের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সমাধান। ৫। ভগ্নাংশীয় সমীকরণ (Fractional equations) সম্বন্ধে আলোচনা। ৬। আবুলজুদের কার্যের আলোচনা।

বীজগণিতের শুধু আঙ্কিক সমাধানের উপর মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ কোনদিনই জোর দেন নাই। এই আঙ্কিক সমাধানকে যে বাস্তবেও রূপ দেওয়া যেতে পারে জ্যামিতিক সমাধান দিয়ে তাঁরা সেও দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। মুসলিম বীজগণিত তাই জ্যামিতিক অঙ্কনে ভরপুর। ওমর খৈয়ামও এই পন্থাই অনুসরণ করেন। তিনি মুখবন্ধে বীজগণিতের সংজ্ঞা নির্দেশেই এর আভাস দিয়েছেন। তাঁর মতে বীজগণিতের সংজ্ঞা হোল "যে বিজ্ঞান আঙ্কিক এবং জ্যামিতিক অনির্দিষ্ট সংখ্যা বের করতে সাহায্য করে (The science that aims at the determination of numerical and geometrical unknowns)। শুধু সংজ্ঞা নির্দেশেই নয় তিনি গ্রন্থের সর্বত্র এই অনুসারে কাজ করবারও প্রয়াস পেয়েছেন। সর্বত্রই আঙ্কিক সমাধানের সঙ্গে জ্যামিতিক অঙ্কন দিয়ে জ্যামিতিক সমাধানও দেখিয়ে দিয়েছেন। এই জ্যামিতিক সমাধান প্রসঙ্গে

তিনি অনেক সময় এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছেন যে যেখানে জ্যামিতিক সমাধান দিয়ে আঙ্কিক সমাধানের পরিপোষণ না করা যায় বা ঠিক উল্টোভাবে আঙ্কিক সমাধান দিয়ে জ্যামিতিক সমাধান* প্রমাণিত না হয় সেখানে বীজগণিত-বিজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয় নাই বলে মত প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ত্রিমাত্রিক সমীকরণের বেলায় তিনি তাঁর এ মত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তবে সেখানেও তিনি নিজের প্রধান মতবাদে কোনরূপ পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ। এতে বীজগণিতিক প্রক্রিয়া কি ভাবে খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিকদিগকেও চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিমাত্রিক সমীকরণের বীজগণিতিক সমাধান সুন্দর সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় গণিতবিদ কারডাঁ (Cardan) এবং টারটাগালিয়া (Tartagalia) এর সমাধান করেন।

ওমর খৈয়ামের দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের সমাধানে নূতনত্ব

---

* Analytic Geometryর কল্পনা গণিত জগতে এই সর্বপ্রথম। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী সেনা গণিতবিদ (Soldier Mathematician) দে কার্টে (Des Cartes) এর পূর্ণ অবয়ব দান করেন। Cartesian Co-ordinateএ দে কার্টে অমরত্ব লাভ করেছেন —কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার চাপে পড়ে Analytic Geometry থেকে ওমর খৈয়ামের নাম লুপ্ত হয়ে গেছে।

বিশেষ কিছু নেই বলা চলে। আলখারেজমি যে পন্থার প্রবর্তন করেন, ওমরও তাঁর অনুসরণ করেন—তাতে বিশেষ কিছু উন্নতি করেছেন বলা চলে না। তবে তাঁর সমাধান ও অঙ্কন আলখারেজমির চেয়ে বহু উন্নত। আলখারেজমি মাত্র কয়েকটি সমীকরণের সমাধান করেন, সে হিসাবে তাঁর সমাধান প্রণালী অসম্পূর্ণ বলা চলে, কিন্তু ওমর খৈয়াম সমস্ত সমীকরণ নিয়েই আলোচনা করেন। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের মত ওমরও শুধু একটিমাত্র মূল (root) বের করেই ক্ষান্ত হয়েছেন negative বা imaginary root এর দিকে মন দেন নাই। যে সমস্ত সমীকরণের positive root পাওয়া যায় না সেগুলোর সমাধান অসম্ভব বলেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যবহৃত সমীকরণগুলির মধ্যে আলখারেজমির ব্যবহৃত সমীকরণও তিনি ব্যবহার করেছেন, তবে সমাধানের উপায়ের মধ্যে বহু রদবদল দেখিয়েছেন। যা হোক যতদূর সম্ভব পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থগুলি তিনি কাজে লাগিয়ে নিতে কসুর করেন নাই। আলখারেজমি, আলমাহানি, আবু জাফর আলখাজিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের নানা কাজের উল্লেখই তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক সমীকরণের আলোচনায় যে সমস্ত রাশি (term) ব্যবহার করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় কেন তিনি জ্যামিতিক অঙ্কনের উপর এত জোর দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর সংজ্ঞা নির্দেশই বীজগণিতের জ্যামিতিক অঙ্কন উদ্বুদ্ধ করে তোলে বলা চলে। তেমনি জ্যামিতিক সমস্যার বীজগণিতিক সমাধানও এর

অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ওমরের মতে আঙ্কিক সমাধান হোল সমস্যার সমাধান দ্বারা কোন অজ্ঞাত সংখ্যা বের করা— তবে সে অজ্ঞাত সংখ্যা হোল, অন্য জ্ঞাত সংখ্যাগুলির সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আবদ্ধ।

বর্তমানে সমীকরণগুলিকে যে ভাবে শক্তিমাত্রা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ওমরের পূর্বে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক তেমনভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন বলে জানা যায় না। ওমরই খুব সম্ভব সর্বপ্রথম সমীকরণগুলির শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতির অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে তবে ওমরের পদ্ধতির সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিকত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তিনি সাধারণত সমীকরণের জটিলতার উপর অর্থাৎ সমীকরণে কতগুলি terms জড়িত রয়েছে তার উপর নির্ভর করে সমীকরণগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বর্তমানে অনুসৃত পন্থার প্রথম গোড়াপত্তন দেখা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে।

ওমর প্রথমত সমীকরণগুলিকে সরল ও জটিল হিসাবে ভাগ করেছেন। তাঁর সরল সমীকরণ শক্তিমাত্রায় সরল নয়—যে সমস্ত সমীকরণে মাত্র দুইটি terms ব্যবহৃত হয়েছে সেইগুলিকেই তিনি সরল সমীকরণের শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন।

বর্তমানের প্রচলিত চিহ্ন অনুসারে এগুলিকে লেখা যাবে:—

(1) $a=x$ (2) $a=x^2$ (3) $a=x^3$ (4) $bx=x^2$
(5) $cx^2=x^3$ (6) $bx=x^3$

বৈজ্ঞানিক এর প্রত্যেকটির জন্য একটি আঙ্কিক সমাধান (numerical solution) বের করে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির জ্যামিতিক অঙ্কন দিয়ে তাঁর সমাধান পরিপূরণ করেছেন। তাঁর মতে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকগণ এই ছয় প্রকারের সমীকরণের মধ্যে মাত্র তিনপ্রকার সমীকরণের সমাধান করেছিলেন—সে সমাধানও খুব ছাড়াছাড়ি ভাবে। সেই তিনটি সমীকরণ হোল (1) $a=x$, (2) $a=x^2$ এবং (3) $bx=x^2$. এই তিনটি ছাড়া অন্য সবগুলিই বিশেষ করে ত্রিমাত্রিক সমীকরণ তাঁর নিজের উদ্ভাবনা।

জটিল সমীকরনগুলিকে তিনি আবার দুইভাগে ভাগ করেছেন—একটি হোল যেগুলি তিনটি terms বিশিষ্ট (Trinomial) অন্যটি হোল যেগুলি চারিটি terms বিশিষ্ট (Tetranomial)। শেষোক্তটিকে তিনি আবার আরও দুই ভাগে ভাগ করেছেন—একটি হোল যেখানে তিনটি termsএর সমষ্টি অন্য termএর সমান; অন্যটি হোল যেখানে দুইটি terms এর যোগফল অন্য দুইটি terms এর যোগফলের সমান। বলা বাহুল্য তাঁর পূর্বে এমনি চারিপাদবিশিষ্ট সমীকরণের শ্রেণীবিভাগ অন্য কেউই করেন নাই। বর্তমানে প্রচলিত চিহ্নাদি অনুসারে তাঁর শ্রেণীবিভাগকে নিম্নোক্তরূপে লেখা যাবে :—

(১) ত্রিপাদবিশিষ্ট দ্বিমাত্রিক সমীকরণ (Trinomial Quadratic Equation) (7) $x^2+bx=a$ (8) $x^2+a=bx$ (9) $bx+a=x^2$ ওমরের মতে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকগণ শুধু

জ্যামিতিক অঙ্কন দিয়েই এগুলির সমাধান করেছিলেন কিন্তু এ তাঁর পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ কার্যাবলীর সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তাঁর পূর্বেই আরব বৈজ্ঞানিকগণ এর আঙ্কিক সমাধান বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(২) যে সমস্ত ত্রিপাদ সমীকরণ (Trinomial Equation) দ্বিমাত্রিক সমীকরণে পর্যবসিত হয়। (10) $x^3+cx^2=bx$ (11) $x^3+bx=cx^2$ (12) $cx^2+bx=x^3$. গ্রন্থকারের মতে পূর্বেকার গণিতবিদগণ এই শ্রেণীর কোন সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই।

(৩) ত্রিপাদবিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক সমীকরণ (Trinomial Cubic Equation) এগুলি বর্তমান প্রচলিত চিহ্ন অনুসারে দাঁড়াবে—

(13) $x^3+bx=a$ (14) $x^3+a=bx$ (15) $bx+a=x^3$
(16) $x^3+cx^2=a$ (17) $x^3+a=cx^2$ (18) $cx^2+a=x^3$

ওমরের মতে এই শ্রেণীর সমীকরণের মধ্যে মাত্র (17) উদাহরণটি ($x^3+a=cx^2$) আলমাহানী এবং পরে আবু জাফর আলখাজিন আংশিকভাবে সমাধান করেন। কিন্তু তাঁর এ ধারণা ভুল। আবু জাফর আলখাজিন এর পূর্ণ সমাধান করেন।

(৪) চারিপাদবিশিষ্ট সমীকরণ (Tetranomial Equation) যে সমস্তগুলিতে তিনটির সমষ্টি চতুর্থ সংখ্যার সমান

(19) $x^3+cx^2+bx=a$ (20) $x^3+cx^2+a=bx$
(21) $x^3+bx+a=cx^2$ (22) $cx^2+bx+a=x^3$.

(৫) চারিপাদবিশিষ্ট সমীকরণ—যেগুলিতে দুইটি termsএর সমষ্টি অন্য দুইটি termsএর সমষ্টির সমান

(23) $x^3+cx^2=bx+a$ (24) $x^3+bx=cx^2+a$

(25) $x^3+a=cx^2+bx$

বৈজ্ঞানিকের মতে পূর্বেকার গণিতবিদগণ এগুলির মাত্র একটির সম্বন্ধেই কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন, অন্যগুলির সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করেন নাই।

এমনিভাবে সমীকরণগুলির শ্রেণীবিভাগ করে তবে বৈজ্ঞানিক বীজগণিতিক সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে ত্রিমাত্রিক সমীকরণের আঙ্কিক সমাধান অসম্ভব, তবে কনিক্‌সের সাহায্যে প্রত্যেক প্রকার সমীকরণের সমাধান দিতে তিনি সক্ষম। তাঁর গ্রন্থে দেখা যায় তিনি কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সমীকরণ নিয়ে কনিক্‌সের সাহায্যে তার সমাধান করেছেন। তারপর এই সমাধান পন্থাকে রদবদল করে অন্যগুলির বেলায়ও কাজে লাগিয়ে নিয়েছেন। অধিকন্তু সমাধান করবার পূর্বে তিনি প্রাথমিকভাবে কতকগুলি প্রমাণিত প্রতিজ্ঞা (Lemmas) ঠিক করে নিয়েছেন এবং পরে সেইগুলি ব্যবহার করেই সমাধান করেছেন।

দ্বিমাত্রিক সমীকরণের আঙ্কিক সমাধানের জন্য বিশেষ দরকারী বলে ওমর কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করেন, এবং সেই নিয়ম অনুসারেই সমাধান পন্থাও নির্ণয় করেন। তবে এই নিয়মের কতকগুলি গ্রীক গণিতবিদ ডাওফেন্টের গ্রন্থেও সন্ধান পাওয়া

যায়। ডাওফেণ্টের বীজগণিত কোন সময় আরব বিজ্ঞান জগতে প্রচারিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। উপেকের মতে আলখারেজমির সময় পর্যন্ত ডাওফেণ্টের গ্রন্থের আরবী অনুবাদ হয় নাই, তাই তাঁর বীজগণিতে ডাওফেণ্টের প্রভাব আছে বলে স্বীকার করা যায় না। তবে ওমর খৈয়ামের সময় এ আর পূর্বের মত অজ্ঞাতকুলশীলতার আবরণে ঢাকা পড়ে রয় নাই। যা হোক ওমর ডাওফেণ্টের নিয়মাবলী কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয় কিন্তু তাঁর ব্যবহার প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর সমীকরণগুলিও ডাওফেণ্টের সমীকরণের ধার ঘেঁসেও যায় নাই, এগুলি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

দ্বিমাত্রিক সমীকরণের সমাধান পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হোলে সমাধানের উপযুক্ত সমীকরণের সংখ্যা হয়ে পড়ে অত্যন্ত নগণ্য। তা ছাড়া সমীকরণের সমাধান যেখানে পূর্ণ সংখ্যায় পর্যবসিত হয় সেখানে $x^2+bx=a$ জাতীয় অনির্দেশীয় (indeterminate) সমীকরণের আলোচনাও না হয়ে পারে না। সাধারন ভাবে যেখানে ধ্রুবক সংখ্যা (constants) সম্পূর্ণ সাধারন, সেখানে সমীকরণের ফল পূর্ণ সংখ্যায় পেতে হোলে, দরকারী নিয়মসমূহ নির্ণয়ও সাধারন সমস্যার উপর নির্ভর করেই করতে হবে। ওমরও তাঁর আঙ্কিক সমাধান পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রচেষ্ট হন, এতেই Indeterminate বীজগণিতও তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে এসে পড়ে।

বৈজ্ঞানিকের আঙ্কিক সমাধান বর্তমানের অনুসৃত পন্থাতে

দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হোল বর্তমানে সমীকরণের বীজগণিতিক সমাধান সাধারনভাবে যেমন বীজগণিতে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়টি হোল যে অবস্থায় সহগের আপেক্ষক (Function of the co-efficient) একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে সেই অবস্থা নির্ণয় করা। এই সহগের আপেক্ষক ($\sqrt{a+(b/2)^2}$) জাতীয় অনির্দিষ্ট সংখ্যা। ওমরের মতে যেখানে প্রস্তাবিত সমীকরণের সহগ ঠিক এই অবস্থা অনুযায়ী হবে সেখানে আঙ্কিক সমাধান সম্ভবপর অন্যথায় সম্ভবপর নয়। তবে জ্যামিতিক সমাধানে এমনি কোন ধরাবাঁধা নিয়মের দরকার হয় না।

দ্বিমাত্রিক সমীকরণ ওমরের হাতে বিশেষ কোন উন্নতি লাভ না করলেও ত্রিমাত্রিক সমীকরণ তাঁর হাতে পেয়েছে নবজীবন। বস্তুত ওমরের বিজ্ঞান প্রতিভা ত্রিমাত্রিক সমীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে পরিগণিত হতেন। কনিকস গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত হোলেও একে যে গণিতের অন্যান্য শাখায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বোধ হয় তাঁরা কোন দিন ভাবতেও পারেন নাই। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণই সর্বপ্রথম বীজগণিতে এর ব্যবহার দেখান। ওমর খৈয়াম এর ব্যবহারে পূর্বেকার আরব বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ করেন। ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সমাধানে তিনি একে যেমনভাবে কাজে লাগিয়ে নিয়েছেন, তাঁর পূর্বে এর তেমন ব্যবহার দেখা যায় না। এখানে একটি কথা বলে রাখা যেতে পারে। ত্রিমাত্রিক সমীকরণ কার প্রথম উদ্ভাবনা সে এখনও নিশ্চিতভাবে স্থির হয় নাই।

গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ ত্রিমাত্রিক সমীকরণের বিষয় ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁদের জ্যামিতিক কার্যাবলীর মধ্যে এমনি সমীকরণের আভাস পাওয়া গেলেও, এ বীজগণিতিক সমীকরণরূপে কোন'দিনই গড়ে উঠে নাই। বস্তুত গ্রীক জ্যামিতির মধ্যে বীজগণিতের কোন আভাসই পাওয়া যায় না।

ওমর ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সম্পূর্ণ একটি তালিকা করে শ্রেণী বিভাগ করে নিয়েছেন। তাঁর এই শ্রেণী বিভাগ সেই সময়োপযোগী বীজগণিতিক আকারের হোলেও বর্তমানের বীজগণিতিক সমাধানের মত তিনি কোন বীজগণিতিক সমাধান করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর গ্রন্থে শুধু জ্যামিতি বা কনিকসের কথাই বলেছেন। যা হোক আলমাহানীর প্রচেষ্টা এবং পরে আলখাজিনের সমাধানই ওমরকেও পথ দেখিয়ে দেয় বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবার, বৈজ্ঞানিকদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার ভারই যেন তাঁর উপরে পড়ে। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের অসাফল্যই যেন তাঁকে আরও উদ্দীপিত করে তোলে—গ্রন্থের ভূমিকা থেকেও সেই কথাই মনে হয়। তাঁর ভূমিকার কিয়দংশ এখানে উধৃত করা গেল ঃ—"আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলমাহানী সর্বপ্রথম আর্কিমেডিসের দ্বিতীয় গ্রন্থের চতুর্থ উপপাদ্যে প্রস্তাবিত গোলক (sphere) এবং স্তম্ভক (cylinder) সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেন এবং এতেই

দ্বিমাত্রা ত্রিমাত্রা এবং বহু সংখ্যাযুক্ত একটি সমীকরণের উদ্ভব হয়ে পড়ে। তিনি এ সমীকরণের সমাধান করতে সক্ষম না হয়ে একে অসম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। অবশেষে আবু জাফর আলখাজিন কনিকসের সাহায্যে এর সমাধান করেন। আবু জাফরের পরবর্তী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ অনুরূপ আরও কয়েকটি সমীকরণের সম্মুখীন হন। কেউ কেউ এর কতক কতক সমাধানও করেন। তবে কেউই এই ধরনের সবগুলি সমীকরণের শ্রেণী বিভাগ করে তালিকা গঠন করতে বা সেগুলির সমাধান করতে সক্ষম হন নাই বা পরে বর্ণিত দুইটি ব্যতীত অন্য শ্রেণীর উপপাদ্যের ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হন নাই। প্রত্যেক শ্রেণীর সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করবার আগ্রহ আমার পুরামাত্রায় বর্তমান। প্রত্যেক শ্রেণীর যেগুলির সমাধান সম্ভবপর সেগুলিকে আমি বাছাই করে নিয়েছি, কেননা জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য এগুলি যে কত দরকারী সে আমার ভালভাবেই জানা আছে। যা হোক আমি এটিকে সম্পূর্ণ করবার মত সময় এবং অবসর পাই নাই এবং নানা বাধা বিঘ্নের জন্য এর দিকে গভীরভাবে মনোযোগও দিতে পারি নাই। আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের খুবই অভাব। বাধা বিঘ্ন যত বেশী, লোকের সংখ্যা তত কম। গভীরভাবে তথ্যানুসন্ধান করা, কি সত্য ঘটনা উদ্ভাবন করবার মত অবসর তাঁদের খুবই কম। আমাদের অনেক সহযোগীই নকল বৈজ্ঞানিক, তাঁরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে ফেলতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না, পাণ্ডিত্যাভিমান ও প্রতারণা করতে

তাঁদের একটুও বাধে না। বিজ্ঞানের তাঁরা যে সামান্য একটুও জানেন, সেইটুকুই নীচ পার্থিব কাজের জন্য লাগিয়ে নিচ্ছেন। যখন তাঁরা কোন সত্যানুসন্ধানী, সৎ লোককে বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রবঞ্চনার পথ এড়িয়ে, মিথ্যা এবং অসৎকাজ পরিত্যাগ করে, সৎপথে চলতে দেখেন তখন তাঁরা তাঁর প্রতি উপহাস করেন এবং তাঁকে ঘৃণা করা সুরু করেন। সব অবস্থাতেই আমরা আল্লার শরণাপন্ন হচ্ছি।"

ওমরের ত্রিমাত্রিক সমীকরণ গঠনের প্রকৃতি এবং সমাধানের পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি প্রথমত দরকারী চিত্রটি অঙ্কন করে নিয়ে কাজ সুরু করেন, তারপর তাঁর উপপাদ্য বিষয়টি প্রমাণ করতে যেভাবে কনিকসের দরকার হয়, সেইভাবে সেগুলি ঢুকিয়ে দেন। তাঁর মত ও পথ এদিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা যুক্তি সম্মত এবং বর্তমান বিজ্ঞান জগতেও অনুসৃত হয় (a procedure modern in its steps and logical in its reasoning)। তিনি অঙ্কন ও প্রমাণ যেভাবে ব্যবহার করেছেন, বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কনিকসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলেই, তাঁর পন্থা এবং যুক্তি উপলব্ধি হতে পারে।

একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

$x^3+cx^2=a$ সমীকরণটি নেওয়া যাক

AB কে 'c' র সমান করে এবং H^3 কে 'a' সমান করে নেওয়া যাক। এখন AB কে বর্ধিত করে BT কে H এর সমান করে নাও এবং AB র B বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কিত কর।

BC কেও H এর সমান করে নাও এবং BCDT বর্গটিকে সম্পূর্ণ কর।
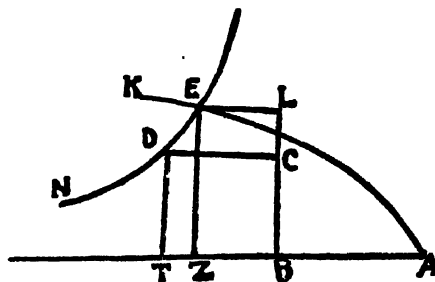
এখন BCDT বর্গের উপর H উচ্চতা নিয়ে একটি ঘনতল (cube) অঙ্কিত কর। D কে শীর্ষ বিন্দু এবং BC ও BT asypmtote নিয়ে একটি হাইপারবোলা অঙ্কিত কর। EDN যেন সেই হাইপারবোলা। আবার A কে শীর্ষবিন্দু, AT axis এবং BC parameter নিয়ে একটি প্যারাবোলা অঙ্কিত কর। AK যেন সেই প্যারাবোলা। এই দুইটি নিশ্চয়ই ছেদ করবে। এই ছেদ বিন্দু E তে AT এবং BC র উপর EZ এবং EL দুইটি লম্ব অঙ্কিত কর। তা হোলে $x = BZ$.

প্রমাণ : $EZ^2 = AZ.\ BC$. (প্যারাবোলার নিয়মানুযায়ী)

বা $AZ : EZ = EZ : BC$

আবার $EZ.\ BZ = BC.\ BT = BC^2$ (হাইপারবোলার নিয়মানুযায়ী)

বা $NZ : BC = BC : EZ$

গ্রন্থকার যেগুলিকে প্যারাবোলা এবং হাইপারবোলার নিয়ম ধরে নিয়ে এই প্রমাণ উত্থাপন করেছেন, প্যারাবোলা ও

হাইপ্যারাবোলা অঙ্কন দিয়েও তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নিম্নে পূর্ণ চিত্র দেওয়া গেল :—

প্রদত্ত অনুপাত অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন করলে দেখা যাবে ওমর তাঁর পূর্বের $y^2 = -px$ সমীকরণের প্যারাবোলা (axis এর অন্য দিকে মোটা লাইনে অঙ্কিত) ব্যবহার না করে অন্যান্য বারের মত negative ফল একেবারেই ত্যাগ করেছেন এবং সেই জন্যেই $y^2 = px$ সমীকরণের প্যারাবোলা ব্যবহার করেছেন। আসলে এটি কিন্তু vertical axis এর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত রয়েছে (চিহ্নিত লাইন অনুযায়ী)। তাঁর পূর্বের চিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে
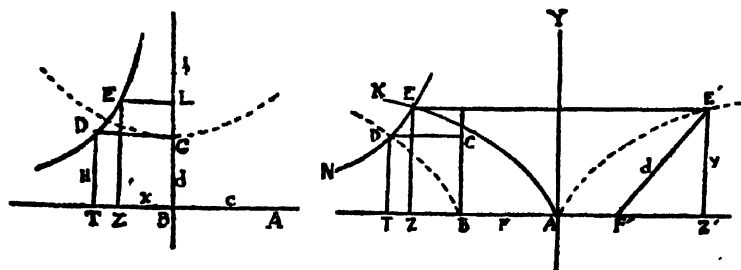
$y = EZ$. $x = AZ$, ছেদন বিন্দু E র co-ordinates অনুযায়ী। অতএব $y^2 = px$

তা থেকে $p : y = y : x$

এতে x, y, এবং p এর মূল্য বসিয়ে দিলে

$BC : EZ = EZ : AZ$ পাওয়া যাবে

গ্রন্থকারের মতই BC এবং BT asymptote নিয়ে EDN

প্যারাবোলা অঙ্কন করা যাক। BC কে axis করে প্রদত্ত চিত্রে (চিহ্ন অনুযায়ী) যে হাইপারবোলা অঙ্কন করা যাবে তার সমীকরণ হোল $x^2+y^2=d^2$ এর অর্থ হোল হাইপারবোলার উপরিস্থিত কোন বিন্দুর asymptote গুলি থেকে দূরত্বের গুণফল সব সময়েই একই থাকে (the product of the distances of any point on the hyperbola from the asymptotes is constant)। শেষ সমীকরণটি গ্রন্থকারের পূর্বের অঙ্কনে প্রয়োগ করলে

$$y=EZ : x=(AZ-c)=ZB ; d=CB=H$$

কিন্তু $x : d=d : y$

অতএব $BZ : BC=BC : EZ$

নিম্নের দুইটি সমীকরণ থেকে y বাদ দিলে, আমরা পূর্বের সমীকরণই ফিরে পাব $y^2=px$ (1)

$xy=d^2$ (2)

এখন (1) সমীকরণের p, H এর সমান, এবং দুইটি সমীকরণেরই y এক। প্যারাবোলার শীর্ষবিন্দু B তে সরিয়ে নিলে প্রথম সমীকরণটি দাঁড়াবে $y^2=p(x+c)$

(2) সমীকরণ অনুসারে $y^2=\dfrac{d^4}{x^2}$

(1) সমীকরণ প্রয়োগ করলে $\dfrac{d^4}{x^2}=dx+dc$

$$d^4=dx^3+dcx^2$$
$$d^3=x^3+cx^2$$

$$d = H, \text{ তাহোলে } H^3 = x^3 + cx^2$$

$$\text{বা } \quad a = x^3 + cx^2$$

এ থেকেই দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকের (1) এবং (2) সমানুপাত বর্তমানের বিশ্লেষক প্রণালীতেও (analytic method) সুন্দরভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

এই স্থান থেকে আরম্ভ করে ওমরের প্রদত্ত প্রমাণ বর্তমান পরিস্থিতিতেও অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে

$$BC : EZ = EZ : AZ \qquad (1)$$

$$BZ : CB = CB : EZ \qquad (2)$$

(2) বর্গ করলে $BZ^2 : CB^2 = CB^2 : EZ^2 \qquad (3)$

(1) অনুসারে $CB = EZ^2 : AZ$

এই (3) এ প্রয়োগ করলে

$$BZ^2 : CB^2 = CB. \frac{EZ^2}{AZ} : EZ^2$$

অতএব $BZ^2 : CB^2 = BC : AZ$

বা $BC^3 = BZ^2 . AZ.$

কিন্তু $AZ = BZ + AB$, এ থেকেই

$$BC^3 = BZ^2 . (BZ + AB) = BZ^3 + BZ^2 . AB.$$

কিন্তু $BC = H, \ H^3 = a, \ AB = c$

অতএব $a = BZ^3 + c. BZ^2$

BZ এর পরিবর্তে x বসিয়ে দিলেই পূর্বের সমীকরণটি পাওয়া যাবে

অতএব $x = BZ$

এই উদাহরণ থেকেই দেখা যাবে ওমর তাঁর প্রস্তাবিত সমীকরণকে কিভাবে সমমাত্রিক (Homogenous) করে তুলেছেন, এবং এই জন্যেই তিনি তাঁর অঙ্কনের প্রথমেই দুইটি auxiliary theorem ব্যবহার করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই অঙ্কনের মধ্যে নির্দিষ্ট-সংখ্যাটি নির্দেশ করতে তিনি একটি ঘনতলের ($H^3=a$) সমাবেশ করেছেন। পরে সমীকরণের $c=AB$ এর অনুরূপ পরিবর্তিত সহগ (Transformed co-efficient) নিয়ে দুইটি কনিকস ঠিক করে নিয়েছেন এবং প্যারাবোলা ও হাইপারবোলার ছেদন নিয়ে দুইটি বস্তুর সমানত্ব প্রমাণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত সাধারণ অংশের যোগ বিয়োগ এবং ঘন বস্তুর বিশ্লেষণ করে শেষ সমীকরণের উদ্ভাবনা করেছেন।

নানারূপ সমীকরণের সমাধানে তিনি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারের কনিকসের সাহায্য নিয়েছেন বর্তমানে প্রচলিত চিহ্নসমূহের অনুবর্তনে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। (১) $x^3+p^2x=p^2q$ এর সমাধান হয়েছে $x^2=py$ এবং $y^2=x(q-x)$ এর সাহায্যে, তেমনি (২) $x^3+ax^2=c^3, y^2=c(x+a)$ এবং $xy=c^2$ এর সাহায্যে (৩) $x^3\pm ax^2+b^2x=b^2c$, $y^2=(x\pm a)(c-x)$ এবং $x(b\pm y)=bc$ এর সাহায্য নিয়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে ওমর সব সময়েই positive root বের করেছেন negative এবং imaginary rootএর দিকেও যান নাই। এর কারণ বোধ হয় তাঁর অঙ্কনের অসম্পূর্ণতা। কোথাও তিনি সম্পূর্ণ বৃত্ত, প্যারাবোলা কিংবা হাইপারবোলার দুইটি

অংশই অঙ্কন করেন নাই, সর্বত্রই অর্ধবৃত্ত, অর্ধ প্যারাবোলা বা হাইপারবোলার একটি মাত্র অংশ অঙ্কন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এই অর্ধ অঙ্কনের কারণ বোঝা মুস্কিল। এমনি অসম্পূর্ণ অঙ্কনের জন্যই তিনি অনেক সময়েই সমস্ত positive rootও বের করতে সক্ষম হন নাই। উদাহরণ স্বরূপ $x^3 - cx^2 + bx - a = o$ সমীকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে যে আর একটি positive root হতে পারে সে কথা তাঁর মনে হয় নাই। আবার অনেক সময় তাঁর অঙ্কন অনুসারে দুইটি positive root এর সন্ধান পাওয়া গেলেও তিনি একটির কথাই মাত্র উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র তিনি, যেখানে positive দিকেই দুইটি কনিকস্ পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেখানে ছেদনবিন্দুগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। $a = x^3$, $x^3 + bx = a$, $bx + a = x^3$, $x^3 + cx^2 = a$, $x^3 + cx^2 + bx = a$, $cx^2 + bx + a = x^3$, $x^3 + bx = cx^2 + a$ প্রভৃতি যে সমস্ত সমীকরণে নির্দিষ্ট negative terms রয়েছে সেগুলির তিনি মাত্র একটি সমাধান করেছেন; কিন্তু $x^3 + a = bx$, $x^3 + a = cx^2$, $x^3 + cx^2 + a = bx$, $x^3 + bx + a = cx^2$, $x^3 + a = cx^2 + bx$ প্রভৃতি যে সমস্ত সমীকরণে positive terms রয়েছে সেগুলোর দুইটি rootই বের করেছেন। যে সমস্ত সমীকরণের positive root পাওয়া যায় না, সেগুলোকে তিনি অসম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই অসম্পূর্ণ অঙ্কনের জন্য অন্য কয়েক স্থানে তিনি root বের করতেও অক্ষম হয়েছেন বলা চলে।

যেখানে কনিকসের অংশগুলি শুধু একবার ছেদ করেছে সেখানে তিনি একটি root নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, যেখানে দুই জায়গায় ছেদ করেছে সেখানে দুইটি root আছে ধরে নিয়েছেন। এই অসম্পূর্ণ অঙ্কনই যে বিজ্ঞানে তাঁর নবতম আবিষ্কারকে ব্যাহত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

যে সমস্ত সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধানে Tangent Conicsএর উদ্ভব হয় ওমর তার কতকগুলোর বেলায় এই অঙ্কনের বরাদ্দ এবং প্রস্তাবিত সমীকরণের সহগের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধ দেখিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ $x^3+a=cx^2$ সমীকরণটির উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে এর সমাধানে কতকগুলি সম্ভব এবং কতকগুলি অসম্ভব rootএর উদ্ভব হয়। বর্তমানে অনুসৃত চিহ্নাদি ব্যবহার করলে ওমরের কার্যপ্রণালীকে নিম্নভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে—যখন $\sqrt[3]{a}=c/2$ বা $<c/2$ তখন দুইটি positive root হবে কিন্তু যদি $c>\sqrt[3]{a}>c/2$ হয় তা হোলে দুইটি root থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু যখন $\sqrt{a}>c$ বা $=c$ হয় তখন কোন rootই পাওয়া যাবে না। তেমনি $x^3+bx+a=cx^2$ সমীকরণের বেলায় যদি $a^{3/2}+b^2\sqrt{c}<\sqrt{a}.bc$ হয় তা হোলে দুইটি root পাওয়া যাবে কিন্তু যদি $a^{3/2}+b^2\sqrt{c}>\sqrt{a}.bc$ হয় তা হোলে root থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। এইভাবে $x^3+bx=cx^2+a$ সমীকরণের বেলায় যদি $a/b=c$ বা $>c$ হয় ওমরের মতে তা হোলে কোন root পাওয়া

যেতে পারে না ; শুধু যেখানে $a/b<c$ হয় তখনই একটি positive root পাওয়া যেতে পারে। তেমনি $x^3+a=cx^2+bx$ সমীকরণে যখন $a/b>c$ তখন দুইটি root থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু যখন $a/b=c$ বা $<c$ তখন দুইটি root অবশ্যই থাকবে। এই সমীকরণেও ওমর মাত্র একটি rootএর কথাই বলেছেন। এর কারণ তাঁর অসম্পূর্ণ অঙ্কন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ওমরের সমাধান এখানে উধৃত করা গেল :—

BC যেন বর্গের সংখ্যার সমান। BD বাহুর সংখ্যার সমান। এটি একটি বর্গের বাহুর সমান এবং BC এর উপর লম্ব। BD এর বর্গকে তল করে একটি ঘন তল (solid) নির্মাণ কর, এ যেন প্রদত্ত সংখ্যার সমান। এর উচ্চতা যেন S, S তা হোলে BCএর ছোট, বড় অথবা সমান হবে।

S যেন BCএর চেয়ে ছোট। BC থেকে Sএর সমান করে

BA অংশ নেওয়া যাক। এইবার BZ rectangleটি সম্পূর্ণ কর। BD এবং DZ asymptotes বিশিষ্ট HAT হাইপ্যারাবোলা অঙ্কন করা যাক এটি A বিন্দু দিয়ে যাবে। C কে শীর্ষবিন্দু করে, BCএর বর্ধিত অংশের উপর একটি axis নিয়ে, AC এর সমান প্যারামিটার এবং axis major বিশিষ্ট KCL অন্য একটি হাইপারবোলা অঙ্কন করা যাক। এই হাইপারবোলা পূর্বেরটিকে নিশ্চয়ই ছেদ করবে। এই দুইটি যেন M বিন্দুতে ছেদ করে। দুইটি কনিকসের অবস্থানই জানা থাকার দরুন Mএর অবস্থানও ঠিকই জানা যাবে। M বিন্দু থেকে MN এবং EMO দুইটি লম্ব টানা যাক। এদের অবস্থান এবং পরিমাণও জানা যাবে। এখন Rect. DA, Rect. DMএর সমান হবে এবং পূর্বে যেমন দেখান হয়েছে NE, ZEএর সমান হবে। অতএব Rect দুইটির বাহু এবং তাদের বাহুর বর্গ বিপরীত আনুপাতিক (Reciprocally proportional) হবে। কিন্তু KCL হাইপারবোলায় MEএর বর্গের সঙ্গে EAএর বর্গের যে অনুপাত, CE এবং EAএরও সেই অনুপাত। অতএব BDএর বর্গের সঙ্গে BE এর বর্গের যে অনুপাত, CEএর সঙ্গে EA এরও সেই অনুপাত। এখন যে ঘন বস্তুর তল BD এর বর্গ এবং উচ্চতা EA, সেটি অনুরূপ BE এর বর্গের তল এবং CE উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনবস্তুর সমান হবে। এই দুইটির সঙ্গেই BE এর বর্গের তল ও BC উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনবস্তুটি যোগ করা যাক। তা হোলে BEএর ঘন,

প্রদত্ত বর্গ সংখ্যা এবং BDএর বর্গ তল ও EA উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনবস্তুর সমষ্টির সমান হবে। এখন এই দুইটির সঙ্গে BA উচ্চতা এবং BDএর বর্গ তলবিশিষ্ট ঘনবস্তুর (যেটিকে প্রদত্ত সংখ্যার সমান করে নেওয়া হয়েছে) যোগ করা যাক, তা হোলে BD এর বর্গের সমান তল এবং BE উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনবস্তু যেটি BE ঘন এর বাহুর সংখ্যা এবং তার বর্গের সংখ্যার সমষ্টির সমান, BE ঘন এবং প্রদত্ত সংখ্যার সমষ্টির সমান হবে। অঙ্ক অনুসারে এ নিম্নভাবে লেখা যাবে

$$ME^2 : EA^2 = OE^2 : BE^2 = DB^2 : BE^2$$

কিন্তু KML হাইপারবোলা অনুযায়ী

$$ME^2 : EA^2 = CE : EA$$

অতএব $BD^2 : BE^2 = CE : EA ; BD^2.EA = BE^2.CE$

কিন্তু $BE^2.BC + BE^2.CE$ বা $BE^3 =$

$$BE^2.BC + BD^2.EA$$

অতএব $BE^3 + BD^2.AB = BE^2.BC + BD^2.BE$

বা $BE^3 + a = c.BE^2 + b.BE$

এবং $x = BC$

দ্বিতীয়ত S যদি BCর সমান হয়, BC ঘন এর বাহুর সমান হবে।

প্রমাণ—BC ঘন প্রদত্ত বর্গের সংখ্যার সমান এবং প্রদত্ত সংখ্যা, ঘন এর বাহুর প্রদত্ত সংখ্যার সমান। তা হোলে BC ঘন এবং প্রদত্ত সংখ্যার সমষ্টি প্রদত্ত বর্গ এবং ঘন এর বাহুর

প্রদত্ত সংখ্যার সমষ্টির সমান। এই দেখানর কথা ছিল। আবার BC ঘন এবং এর বাহুর প্রদত্ত সংখ্যার সমষ্টি প্রদত্ত বর্গের সংখ্যা এবং প্রদত্ত সংখ্যার সমষ্টির সমান। অঙ্কের কথায়

$$S = BC \qquad x = BC$$

$$BC^3 = BC.\ BC^2 \text{ বা } BC^3 = c.\ BC^2$$

$$BD^2.\ S. = BD^2.\ BC \qquad \text{বা } a = b.\ BC$$

$$\text{তা হোলে } BC^3 + a = c.BC^2 + b.\ BC$$

$$\text{কিন্তু } BC^3 + b.\ BC = c.\ BC^2 + a.$$

এখানে কিন্তু একটি বিষয় গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। x = BD যে একটি সমাধান হবে সে কথা তিনি একেবারেই চিন্তা করেন নাই। তাঁর এই প্রমাণ থেকেই সহজেই এই সমাধানও বেড়িয়ে পড়বে। সমাধানটির আঙ্কিক রূপ দাঁড়াবে

$$BD^3 = BD^2.BD \text{ বা } BD^3 = b.\ BD$$

$$BD^2.\ S = BD^2.\ BC \text{ বা } a = c.\ BD^2$$

$$\text{তা হোলে } BD^3 + a = c.\ BD^2 + b.\ BD.$$

তৃতীয়ত S যখন BC এর চেয়ে বড় হবে।

BAকে Sএর সমান করে নেওয়া যাক্। BZ Rect. অঙ্কন করা যাক। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি হাইপারবোলাই যেন A বিন্দু দিয়ে যায়। এরা পরস্পরকে ছেদ করবে। যদি তারা আবার কোন এক বিন্দুতে Tangentially মিলিত হয় অথবা অন্য কোন দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে, কনিকসের চতুর্থ গ্রন্থ অনুযায়ী, তা হোলে এর সমাধান সম্ভব নতুবা অসম্ভব।

যদি হাইপারবোলা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করে, তা হোলে ছেদনবিন্দুগুলি থেকে লম্ব টেনে পূর্বের মতই এর প্রমাণ উপস্থিত করা যাবে। দেখা যাচ্ছে এর কতকগুলি উদাহরণ হতে পারে, যেগুলির সমাধান অসম্ভব। অঙ্ক অনুসারে $S>BC$, $AB=S$
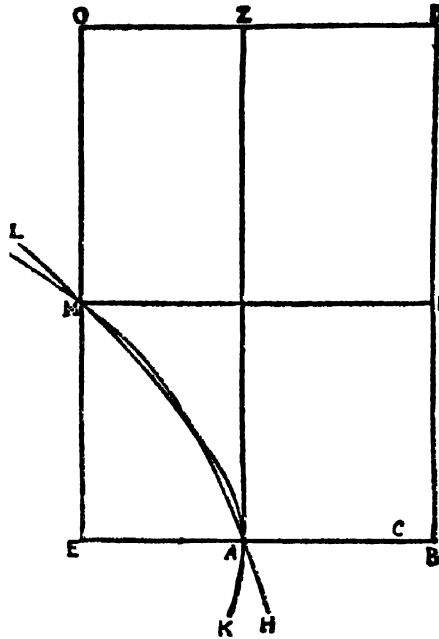
প্রথম চিত্রের মতই HAT হবে হাইপারবোলা, A শীর্ষবিন্দু AE axis, এবং AC সমবাহু হাইপারবোলা KML এর প্যারামিটার।

গ্রন্থকারের কাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁর মতে যখন $S<BC$ বা $S=BC$, অর্থাৎ $a/b<c$, বা $=c$ তখন

$x^3-cx^2-bx+a=0$ সমীকরণের দুইটি positive root পাওয়া যাবে। যেখানে $a/b<c$, সেখানে গ্রন্থকার তাঁর অঙ্কনে মাত্র একটি root দেখিয়েছেন, অন্যটির কথা উল্লেখ করেন নাই। খুব সম্ভব এদিকে তাঁর নজরও পড়ে নাই।

প্রথম চিত্রের বিন্দু চিহ্নিত অংশে P বিন্দুটি সেই দ্বিতীয় সমাধান বিন্দু হবে। P বিন্দুটি হোল HAT হাইপারবোলা এবং KCL হাইপারবোলার অন্য শাখার ছেদনবিন্দু। P থেকে BA এর উপর লম্ব টানলে এ লম্বটি B এবং A এর মধ্যে কোন স্থানে সরল রেখার সঙ্গে মিলিত হবে অর্থাৎ abscissaর axisএর positive sideএ মিলিত হবে। যখন $a/b=c$, তখন অন্য positive root হোল $x=+\sqrt{b}$. বা $x=BD$. যখন $a/b>c$, বৈজ্ঞানিকের মতে তখন হয় দুইটি কনিকস দুইটি বিন্দুতে ছেদ করবে বা কোন এক বিন্দুতে মিলিত হবে, অথবা এর কোন সমাধানই হবে না। অর্থাৎ সমীকরণটির হয় দুইটি positive এবং অসমান root থাকবে, অথবা positive এবং সমান root হবে ($x=\frac{1}{3}c+\frac{1}{3}\sqrt{3b+c^2}$) অথবা দুইটি imaginary root হবে। কিন্তু এই তিন ক্ষেত্রেই সমীকরণটির দুইটি conjugate root ছাড়া একটা real এবং negative root ও আছে। বৈজ্ঞানিক সেটির দিকে নজর দেন নাই।

এই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথাযথ সংযোগ এবং পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কার্যাবলীর পূর্ণ প্রচলনের অভাব সমস্ত বৈজ্ঞানিকের কার্যাবলীতেই প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়।

আবুল জুদের বেলায় দেখা গিয়েছে ওমর খৈয়াম কিভাবে গ্রন্থ না দেখেই তৃতীয় বৈজ্ঞানিকের মুখে শোনা কথায় আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে এমনি অন্যান্য ভুলও ঢুকে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ Biquadratic Equationএর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওমর খৈয়াম জ্যামিতিক অঙ্কনে এর সমাধান অসম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন। মঁশিয়ে উপেক কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছেন যে ওমরের বহু পূর্বেই আরব বৈজ্ঞানিকগণ Biquadratic Equationএর সমাধান করেন। এমন কি তাঁরা চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের বীজগণিতিক সমাধান (Algebraic expression) পর্যন্ত পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কার্যাবলীর সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতই যে ওমর এ ভুল মত প্রকাশ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

Binomial Equationএর বেলায়ও ওমরের বহুপূর্বেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তৃতীয় ও চতুর্থমাত্রার গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। ইবনোল হাইছাম পঞ্চম শক্তিবিশিষ্ট Binomial Equationএর সমাধান করেন। ওমর ষষ্ঠ শক্তি বিশিষ্ট equationএর অঙ্কন প্রস্তাব করেন কিন্তু তাঁর বীজগণিতে এর কোন সমাধান পাওয়া যায় না।

ভগ্নাংশীয় সমীকরণ (Fractional Equation) বীজগণিতের এক বিশিষ্ট অংশ হোলেও ওমরের পূর্বে এ বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল বলে জানা যায় না। কেউ এদিকে বিশেষ নজর দেন নাই বলেই মনে হয়। ওমরই

সর্বপ্রথম এর উল্লেখ ও সমাধান করে বীজগণিতের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন। তাঁর সমীকরণগুলির বিশেষত্ব হোল যে তিনি হরগুলিতে (Denominators) অনির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে শক্তির মাত্রা বর্ধন করেছেন। তিনি এই ধরণের সমীকরণকে সরল (Simple Equation) ত্রিরাশিক এবং চারিরাশিক সমীকরণে ভাগ করে নিয়েছেন। তবে এর সমাধানে ভগ্নাংশীয় হর সব সময়েই সম্পূর্ণ অংশে প্রকাশিত হয়েছে। ওমরের নিজের কথায় একটি সমীকরণের উল্লেখ করলেই, কিভাবে তিনি এগুলির সমাধান করেছেন তার আভাস পাওয়া যাবে। "যেমন, যদি কেউ বলে যে কোন ঘণের এক অংশ বর্গের তিনগুণ এবং মূলের পাঁচগুণ একত্রে তিন এবং অষ্টম ভাগের তিন ভাগের সমান। এ যেন কেউ বলল যে একটা ঘন, তিনটি বর্গ এবং পাঁচটি মূলের সমষ্টি তিন এবং অষ্টম ভাগের তিন ভাগের সমান। কনিকসের সাহায্যে ঘনএর বাহু নির্ধারণ করা যাবে এবং সেই থেকেই মূলের অংশ পাওয়া যাবে। বর্তমানে অনুসৃত আঙ্কিক চিহ্ন অনুসারে সমীকরণটি হোল $1/x^3+3.\ 1/x^2+5.\ 1/x=3\frac{3}{8}$, আর সমাধান করা হয়েছে 1/xকে z ধরে নিয়ে $z^3+3z^2+5z=3\frac{3}{8}$.

গ্রন্থকার ২১টি সরল সমীকরণ, ১৫টি ত্রিরাশিক ত্রিমাত্রিক সমীকরণ, ২৪টি ত্রিরাশিক চতুর্থমাত্রিক সমীকরণ (three terms including an interval of any four successive degree) এবং ২৮টি চারিরাশিক চতুর্থমাত্রিক

সমীকরণ (four terms including four successive degrees) মোট ৮৮টি সমীকরণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এর দুইটিতে মাত্র তাঁর প্রথায় সমাধান করা যেতে পারে না। সে দুইটির জন্য দরকার আলহাইছামের auxiliary proposition কিন্তু আর ৮৬টিকে তাঁর প্রথায়ই সমাধান করা যেতে পারে এবং এই সমস্তগুলির মধ্যে মাত্র ছয়টি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা আলোচিত হয়েছিল। ম'শিয়ে উপেক এগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন—

সরল সমীকরণ—

$a = x$, $a = x^2$, $a = x^3$ $bx = x^2$, $bx = x^3$, $cx^2 = x^3$

ভগ্নাংশীয় রূপে

$1/x^3 = a.1/x^2$ $1/x^2 = a.1/x$ $1/x = a$

$1/x^3 = a.1/x$ $1/x^2 = a$ $1/x = ax$

$1/x^3 = a$ $1/x^2 = ax$ $1/x = ax^2$

$1/x^3 = ax$ $1/x^2 = ax^2$. $1/x = ax^3$

$1/x^3 = ax^2$ $1/x^2 = ax^3$ ইবনোল হাইছামের সমীকরণ

$1/x^3 = ax^3$

জটিল সমীকরণ—

$x^2 + bx = a$, $x^2 + a = bx$, $bx + a = x^2$

$x^3 + cx^2 = bx$, $x^3 + bx = cx^2$, $cx^2 + bx = x^3$

ভগ্নাংশীয় রূপে

$1/x + a = bx$, $1/x + bx = a$ $1/x = a + bx$

$1/x^2 + a/x = b$, $1/x^2 + b = a/x$ $1/x^2 = a/x + b$

$1/x^3 + a/x^2 = b/x$; $1/x^3 + b/x = a/x^2$; $1/x^3 = a/x^2 + b/x$

. ত্রিরাশিক ত্রিমাত্রিক সমীকরণ

$x^3+bx=a,$ $x^3+a=bx,$ $bx+a=x^3$

$x^3+cx^2=a,$ $x^3+a=cx^2,$ $cx^2+a=x^3$

ভগ্নাংশীয় রূপে

$1/x^3+a/x=b$ $1/x^3+b=a/x$ $1/x^3=a/x+b$

$1/x^2+a=bx$ $1/x^2+bx=a$ $1/x^2=a+bx$

$1/x+ax=bx^2$ $1/x+bx^2=ax$ $1/x=ax+bx^2$

$1/x^3+a/x^2=b$ $1/x^3+b=a/x^2$ $1/x^3=a/x^2+b$

$1/x^2+a/x=bx$ $1/x^2+bx^2=a/x$ $1/x^2=a/x+bx$

$1/x+a=bx^2$ $1/x+bx^2=a$ $1/x=a+bx^2$

চারিরাশিক ত্রিমাত্রিক সমীকরণ—

$x^3+cx^2+bx=a,$ $x^3+cx^2+a=bx$

$x^3+bx+a=cx^2,$ $cx^2+bx+a=x^3$

$x^3+cx^2=bx+a,$ $x^3+bx=cx^2+a,$ $x^3+a=c_x{}^2+b_x$

ভগ্নাংশীয় রূপে

$1/x^3+a/x^2+b/x=c$ $1/x^3+a/x^2+c=b/x$

$1/x^3+b/x+c=a/x^2$ $1/x^3=a/x^2+b/x+c$

$1/x^3+a/x^2=b/x+c$ $1/x^3+b/x=a/x^2+c$

$1/x^3+c=a/x^2+b/x$ $1/x^3+a/x+b=cx$

$1/x^2+a/x+cx=b$ $1/x^2+b+cx=a/x$

$1/x^2=a/x+b+cx$ $1/x^2+a/x=b+cx$

$1/x^2+b=a/x+cx$ $1/x^2+cx=a/x+b$

$I/x+a+bx=cx^2$ $1/x+a+cx^2=bx$

$1/x+bx+cx^2=a$ $1/x=a+bx+cx^2$

$1/x+a=bx+cx^2$ $1/x+bx=a+cx^2$

$1/x+cx^2=a+bx.$

বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত সমীকরণের উল্লেখ করেছেন, তা থেকেই এর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তাঁর সমীকরণগুলিকে $x^{\pm n}$ গুণ দিয়ে ; অবশ্য n positive হওয়া চাই। খুব সম্ভব শক্তি মাত্রা বিষয়ে তাঁর দার্শনিক মতবাদের জন্য তিনি একে আর বাড়িয়ে তোলেন নাই এবং বোধ হয় এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাও করেন নাই।

ওমরের ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সমাধান সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন মঁশিয়ে উপেক তাঁর L' Algebra d' 'Omar Alkhayyami গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থে ওমরের ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সমাধানের যে সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন এখানে উল্লেখবাহুল্য হোলেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ত হবে না।

"আল খৈয়ামী যে সমস্ত কনিকস ব্যবহার করেছেন তাদের বিশ্লেষক (Analytic) সমীকরণ বের করে সেই সমীকরণগুলির তুলনামূলক সমালোচনায় কনিকসের ধ্রুবকের পরিবর্তে χ, λ, μ, ν, ξ, φ ব্যবহার করলে (এগুলির অবশ্য $+1$ এবং -1 ছাড়া অন্য কোন মূল্যই হতে পারে না, এবং এতে $\chi . \lambda = \frac{\lambda}{\chi}$, $\chi^2 = 1$ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে) আরব বৈজ্ঞানিকের সমাধান তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) $y^2 + \chi x^2 + \lambda a/b . x = 0$ $\begin{cases} \chi = 0 & \text{.... প্যারাবোলা} \\ \chi = +1 & \text{.... বৃত্ত} \\ \chi = -1 & \text{.... হাইপারবোলা} \end{cases}$

$$\frac{x^2-\sqrt{b}.y=0}{x^4+\chi bx^2+\lambda ax=0}$$ প্যারাবোলা বা $x^3+\chi bx+\lambda a=0.$

(২) $yx-\sqrt{a}.m=0$ হাইপারবোলা

$$\frac{y^2+\chi mx+\lambda mc=0}{\chi x^3+\lambda cx^2+a=0}$$ প্যারাবোলা বা $x^3+\chi\lambda cx^2+\chi a=0$

(৩) $y^2+\chi x^2+\lambda(a/b+\mu c)x+\nu\frac{ac}{b}=0$ $\begin{cases}\chi=+1 \\ \chi=-1\end{cases}$ বৃত্ত হাইপারবোলা

$$\frac{yx+\xi\sqrt{b}.x+\varphi\frac{a}{\sqrt{b}}=0}{\chi x^4+\lambda(\frac{a}{b}+\mu c)x^3+(b+\nu\frac{ac}{b})x^2+2\xi\varphi ax+\frac{a^2}{b}=0}$$ হাইপারবোলা

বা

$$x^4+\chi\lambda(\frac{a}{b}+\mu c)x^3+\chi(b+\nu\frac{ac}{b})x^2+2\chi\xi\varphi ax+\chi\frac{a^2}{b}=0$$

প্রথম পন্থাটি (3) (13) (14) এবং (15) সমীকরণে ব্যবহৃত হয়। উপস্থাপিত করলে এ দাঁড়াবে—

(3) $\chi=1+\lambda=-1$ $b=-1$ (14) $\chi=-1,$ $\lambda=+1$

(13) $\chi=0$ $\lambda=-1$ (15) $\chi=-1$ $\lambda=-1$

দ্বিতীয় পন্থাটি (16) (17) (18) এর জন্যে ব্যবহৃত হয় যদি

(16) $m=\sqrt{a}.$ $\chi=-1$ $\lambda=-1$

(17) $m=\sqrt{a}.$ $\chi=+1$ $\lambda=-1$

(18) $m=c$ $\chi=-1$ $\lambda=+1$

ব্যবহার করা যায়।

যখন $x, \lambda, \mu, \nu, \xi, \psi$ কে নিম্নভাবে মূল্য দেওয়া যায় :

	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
x	+1	−1	+1	−1	−1	+1	−1
λ	−1	+1	+1	−1	−1	−1	+1
μ	−1	−1	−1	−1	+1	+1	+1
ν	−1	+1	−1	+1	−1	+1	−1
ξ	+1	−1	−1	−1	−1	−1	−1
φ	−1	+1	−1	−1	−1	+1	+1

তখন তৃতীয় পন্থাটি (19) থেকে (25) সমীকরণ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় পন্থায় যে সমস্ত চতুর্থ মাত্রার সমীকরণ উদ্ভূত হয় সেগুলিকে $(x \pm a/b)$ দিয়ে ভাগ করলে প্রস্তাবিত তৃতীয় মাত্রার সমীকরণ $x^3 + \rho cx^2 + \sigma bx + \tau a = 0$এ পরিণত করা যায়।

এবং $\rho, \sigma\ \tau$ এর যদি নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া হয়—

	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)
ρ	+1	+1	−1	−1	+1	−1	−1
σ	+1	−1	+1	−1	−1	+1	+1
τ	−1	+1	+1	−1	−1	−1	+1

তা হোলে :—$(x^3 + \rho cx^2 + \sigma bx + \tau a).\ (x + \frac{\tau}{\sigma}.\frac{a}{b}) =$

$$= x^4 + (\rho c + \frac{\tau}{\sigma}.\frac{a}{b})\,x^3 + (\sigma b + \frac{\rho\tau}{\sigma},\frac{ac}{b})\,x^2 + 2\tau ax + \frac{\tau^2}{\sigma}.\frac{a^2}{b}$$

$$= x^4 + (\sigma\tau\frac{a}{b} + \rho c)x^3 + \sigma(b + \rho\tau\frac{ac}{b})x^2 + 2\tau ax + \sigma\frac{a^2}{b}$$

সাধারণ ত্রিমাত্রিক সমীকরণে যে দ্বিতীয় Termকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কিন্তু ওমর খৈয়াম কিছু বলেন নাই। বোধ হয় সে তাঁর মনেও হয় নাই তা হোলে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পন্থাটির ব্যবহার থেকে নিষ্কৃতি পেতেন।

Binomial theorem বীজগণিতের একটি বিশিষ্ট অংশ। দুইটি সংখ্যার যোগফল যে কোন শক্তিমাত্রায় উন্নত হোলে সংখ্যাগুলির গুণক নির্ধারণ করবার এ হোল সব চেয়ে সহজ উপায়। আঙ্কিক নিয়ম অনুসারে একে বলা হয় $(a+b)^n$, n যে কোন সংখ্যা হউক না কেন জবরজঙ্গ গুণনের আশ্রয় না নিয়েই a ও bর গুণক বের করা। ইউক্লিড শুধু সাধারণ দ্বিশক্তির (অর্থাৎ n যেখানে দুই) আলোচনা করেন; এমনিতে সাধারণ সূত্র হিসাবে কোন কিছু উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই কিম্বা একে উন্নত করবারও কোন চেষ্টা করেন নাই। ওমর খৈয়ামই এদিকে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। তিনি n যে কোন সংখ্যা হোক না কেন সহজভাবে a ও bর গুণক নির্ধারণ করবার এক সাধারণ সূত্র বের করেন। এই Binomial theorem এর সূত্রপাত। Binomial theorem এর আবিষ্কর্তা হিসাবে নিউটনই জগদ্বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন—এমন কি তাঁর কবরের উপরে Binomial theorem আঁকা আছে বলে শোনা যায়। অথচ সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা ওমর খৈয়ামের সম্বন্ধে কোনও উল্লেখও করা হয় না। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থখানিতে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু এতে

বিস্তারিত বিবরণ কিছুই নেই। অন্য এক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সেই গ্রন্থখানির এখন পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সে অজ্ঞাত গ্রন্থখানির সন্ধান পেলে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যেত।

পূর্বেই বলা হয়েছে ওমর জ্যোতির্বিদ হিসাবেই রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি প্রথম জীবন থেকেই জ্যোতির্বিদ হিসাবেই অর্থোপার্জন করেন। মালিক শাহের দরবারে বিজ্ঞান পারিষদভূক্ত হবার পর নিজ প্রতিভাগুণেই তিনি মুনাজ্জিম-ই-শাহীর (রাজজ্যোতিষী) পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানও তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দানে সমুজ্জল হয়ে রয়েছে। সুলতান অনেক পূর্বে থেকেই পারস্যের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার করবার আকাঙ্খা মনে মনে পোষণ করছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে এবং পঞ্জিকা সংস্কার ধর্মানুমোদিত হবে কিনা এই দ্বিধায়ই তিনি নিজের আকাঙ্খা বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন নাই। ওমরের প্রতিভায় এক অভাব পূর্ণ হওয়ায় তিনি শীঘ্রই অন্য বাধা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন ওলামাদের অভিমত গ্রহণ করে। ওলামাগণ একবাক্যে সংস্কারকার্য সমর্থন করেন। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে মুসলিম জাতি পারস্য অধিকার করে নিলেও তাদের আচার ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিজরাব্দ প্রচলিত হওয়া সত্বেও তাঁরা পারস্যের পুরাতন অব্দই বজায় রেখেছিলেন। তাই পঞ্জিকার সংস্কার হওয়ার পূর্ব

পর্যন্ত সৌরমাস হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করা হত কিন্তু ব্যয় হত চান্দ্রমাস হিসাবে। ফলে রাজকার্যের হিসাবে অনেক অসুবিধা দেখা দিত। ৪৬৭ হিজরীর (১০৭৫ খৃঃ অব্দ) হিসাবে দেখা যায় রাজকোষ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত কারণেই সুলতান প্রচলিত পঞ্জিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস প্রবর্তনের জন্য দৃঢ় প্রয়াসী হন।

ওমরের পঞ্জিকাসংস্কার কার্যের সুবিধার জন্য মালিক শাহ ১০৭৪ খৃঃ অব্দে এক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৭৯ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ থেকে ওমর কাজ সুরু করেন। সাতজন সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নিয়ে মন্ত্রণাপরিষদ গঠিত হয়। এই সাতজনই ওমরের নির্বাচিত লোক। ওমর নিজে সভাপতিরূপে কাজ করেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল অনন্য সাধারণ অধ্যবসায়, প্রাণপাত পরিশ্রম ও সাধনায় এই সংস্কারকায শেষ হয়। সুলতানের নাম অনুসারে এই সংস্কৃত পঞ্জিকার নাম দেওয়া হয় তারিখ-ই-জালালী। জালালী অব্দ ৪৭১ হিজরী ১০ই রমজান জুম্মার দিন (শুক্রবার ১০ই মার্চ ১০৭৯ খৃঃ অব্দ) থেকে আরম্ভ। এ প্রচলনের পূর্বে সূর্য মীনলগ্নে অর্ধমাধ্যাবস্থায় অবস্থান করত বলে ওমর খৈয়াম ফারওয়ারদিন মাসের প্রথম থেকে (যে সময় দিন রাত সমান, equinox) বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। এই সময় বৎসরের ২৮ দিন অতীত হয়েছিল কিন্তু তবুও ওমর ফারওয়ারদিন মাস থেকেই গণনা আরম্ভ করেন। যা হোক এই দুরূহ কাজের যথাযথ পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন।

ওমরের পঞ্জিকা গণনা যে কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সে বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরি পঞ্জিকার সঙ্গে তুলনা করলেই সম্যকভাবে বোঝা যাবে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে রোমের ধর্মসম্রাট ত্রয়োদশ গ্রেগরীর রাজত্বকালে খৃষ্ট পঞ্জিকার সংস্কার হয়। এর সঙ্গে ওমরের পঞ্জিকার তুলনা করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে ওমরের পঞ্জিকার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে গ্রেগরী পঞ্জিকার চেয়ে জালালী পঞ্জিকা সর্বাংশে সুসংস্কৃত (perfect) এবং সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম ও সমীচীন। ওমরের সংস্কারপ্রণালী রাজকার্যের জন্য সবদিক দিয়েই সুবিধাজনক। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবনের মতে জুলিয়াস সীজরের প্রবর্তিত পঞ্জিকার চেয়েও জালালী পঞ্জিকা গণনার সূক্ষ্মতায় ও ভ্রমশূন্য হিসাবে অধিকতর উৎকৃষ্ট। দুর্ভাগ্যের বিষয় জালালী অব্দ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এর পরমায়ু ছিল মাত্র চৌদ্দ বৎসর; সুলতানের জীবনকাল পর্যন্ত। সুলতানের সমাধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধের জালালী অব্দও সমাধি লাভ করে। যাহোক সুলতানের উত্তরাধিকারীগণের অবিমৃষ্যকারিতায় এর অধিক প্রচলন না হোলেও ওমরের কীর্তি চিরস্মরণীয় করে রাখতে এই চৌদ্দ বৎসরই যথেষ্ট। বস্তুত বিজ্ঞানে যদি ওমর খৈয়ামের আর কোন অবদান নাও থাকত তা হোলেও এই পঞ্জিকা সংস্কারের জন্যই তিনি বিদ্বৎসমাজে অমর হয়ে থাকতেন। ওমরের এই সংস্কারের বহু ভাষ্য দেখা যায়। এখানে তিনটি ভাষ্যের কথা উল্লেখ করা গেল। প্রথমটি হোল চতুর্দশ শতাব্দীর শিরাজী কর্তৃক।

তাঁর মতে এতে ৭০ বৎসরের মধ্যে ১৫টি Intercalary দিন আছে—এ অনুসারে ১৫৪০ বৎসরের গণনায় একদিন ভুল হবে। দ্বিতীয়টি হোল পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উলুগবেগ কর্তৃক। তাঁর মতে এতে ৬২ বৎসরে ১৫টি Intercalary দিন পাওয়া যাবে—যে অনুসারে ৩৭৭০ বৎসরের গণনায় একদিন ভুল হবে। তৃতীয়টি হোল বর্তমান ভাষ্য। এ মত অনুসারে এতে ৩৩ বৎসরে ৮টি Intercalary দিন পাওয়া যাবে এবং ৫০০০ বৎসরের গণনায় একদিন ভুল হবে। গ্রেগরী পঞ্জিকা অনুসারে ৩৩৩০ বৎসরের গণনায় একদিন ভুল হয়।

ওমরের মানমন্দিরের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কারুর মতে এ ছিল রাইতে, কারুর মতে নিশাপুরে, কারুর কারুর মতে ইস্পাহানে। যাহোক প্রধানত পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য মানমন্দিরে কাজ করলেও, তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য অংশকেও উপেক্ষা করেন নাই। নিজের ও সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণ ফল লিপিবদ্ধ করে তিনি একটি Astronomical Table তৈরী করেন। হাজী খলিফার মতে রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তিনি পঞ্জিকার মতই মালিক শাহের নাম অনুসারে এর নাম রাখেন "জিজ-ই-মালিকশাহী"।

জ্যোতিষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অঙ্গ হিসাবেই পরিগণিত হয়ে আসছিল। প্রায় প্রত্যেক জ্যোতির্বিদও তাই জ্যোতিষ নিয়েও আলোচনা করেছেন। ওমর খৈয়ামও এর হাত থেকে রেহাই পান নাই। রাজ আদেশ অনুসারে তাঁকে অনেক সময়

অন্যান্য জ্যোতিষীদের গণনা, ভবিষ্যদ্বানীর বিচার ও গণনার অভিমত সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত দিতে হত। এ ছাড়া বাদশাহের কাজের জন্য শুভ অশুভ মুহূর্তও নির্ধারণ করতে হত। ইসলামে অননুমোদিত এই কাজের জন্য নৃপতিদের এই আগ্রহের কারণ বোঝা মুস্কিল। এর মধ্যে বোধ হয় মানব মনের চিরদুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। অনেক সময় গণনা অনুযায়ী ফল না হোলে জ্যোতিষীগণের লাঞ্ছনারও সীমা থাকত না। ওমর খৈয়ামের জীবনকালেও এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে বলে জানা যায়। চাহার মাকালায় এমনি একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। মালিক শাহের রাজত্বকালে আরব নরপতি সাদাকা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি বাগদাদ আক্রমণ করতে রওয়ানা হয়ে পড়েন। মালিকশাহ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করার ভার দেন এক ইস্পাহানী জ্যোতিষীর উপর। জ্যোতিষী গণনায় এক সপ্তাহের মধ্যে কোন শুভদিন খুঁজে পান নাই। তিনি সুলতানকে সেই কথাই জানান। কিন্তু সুলতান এত দেরী করতে রাজী হতে পারেন নি। তিনি জ্যোতিষীকে শীঘ্র শুভমুহূর্ত নির্ধারণ করতে আদেশ দেন; জ্যোতিষী অনন্যোপায় হয়ে প্রাণভয়ে ইস্পাহান ত্যাগ করেন। একজন বিদেশী জ্যোতিষীও এই সময়ে ইস্পাহানে বাস করতেন। তিনি রাজ অনুগ্রহ লাভের এ সুযোগ না হারিয়ে একটি মুহূর্ত নির্দেশ করে দেন। সুলতান এই নির্ধারণ অনুযায়ী বিদ্রোহদমনে গমন করেন এবং

আরব নরপতি সাদাকাকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে পলায়নপর ইস্পাহানী জ্যোতিষীও পথিমধ্যে ধৃত হয়ে বন্দী হন। বাদশাহ বিদেশী জ্যোতিষীকে পুরস্কৃত করেন, ইস্পাহানী জ্যোতিষীকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে বিচারের আদেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হোল তিনি সাদাকার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করে শুভমুহূর্ত নির্দেশ করে দেন নাই। জ্যোতিষী কিন্তু জানান তাঁর গণনায় কোন ভুল হয় নাই। গণনায় যে সব লগ্ন পাওয়া গিয়েছিল তার সবই অশুভ। জ্যোতিষীরা অশুভ মুহূর্তে কোন কাজ করবার পরামর্শ দিতে ভয় পান—সেই জন্যই তিনি পলায়ন করেছিলেন। তাঁর গণনার সত্যাসত্য বিচারের জন্য তিনি ওমর খৈয়ামের নিকট তাঁর গণনা পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ নিশাপুরে ওমরের নিকট গণনা করবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। ওমর গণনা করে সুলতানকে জানান যে ইস্পাহানী জ্যোতিষীর গণনা নির্ভুল। জ্যোতিষীর প্রাণ রক্ষা হয়।

ওমর নিজে জ্যোতিষে কতটা শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলা যায় না। তবে তিনি যে ভবিষ্যদবানী করতেন সে বিষয়ে বহু প্রমান পাওয়া যায়। তাঁর প্রিয় ছাত্র সুপণ্ডিত নিজামী আরুজি তাঁর চাহার মাকালা গ্রন্থে এ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। নিজামীর ভাষায়ই ঘটনা দুইটির এখানে উল্লেখ করা গেল। "৫০৬ হিজরীতে খাজা ইমাম ওমর খৈয়াম এবং খাজা ইমাম মুজাফফরই ইসফারাজী বলখ নগরে আমীর আবু সাদের গৃহে

উৎসব আমন্ত্রনে আগমন করেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম। কথা প্রসঙ্গে ওমর খৈয়াম বলেন আমার এমন স্থানে কবর হবে যে মৌসুমী বায়ুর প্রতিটি প্রবাহ আমার কবরের উপর ফুল ঝড়িয়ে দেবে। তাঁর কথা তখন আমি বিশ্বাস করি নাই। এই ঘটনার পঁচিশ বৎসর পরে আমি একবার নিশাপুরে যাই। তখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর ভবিষ্যদবানীর কথা স্মরণ হয়। এ বাণী কতদূর সফল হয়েছে দেখবার জন্যে আমি একজন পথ প্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে সাবই-জুম্মার দিন তাঁর কবর দেখতে যাই। হীরা গোরস্তানের বাম দিকে দেওয়ালের কোণে তাঁর কবর রয়েছে। কবরের চার ধার লাল পীচ এবং ন্যাসপাতি ফুলে এমন আচ্ছাদিত যে সেটাকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ফুল ঝড়ে পড়ছে কবরের উপর। তাঁর বলখ নগরের ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা মনে পড়ল। তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁর প্রত্যেকটি বাণী সফল হয়েছে দেখে আমি আর ক্রন্দন সম্বরণ করতে পারলুম না।"

অন্য ঘটনাটি হোল নৃপতির শিকার সম্বন্ধে। "বোখারার নৃপতি সুলতান খাকান শামস্‌ উলমুলক্‌ ওমর খৈয়ামকে শিকারের জন্য একটি শুভ দিন স্থির করে দেবার আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশও দেন যে দিনটিতে যেন মেঘের কোন চিহ্নও না থাকে এবং আকাশও পরিষ্কার হয়। ওমর খৈয়াম দুইদিন গননার পর একটি দিন স্থির করে দেন এবং নিজেও সুলতানের

শিকার যাত্রার সঙ্গী হন। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরেই সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে ফেলল। রাজপারিষদগণ ওমরকে বিদ্রূপ করা সুরু করলেন। সুলতানও বিমর্ষ চিত্তে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। ওমর কিন্তু দৃঢ় চিত্ত। তিনি বললেন এ মেঘ দেখে চিন্তা করবার কোন কারণই নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশ মেঘ শূন্য হয়ে পড়বে এবং পাঁচ দিন পর্যন্ত মেঘশূন্য থাকবে। ওমরের ভবিষ্যদবানী একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।"

ওমর খৈয়াম প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থাদির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেও ওমরের বিজ্ঞান প্রীতিই বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। এক রুবাইয়াত ছাড়া কবিতা বা কাব্য বলে অন্য কোন গ্রন্থই তিনি রচনা করেন নাই। তিনি সব সমেত বাইশখানা গ্রন্থ রচনা করেন বলে নানা গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায় তবে এই বাইশখানার মধ্যে এ পর্যন্ত বিশখানার নাম জানা গিয়েছে।

১। রুবাইয়াত। ২। আলজাবর ওয়াল মুকাবেলা (লিডেন, প্যারি এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি বর্তমান। কিছুদিন পূর্বে Columbia University-র Prof. D. L. Smith লাহোরে এক পুরান পুস্তক বিক্রেতার দোকান থেকেও একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন)। ৩। আল-জিজ-ই-মালিকশাহী (দিনপঞ্জী সম্বন্ধে গ্রন্থ)। ৪। আলকাউল ওয়াল তাকলিফ (metaphysics সম্বন্ধে গ্রন্থ) ৫। আলওয়াজুফ (metaphysics সম্বন্ধে গ্রন্থ)। ৬। লাওয়াজিমুল আমকিনা (প্রাকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ, বার্লিনে একখানা পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান) ৭। মিজান

উলহিকাম (রসায়ন সম্বন্ধে গ্রন্থ-গথা লাইব্রেরীতে একখানা পাণ্ডুলিপি বর্তমান) ৮। মুসকিলাত-ই-হিসাব (ইউক্লিডের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা—মিউনিক ও লিডেনে পাণ্ডুলিপি বর্তমান)। ৯। নিজাম উলমুলক (রাজনীতি নিয়ে আলোচনা) ১০। দার ইলমে কুল্লিয়াত (প্যারিসে পাণ্ডুলিপি বর্তমান)। ১১। নওরোজনামা। ১২। A Hand book on Natural Science (আরবী নামা জানা যায় নাই)। ১৩। The Exactitude on the Indian Method of extracting square and cube roots (আরবী নাম জানা যায় নাই)। ১৪। এরাইয়াস্থন নাফিসা। ১৫। গথা লাইব্রেরীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওমরের একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বর্তমান—বাংলা অনুবাদে এর নাম দাঁড়াবে "মণিরত্ন বিজ্ঞান"। ১৬। রিসালা ফি বারাহিন আল জাবর ওয়াল মুকাবেলা ১৭। রিসালা ফি শারহ মা উশকিলা মিন মুসদারাত কিতাবু উকলিদাস ১৮। কিতাবুল বুরহান আলা তুরুক ইসতিখরাজ আজলা আলমুরাব্বাত ওয়াল মুকাআবাত ১৯। রিসালা মুকাবাহ ২০। ইলমুল মাসাইয়া ওয়াল মুকাবাত।

ওমরের পাঞ্জিকা সংস্কার কাজে যে সাতজন বিজ্ঞানবিদ নিয়ে বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয় তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এঁদের সবাইকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলা ঠিক হবে না, তবে ওমরের সঙ্গী হিসাবে তাঁদের সম্বন্ধেও

এখানে উল্লেখ করা গেল। এ সাতজনের নাম হোল খোয়াজা আবুহাতেম আল মুজাফফর আসফাজারী, আবুল ফতেহ আবদুর রহমান আলখাজানি, মোহাম্মদ কাজীম, হাকিম আবুল আককাস লুকরী, মায়মুন ইবনে ওয়্সি, মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ মামুরী বায়হকী, আবুল ফতেহ ইবনে কুশাক।

আসফাজারী

আবু হাতেমের পূর্ণ নাম হোল আল মুজাফফর ইবনে ইসমাইল আল আসফাজারী। আসফাজারী নাম হোল তাঁর বাসস্থানের নামানুযায়ী। হীরাটের দক্ষিণে, সিজিস্তানের অনতি দূরে খোরসানে আসফাজারী অবস্থিত। আসফাজারীর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধেও তথৈবচ: যতদূর জানা যায় ১১২২ খৃঃ অব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

আসফাজারী অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় সুপণ্ডিত বলে বিখ্যাত ছিলেন। এই দুই বিষয়েই তিনি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন। গ্রন্থগুলিই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও জ্যামিতিতে তাঁর অবাধ অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ হিসাবে সে সময়ে তিনি ওমর খৈয়ামের নীচেই স্থান পেতেন। এদিক দিয়ে বিদ্বৎ সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেক পূর্বেই প্রচারিত হয়ে পড়ে এবং সেই জন্যই তিনি ওমরের বন্ধুত্ব লাভেও সমর্থ হন। জ্যামিতিতে

তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় হোল ইউক্লিডের সংক্ষিপ্তসার রচনায়।* তিনি "ইখতিসার নিওমুল উকলিদাস" নামে ইউক্লিডের চতুর্দশখণ্ড পর্যন্ত জ্যামিতির একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির চতুর্দশখণ্ডটুকু L. A. Sedillot কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে একটি তুলাদণ্ড প্রস্তুত করেন এবং এ সম্বন্ধে একখানি নাতিবৃহৎ গ্রন্থও রচনা করেন। গ্রন্থে তুলাদণ্ডের ব্যবহার, কতখানি নির্ভুলভাবে এর দ্বারা ওজন পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদির সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয় এ তুলাদণ্ডের বিশেষ ব্যবহার হতে পারে নাই। কিছুদিন পরেই এক অংশ ভেঙ্গে গিয়ে তুলাদণ্ডটি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অনেকের মতে এই ভাঙ্গার মধ্যে ধনরক্ষকের কারসাজি ছিল। পাছে নিজের চৌর্যবৃত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়ে একে ভেঙ্গে অকর্মণ্য করে ফেলাই তার কাছে বুদ্ধির পরিচয় বলে মনে হয় এবং তুলাদণ্ডটিরও অকাল মৃত্যু হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজ আর একে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেন নাই। অসাধারণ পরিশ্রম ও অশেষ সাধনার ধন এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় বৈজ্ঞানিক খুবই কাতর হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইসলামে ধনী নির্ধন, প্রভু দাসের মধ্যে যে বিশেষ প্রভেদ করা হত না, প্রতিভা থাকলেই তার আদর হত, সে প্রতিভাবান ব্যক্তিটি যে কোন বংশেরই হোক না কেন, তার

অন্যতম উদাহরণ হোল আবুলফতেহ আবদুর রহমান আলমনসুর আল খাজিনীর জীবনী। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মারভ প্রদেশের এক ধনীর (আলি আলখাজিন আলমারওয়াজী) ক্রীতদাস। শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ দেখে মনিব তাঁকে মুক্তি দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে দেন। মারভ প্রদেশেই তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। উত্তর কালে এই ক্রীতদাসের প্রতিভায়ই বিজ্ঞানজগৎ উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। গণিতশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান সঞ্জর সেলজুকীর রাজত্বকালে তিনিও পঞ্জিকার সংস্কার করেন। এই পঞ্জিকা সঞ্জুরী পঞ্জিকা নামে ইতিহাসে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি মানমন্দিরের নানা পর্যবেক্ষণের ফল নিয়ে একখানি astronomical tableও তৈরী করেন। এই টেবলটির নাম হোল আলজিজ আলমোতাহহার আস সঞ্জুরী। এতে ১১১৫-১৬ খৃঃ অব্দে মারভের অক্ষরেখায় যে সমস্ত নক্ষত্র দেখা যেত তাদের অবস্থান ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আলখাজিনী

হাকিম আবুল আব্বাস লুকরীও ছিলেন মারভ প্রদেশের অধিবাসী। এই সময় বিজ্ঞানচর্চা সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রসারিত হয়ে পড়ে। অন্য সময়ে যেমন সাধারণত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের মধ্যেই অসাধারণ মনীষা সীমাবদ্ধ ছিল, এ সময়ে তার অনেকটা ব্যতিক্রম ঘটে। এই বিজ্ঞান চর্চার প্রবাহে ধনীরাও বিশেষ পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই

বিজ্ঞান চর্চায় যোগ দেন। এঁদেরই একজন হোলেন হাকিম লুকরী। হাকিম লুকরী ছিলেন ধনী আমির। তিনি নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। প্রধানত

হাকিম লুকরী

তাঁরই উৎসাহে খোরাসানে গণিত-বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হয় বললে অত্যুক্তি হয় না। গণিতে তিনি খুবই সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পঞ্জিকা সংস্কারে ওমরের সহায়তা করেন। তিনি কবি হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মোহম্মদ কাজীনের বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না।

মোহম্মদ কাজীন

তবে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে তিনি বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমান ওমর খৈয়ামের সহকারী সপ্তকের মধ্যে তাঁর স্থান।

অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকেও শিক্ষার দিকে বিশেষ করে বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতেও এমন

নাজিব ওস্তি

লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল না। মোহাম্মদ ইবনে নাজিব ওস্তিও তাঁদের একজন। তিনি ব্যবসায়ে ছিলেন চিকিৎসক কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রই তাঁকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশেষ কম ছিল না। গণিতবিদ ও সুচিকিৎসক এই দুই হিসাবেই তিনি তখনকার লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। উজীর নিজাম-উল-মুলক তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি গণিত বিজ্ঞানে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

মামুরী বায়হকীর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ বিন আহম্মদ

মামুরী বায়হকী। তিনি গণিত বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া পরিমিতি নিয়েও তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন।

মামুরী বায়হকী

এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থখানিই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। গ্রন্থখানি এ বিষয়ে অতীব মূল্যবান বলে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সুলতান মালিক শাহ তাঁকে ইস্পাহানের মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা করতে নিজেই অনুরোধ জানিয়ে পাঠান এবং সরকারী তহবিল থেকে বৃত্তি দিয়ে তাঁকে মানমন্দিরে নিয়োগ করেন। ওমর খৈয়াম তাঁকে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসাবে সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। বায়হকী ইসমাইলী সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হন।

ইবনে কুশাক বা আবুল ফতেহ ইবনে কুশাকও সুলতান সঞ্জরের রাজত্বকালীন একজন প্রসিদ্ধ গণিতবিদ। তৎকালে জ্যোতিবিদ হিসাবে তিনিও বেশ খ্যাত ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলো সযত্নে সুলতানের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয়।

ইবনে কুশাক

ওমরের সহকর্মী বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই একাদশ শতাব্দীতে এন্তেকাল করেন, কেউ কেউ বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নানা কারণে তাঁদের অনেকেরই কাজ ওমরের কাজের সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে পড়ে—সুলতানের পঞ্জিকা সংস্কার যে তাদের অন্যতম সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই—ফলে তাঁদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশ পেতে বাধা পায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর বাগদাদ তথা প্রাচ্যের মুসলিম জগতের অঙ্ক শাস্ত্রের ইতিহাস প্রধানত ওমর খৈয়ামের প্রতিভার ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁকে ছাড়িয়ে কেউই এগিয়ে যেতে পারেন নাই; অনেকেই তাঁর সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। এমনিতে যাঁরা সহকারী ছিলেন না, তাঁদের উপরও ওমরের প্রভাব বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। যা হোক ওমরের প্রতিভার আওতার বাইরে কাজ করে যাঁরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল বাকী, আলবদি আলআস্তারলাবি, আলখারাকী, আবদুল মালিক আসশিরাজী, ইবনোদ দাহহান প্রভৃতির নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

আবদুল বাকী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লোক। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী আলবাগদাদী। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতিই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী ভাবে। তিনি ইউক্লিডের দশম পুস্তকের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ভাষ্যখানি অনুরূপ অন্যান্য ভাষ্যের মত শুধু জ্যামিতিক অঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৈজ্ঞানিক এতে সাংখ্যক সমস্যা (numerical problems) নিয়েও আলোচনা করেছেন। এইজন্যে গ্রন্থখানি তখন খুবই সমাদর লাভ করে। পরবর্তী কালেও এর সমাদরের ক্ষুণ্ণতা আসে নাই। এখানি দুই দুইবার সম্পাদিত হয়। জিরার্ড (Gherardo Cremonese) একে

আবদুল বাকী

Liber Juder Super Decirum Euclids নামে লাটিনে অনুবাদ করেন।

আলবদি আলআস্তারলবির পূর্ণ নাম হোল আবুল কাসেম হিবাত উল্লাহ, ইবনোল হোসায়েন ইবনে আহম্মদ বদিয়ুজ্জমান আল আস্তারলবি আলবাগদাদী আল ইস্পাহানী। তবে সাধারণত তিনি আলবদি আলআস্তারলবি নামেই পরিচিত। আস্তারলবি নামের কারণ হোল তাঁর আস্তারলব প্রণয়নে অসাধারণ দক্ষতা।

আলবদি আলআস্তারলবি

অবশ্য তিনি আলজারকালির আস্তারলবের মধ্যে কোন নুতন দৃষ্টিভঙ্গী কি নুতন কোন বৈজ্ঞানিক অংশের সংযোজনা করতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না তবে সে সময়ে যে তিনি আস্তারলব সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ বলেই পরিচিত ছিলেন, ইবনোল কিফ্‌তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাতেই তার প্রমান পাওয়া যায়। শুধু ইবনোল কিফতিই নয় অন্যান্য জীবনী লেখকের লেখাতেও তাঁর দক্ষতার প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। আস্তারলবে দক্ষতা অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে দক্ষতারই নামান্তর বলা চলে। আলবদিও তৎকালে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।

পূর্বের শতাব্দীর মত এ শতাব্দীতেও বাগদাদের আশে পাশের সমস্ত রাজ্যেই বিজ্ঞান চর্চা বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল। প্রায় সমস্ত রাজ্যেই মানমন্দির স্থাপিত হয়। মালিক শাহের দেখাদেখি অন্যান্য রাজ্যেও এমনি জ্যোতিবিজ্ঞানিক কাজের সাড়া পড়ে যায়। ইরাকের সেলজুক বংশীয় সুলতান

মুখিতউদ্দিন মাহমুদও মালিক শাহের মত বৈজ্ঞানিক কার্যে উৎসাহ যোগান.। তিনি তাঁর প্রাসাদে একটি মানমন্দির স্থাপন করেন এবং আলবদির উপর তার ভার দেন। ওমর খৈয়ামের মত আলবদি আলআস্তারলবিও কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে ১১২৯—১১৩০ খৃঃ অব্দে এখানে নানা পর্যবেক্ষণ কার্য চালান। এই পর্যবেক্ষণের ফল নিয়ে একটি টেবলও তৈরী হয়। বৈজ্ঞানিক তার উৎসাহ দাতার নামানুসারে এর নাম রাখেন "মোহাম্মদীয় টেবল" এবং সুলতানকেই এখানা উৎসর্গ করেন। ইরাকে সুলতানের মানমন্দিরের ভার নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আলবদি ইস্পাহানে বাস করতেন। ১১১৬ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তাঁর এখানে অবস্থিতির খবর পাওয়া যায়। সেই হিসাবে তিনি আলইস্পাহানী নামেও অভিহিত হতেন। সুলতানের মানমন্দিরে কার্য উপলক্ষেই তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং সেখানেই ১১৩৯—৪০ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলখারাকীর পূর্ণ নাম হোল আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আবু বিশর বাহাউদ্দিন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আবু মোহাম্মদ আবতুলজব্বার ইবনে মোহাম্মদ নামও দেখতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই তুই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন, কিম্বা অন্য কোন কারণে তিনি এই তুই নামই ব্যবহার করতেন। তাঁর আলখারাকী নাম হয়, খুব সম্ভব তাঁর জন্মস্থানের নামানুসারেই। তাঁর জন্মস্থানের নাম হোল খারাক। খারাক খোরাসানের মারভের নিকটেই অবস্থিত। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ

হয়ে খারিজমশাহ কুতুবউদ্দিন মোহাম্মদ (১০৯৭-১১২৭) বা আতসির (১১২৭-১১৫৬), তাঁকে মারভে আনয়ন করেন এবং রাজদরবারের বিদ্বৎ পরিষদের সভ্য নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি শামসউদ্দিন আবুল হোসেন আলির সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন এবং তাঁরই জন্যে কিতাবুত তাবসিরা নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। মারভ নগরেই ৫৩৩ হিজরীতে (১১৩৮-৩৯ খৃঃ অব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়।

আলখারাকী একাধারে গণিতবিদ, ভৌগলিক ও দার্শনিক। গণিতশাস্ত্রের মধ্যে শুদ্ধ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেই তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায় তিনি গণিতশাস্ত্রে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তবে তার মধ্যে মাত্র চারখানার নাম জানা গিয়েছে। এ চারখানার মধ্যেও দুইখানার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তাঁর গ্রন্থ চারিখানির নাম হোল (১) মুনতাহা আলইদরাক্ ফিত্তাকসিম আল আফলাক, গোলকের বিভাগ সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ বিজ্ঞান (The highest understanding on the division of the Spheres) (২) কিতাবুত তাবসিরা ফি ইলমোল হাইয়া-- জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক (৩) আররিসালা আসসামিলা শুদ্ধ গণিত সম্বন্ধে সুবিস্তারিত আলোচনা বহুল গ্রন্থ (৪) আররিসালা আল মাগরিবিয়া।

গ্রন্থগুলির মধ্যে মুনতাহাই সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এখানিকে ইবনোল হাইছামের

জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের উন্নততর সংস্করণ বলা যেতে পারে। গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমভাগে গোলকের বিন্যাস (তারকিবুল আফলাক arrangement of the spheres) ও তাদের গতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে পৃথিবীর আকার, তাকে বাসযোগ্য ও অযোগ্য স্থান হিসাবে বিভাগ, ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে ascendent (আ আলি) এবং ascension (মাতা আলি) এর পার্থক্য, পঞ্চ সমুদ্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে—তৃতীয় ভাগে অব্দ (chronology) সংযোগ (কিরান—conjunction) প্রধানত শনি ও বৃহস্পতির সংযোগ—আবর্তন কাল (দাওব—period of revolution)—যেমন সংযোগ স্থলের আবর্তন কাল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ তাবসিরা প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ তবে মুনতাহাতে যেমন পঞ্চ সমুদ্রের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এটিতে সে সব আলোচনা স্থান পায় নাই।

আলখারাকী

গ্রহগুলির আবর্তন নিয়ে যে বৈজ্ঞানিকগণ মহা সমস্যায় পড়েছিলেন, আলখারাকীর উদ্ভূত থিওরীতে তার কিছু প্রমান পাওয়া যায়। গ্রহগুলি যে ঘুরছে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন কিন্তু এগুলি কেমন করে ঘোরে, কি ভাবেই বা শূন্যরাজ্যে অবস্থান করে, সে সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার শেষ হয়নি সেদিন পর্যন্তও। শূন্য রাজ্যে ইথারের অস্তিত্বকে কল্পনা করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে ঘোরার কথা মেনে

নিলে সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলির ব্যাখ্যা খুব সহজসাধ্য নয়। আবর্তনের ফলে গ্রহের সম্মুখের চাপ আপনিই বেশী হয়ে পড়ে, পিছনে তেমনি আবার চাপ কম হয়ে শূন্যের (vaccum) সৃষ্টি হয়। এসবের সমাধান করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দশম শতাব্দীর আবু জাফর আলি এবং একাদশ শতাব্দীর ইবনোল হাইছাম এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

আবদুল মালিক আসশিরাজী

আবদুল মালিক আসশিরাজীর পূর্ণ নাম হোল আবুল হোসেন আবদুল মালিক ইবনে মোহাম্মদ আসশিরাজী। তাঁর জন্মতারিখ বা স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। নাম দেখে মনে হয় শিরাজ নগরের কোথাও তাঁর জন্ম হয়। গণিত শাস্ত্রের মধ্যে কনিকসের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তিনি ছাবেত ইবনে কোরা এবং হিলাল আলহিমসীর এপোলোনিয়াসের কনিকসের অনুবাদ ভিত্তি করে সুন্দর একখানি কনিকসের গ্রন্থ রচনা করেন। এখানি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান আছে। কনিকস ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর অবাধ অধিকার ছিল বলে মনে হয়। তিনি আলমাজেষ্টের একখানি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি তৎকালে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কুতুবুদ্দীন শিরাজী এর পারসী অনুবাদ করেন।

ইবনোদ দাহহানের পূর্ণ নাম হোল আবু শুজা মোহাম্মদ

ইবনে আলি ইবনে শোয়ায়েব ইবনোদ দাহহান। নাম দেখে মনে হয় তিনি কোন অভিজাত বংশের উত্তরাধিকারিত্বের সম্মান দাবী করতে অপারগ। ইবনোদ দাহহান—অর্থ হোল তৈল বিক্রেতার পুত্র। বাগদাদেই তাঁর জন্ম হয়, কিন্তু জন্মতারিখ সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যাহোক বাগদাদ জন্মভূমি হোলেও, এখানে তিনি জীবনযাত্রার পথে কি অন্য কোন দিক দিয়ে সুবিধা করে উঠতে পারেন নাই। তাঁর ফারাজ সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান, অপরিসীম ধৈর্য, কোন কিছুই বাগদাদের অভিজাত কাঠিন্যকে নুইয়ে দিতে পারে নাই। তাই তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে মসুলে গমন করেন। এখানে তাঁর ভাগ্য কিছু সুপ্রসন্ন হয়। তিনি উজীর জামালউদ্দীন ইস্পাহানীর অধীনে একটি চাকরী পান। কিন্তু কোন কারণে এখানেও তিনি বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। মসুল ত্যাগ করে তিনি সুলতান সালাহউদ্দীনের অধীনে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। সালাহউদ্দীন তাঁকে মাইয়াফারিকিনের দপ্তরের ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন। বৈজ্ঞানিকের দুর্ভাগ্য কিন্তু এখানেও বাদ সাধল। সহরের গভর্ণরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি সামান্য পেনসনে চাকুরীতে ইস্তাফা দিতে বাধ্য হন। এর পরে তিনি দামাস্কাসে বসবাস সুরু করেন। সামান্য পেনসনে নিতান্ত হীন অবস্থায় তাঁর দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ হোত। কিন্তু এই দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট কিছুই তাঁর মানসিক শক্তিকে একটুও দমিয়ে দিতে পারে নাই। ভাগ্য অন্বেষণে ১১৯০ খৃঃ অব্দে তিনি মিসরে

গমন করেন কিন্তু এখান থেকেও তাঁকে হতাশ হয়েই ফিরে আসতে হয়।

এমনি নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর জ্ঞানস্পৃহাকে সম্পূর্ণভাবেই সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। বিজ্ঞানে তথা গণিতশাস্ত্রে তাঁর সর্বপ্রধান কাজ হোল "ফারাজ" বা সম্পত্তি বণ্টনের হিসাব ঠিক করা। এমনিতে কাজটি বিশেষ কঠিন মনে না হোলেও সম্পর্ক অনুসারে সম্পত্তি বণ্টনের হিসাবে বেশ মানসিক ধৈর্য ও অঙ্কশাস্ত্রের উপর বিশেষ প্রতিপত্তি থাকার দরকার। তিনি নিজে শাফী মতাবলম্বী হোলেও অন্যান্য মতগুলির সঙ্গেও বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। ১১৬৬-৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি সম্পত্তি বণ্টনের সহজ উপায় নির্ধারণ করে একটি টেবল তৈরী করেন। টেবলটির নাম হোল "তাকবিম আননজর ফিল মাসায়েল আল খিলাফিয়া"। টেবলটি দশ কোলামে বিভক্ত। এতে প্রত্যেকটী সমস্যার চার মত অনুসারে সমাধান দেওয়া হয়েছে। শুধু সমাধানেই বৈজ্ঞানিকের কাজ শেষ হয় নাই তিনি এর সঙ্গে প্রত্যেক মতের যুক্তি ও কারণ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজের যুক্তি ও কারণও অবতারণা করেছেন।

ইবনোদ দাহহান

টেবলটির প্রারম্ভে, ভূমিকায় ব্যাকরণ ও লজিক সম্বন্ধে আলোচনাও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। "খারিবুল হামিদ" নামে তিনি অন্য একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি ষোল খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানিতে তিনি এমন

সুকৌশলে কতগুলি অক্ষর ব্যবহার করেছেন যে এ থেকে যে কোন শব্দ অতি সহজেই বের করা যেতে পারে। এ ছাড়া তিনি একখানি ইতিহাসও সম্পাদনা করেন।

যতদূর জানা যায় বৈজ্ঞানিক দেশ বিদেশে ভ্রমণের খুবই অনুরাগী ছিলেন। ঐতিহাসিক আবুল বরকত ইবনোল মুস্তাফী তাঁর আরবেলার ইতিহাসে আদদাহহানকে বিদেশী পরিব্রাজক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকের মতে আদদাহহান ছিলেন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তিনি অনেকগুলি কবিতাও রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক শেখ তাজউদ্দিন আবুল ইওমন ইবনোল হাসান আলকিন্দির প্রশংসাত্মক যে কবিতা রচনা করেন, ঐতিহাসিক সেটি উধৃত করে তাঁর কবিত্ব শক্তির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কাতিব ইমাদউদ্দিন তাঁর খারিজাতেও বৈজ্ঞানিকের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে প্রশংসা করেছেন এবং কতকগুলি কবিতা উধৃতও করেছেন। একটি কবিতা হোল বৈয়াকরণিক আবু মোহাম্মদ সাইদ ইবনোল মুবারক ইবনোদ দাহহান সম্বন্ধে। এই বৈয়াকরণিক সাধারণত আননাসিহ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর একটি চোখ ছিল অন্ধ। কবিতাটি হোল "আদদাহনের ছেলেটি তার চেয়েও বেশী চালাক দুইদিক দিয়ে—এযেন সমুদ্রের বিস্ময়; তুমি এর উপযুক্ত বর্ণনা দিতে পার—ছেলেটির একটি চোখ দুইটি মুখ।" অন্য একটি কবিতা হোল কোন এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির রোগমুক্তি উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে। "লোকে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তুমি

যেদিন আরোগ্য লাভ করবে সেদিন তারা রোজা রাখবে। আমিই শুধু প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে সেদিন রোজা রাখব না বরং রোজা ভাঙ্গব। আমি জানতুম যে আরোগ্যের দিন একটি উৎসব লেগে যাবে, এমনি উৎসবের দিন আমি রোজা রাখা পছন্দ করি না যদিও রোজা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ীই হয়ে থাকে।" এ ছাড়া তিনি আবৃত্তির উপযোগীও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং নানা টেবল ব্যবহারেও তিনি অতীব দক্ষ ছিলেন।

৫৯০ হিজরী সফর মাসে (১১৯১ খৃঃ অব্দ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) ইউফ্রেটিস নদীর তীরে আলহিল্লাতাস সাইফিয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুও হয় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায়। তিনি হজ করবার জন্যে দামস্কাস থেকে মক্কাশরীফে গমন করেন এবং হজ সেরে ইরাক অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে বাগদাদ ও কুফার মধ্যবর্তী আলহিল্লা নগরীতে তাঁর উটটি হঠাৎ মাটীতে পড়ে যায়। উটের গদির একখানা কাঠে তাঁর মুখে খুব জোরে আঘাত লাগে এবং এতেই তিনি সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মিসরও একাদশ শতাব্দীর মতই রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় পরিপূর্ণ। পূর্ব শতাব্দীর জের টেনে আসার সঙ্গে সঙ্গে এর এদিক দিয়ে ত কোন উন্নতিই হয় নাই বরং শুধু এতদিনকার রাজত্বকারী ফাতেমীয় বংশের এই বারেই হয়

পতন। খলিফা আলআজিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিসরে ফাতেমীয় খেলাফত এবং শিয়া প্রাধান্য বিদূরিত হয়, সুলতান সালাহউদ্দিনের অধীনে সুন্নী প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। যা হোক সালাহউদ্দিনের অধীনে রাজনৈতিক শান্তি ফিরে আসলেও পূর্বের বিজ্ঞানবুদ্ধি আর ফিরে আসে নাই। নৃপতিদের মধ্যেও আর আলআজিজ বা আলহাকিমের বিজ্ঞান অনুরাগ খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ব শতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চায় প্রতিযোগিতার পরমুহূর্তে একপক্ষ এরূপভাবে নিঃশব্দ হয়ে যাওয়া যেমন বিস্ময়জনক তেমনি দুঃখের বিষয়ও বটে। তবুও অদৃষ্টের পরিহাসের মত এ ঐতিহাসিক সত্য। এই শতাব্দীর মিসরের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আদনান আলআইনজারবী এবং আবুস সালাতের নামই সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। তবে দুইজনের কেউই খাঁটি মিসরবাসী নন। তাঁদের কার্যকালের কিছু অংশমাত্র মিসরে অতিবাহিত হয়েছিল।

আদনান আলআইনজারবী

আদনান আলআইনজারবীর পূর্ণ নাম হোল আবুনসর আদনান ইবনে নসর আলআইনজারবী। সাইলেসিয়ার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত আইনজারবাতে তাঁর জন্ম হয়। সেই জন্যেই তিনি আইনজারবী নামে পরিচিত। আইনজারবার পূর্বেকার নাম হোল "আলজারবোস"। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাওসকোরাইডিসের (Dioscorides) জন্মস্থান হিসাবেই এ ইতিহাসে বিখ্যাত।

ইতিহাস বিখ্যাত স্থানে জন্ম হোলেও আদনান কিন্তু জন্মস্থানে প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগই পান নাই। পাঠ সমাপ্তির পরে তিনি বাগদাদে বসবাস স্থাপন করেন। ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং সে হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি সম্পন্নও ছিলেন। খুব সম্ভব এই চিকিৎসার খ্যাতিই তাঁকে বাগদাদ ছাড়তে বাধ্য করে। তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে কায়রোতে গমন করেন এবং খলিফা আজজাফিরের দরবারে রাজচিকিৎসক হিসাবে স্থান লাভ করেন। খলিফা আজজাফিরের পিতা খলিফা আলহাফিজের বদহজমের চিকিৎসার জন্য অপূর্ব ডঙ্কার আবিষ্কারে আদনানের হাত ছিল কিনা জানা যায় না। যাহোক চিকিৎসা ব্যবসায়ের মধ্যেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিও আকৃষ্ট হন এবং এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাও করেন। তবে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকটা জ্যোতিষেরই ধার ঘেঁসা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়ক হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কতটা কাজে লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে সেই সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন এবং এসম্বন্ধে একখানা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানির নাম হোল কিতাবু ফি মাইয়াহতাজু আত্‌তাবিব মিন ইলমুল ফালাক্ (what the Physician needs [to know] of the science of the celestial sphere.)

১১৫৩-৫৪ খৃঃ অব্দে এই চিকিৎসক গণিতবিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুস সালাতও আদনানের মতই মিসরের অধিবাসী নন। জন্মস্থান হিসাবে তাঁকে স্পেন দেশীয় বললেই ঠিক হয় কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ কালই অতিবাহিত হয় মিসরে; সে হিসাবে তাঁকে মিসরের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে গণনা করাই সঙ্গত হবে।

আবুস সালাত ১০৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে দেনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল ওম্মিয়া ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবিস সানত আবুসসালাত। জন্মস্থানে তিনি বেশীদিন থাকতে পারেন নাই। বোধ হয় এখানে তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পথ পায় নাই। দেনিয়া থেকে তিনি সেভিলে গমন করেন এবং ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানেই অতিবাহিত করেন। সেভিলও কোন কারণে তাঁর মনঃপুত হয় নাই। ১০৯৬ খৃঃ অব্দে তিনি কায়রোতে গমন করেন। ১৬ বৎসর কাল কায়রোতে অতিবাহিত করার পর ১১১২ খৃঃ অব্দে তিনি তিউনিসের মাহদিয়াতে গমন করেন। এইখানেই ১১৩৪ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন চিকিৎসক কিন্তু এরই সঙ্গে গণিত ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও তাঁকে আকৃষ্ট করে। চিকিৎসা বিদ্যায়ও তাঁর প্রতিভা যে বিশেষ সাধারণ স্তরের ছিল না তার প্রমাণ তাঁর চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন। গণিত, ন্যায়শাস্ত্র (Logic) এবং গান সম্বন্ধেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গণিত শাস্ত্রের মধ্যে "রিসালা ফিল আমল বিল আস্তারলব" সব চেয়ে

আবুস সালাত

উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানিতে আস্তারলব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। এরই সঙ্গে Mechanics এবং Hydrostatics নিয়েও তিনি বেশ আলোচনা করেন। এ দু'য়েই তাঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিজ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নেওয়ার জন্যেই তিনি আলেকজেন্দ্রিয়াতে সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজের উত্তোলনের চেষ্টা করেন কিন্তু খুব সম্ভব এতে সফলকাম হন নাই। জ্যামিতি সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন বলে সন্ধান পাওয়া যায়। সঙ্গীত বিজ্ঞানেও তাঁর বিশেষ অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ "রিসালা ফিল মুসিকি" তৎকালে বেশ সমাদর লাভ করে। গ্রন্থখান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিব্রুতে অনুদিত হয়। এই অনুবাদেরও অংশ মাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; মূল গ্রন্থখানির অস্তিত্বেরই কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

শুধু বিজ্ঞানের নীরস কঠোর আলোচনাতেই তাঁর কাজ শেষ হয় নাই তিনি সুরসিক সাহিত্যিক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। মিসর অধিবাসীদের চালচলন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সরল ভাষায় তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম হোল "আর রাসায়েল আল মিসরী"।

স্পেনের দ্বাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসও একটানা সুখের ও শান্তির নয়। এ শতাব্দীতে স্পেনের অধিবাসীদের

নিশ্চিন্ত মনে বাস করবার, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করবার সময় খুব বেশী হয় নি বলা চলে। কিন্তু এ সত্বেও বিজ্ঞান চর্চা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং স্পেনের সমস্ত মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে দ্বাদশ শতাব্দীকেই প্রাধান্য দেওয়া যায়। বার্বার বংশের মোরাবিতদের হাতে পূর্বেকার মুসলিম রাজবংশের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চারও ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য ছিল না অন্তত বার্বারদের শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যের প্রমাণস্বরূপ। আন্দালুসিয়ার সর্বাপেক্ষা শোণিত পিপাসু ভূপতিদেরও বিদ্যোৎসাহিতার খ্যাতি ছিল। কবি, বৈজ্ঞানিক বরাবরই তাঁদের আশ্রয় পেতেন, কিন্তু বার্বাররা এসব বুঝতেন না; কবি বৈজ্ঞানিকরাও তাঁদের কাছে সাহায্য পেতেন না। শিক্ষিত ও সুসভ্য নৃপতিদের আদর্শে নিজেদের আচার ব্যবহার নিয়মিত করতে যেয়ে তাঁরা এরূপ নিকৃষ্ট অনুকরণ করতেন যে, মার্জিত রুচি ব্যক্তির পক্ষে হাস্য সংবরণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। শিক্ষিত সমাজও বার্বারদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না; বার্বারদের নিকট জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাও বিশেষ উৎসাহ পায় নাই। কিন্তু জাতির মনে যখন একবার জ্ঞান পিপাসা জেগে উঠে তখন রাজকীয় অনুৎসাহ, বীতরাগ কোন কিছুই তাকে দমিয়ে দিতে পারে না। স্পেনের বার্বার রাজত্বের বেলায়ও সেই কথাই খাটে। যা হোক বার্বারদের রাজত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৪৫-৪৬) আলমোওয়াহহেদদের হাতে আলমোরাবিত শক্তি

বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মোসলেম স্পেন আবার আফ্রিকার অধীন দেশে পরিণত হয়। আলমোওয়াহহেদদের রাজত্ব কালে বিজ্ঞানচর্চা আবার পূর্ণ তেজে প্রসারিত হয়ে পড়ে। খলিফা ইয়াকুবের বিদ্যোৎসাহিতায় এর নবজীবন প্রতিষ্ঠা হয় বলা চলে। তিনি নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন বিদ্বানগণকেও তেমনি শ্রদ্ধা করতেন। সুচারুরূপে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যে তিনি সেভিলের বিখ্যাত মানমন্দির জিরাল্ডা নির্মাণ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও রাজানুগ্রহ বা রাজ পরিপোষকতা বিশেষ না পেয়েও যাঁরা স্থির মস্তিষ্কে বিজ্ঞান আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন এবং মৌলিক গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে গেছেন তাঁদের মধ্যে জাবির ইবনে আফলাহর নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয়ান পণ্ডিতদের অনুবাদের কল্যাণে জাবির ইবনে আফলাহ "জিবার" এ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে এবং বৈজ্ঞানিক "জিবার" নামেই সর্বত্র পরিচিত হয়ে পড়েন। এই জন্যেই অনেকে তাঁকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসায়নিক জাবির বা আবুমুসা জাবির ইবনে হাইয়ানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। আসলে দুইজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শুধু স্বতন্ত্র ব্যক্তির এই নাম বিভ্রাটই নয়, জাবিরের নাম অন্য দিকেও বিভ্রাট বাধিয়ে তুলেছে বলা যেতে পারে। বর্তমানে বীজগণিতের ইংরেজী নাম "Algebra" শব্দটিও জাবিরের নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল বলে পূর্বে অনেকেই ধারণা করে নিয়েছিলেন।

এ ধারনার মূলে ছিল কতকগুলি লাটিন অনুবাদকারকের অজ্ঞতা। অনুবাদের উৎসাহে তাঁরা আসল জিনিসকেই হারিয়ে ফেলেন। জাবিরকেই এলজেবরার প্রথম আবিষ্কর্তা হিসাবে ধরে নেন এবং তাঁর নাম থেকেই এলজেবরা শব্দটি প্রচলিত হয়েছে বলে প্রচার করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে জাবিরের বহু পূর্বেই "এলজেবরা" নাম প্রবর্তিত হয়।

জাবিরের জন্ম মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কোন খবর পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় সেভিলে তাঁর জন্ম হয় এবং ১১৪০ খৃঃ অব্দ থেকে ১১৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। জন্ম মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে এ অনিশ্চয়তা যে অনেকটা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যই সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; তবে এর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের ঔদাসীন্যও যোগ দিয়েছে। ক্যাজোরির মতে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেভিলে জাবিরের জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকের জীবনী সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর পুত্র ১২০৪ খৃঃ অব্দে মায়মনীয় (Maimonides) নৃপতির সঙ্গে দেখা করেন বলে জানা যায়।

এমনিতে অপরিচয়ের আড়ালে রয়ে গেলেও জাবিরের দানে বিজ্ঞানের ইতিহাস হয়েছে অসামান্যরূপে সমৃদ্ধ। টলেমি এতদিন বিজ্ঞান জগতে যে দেবতার আসন পেয়ে আসছিলেন জাবিরই সর্বপ্রথম সেই আসনকে নাড়া দেন। টলেমির প্রতি অন্ধ ভক্তির ফলে বিজ্ঞান কি ভাবে ব্যাহত হয়ে আসছিল আজজারকালির ঘটনা থেকেই তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর এই আসনকে নাড়া দেবার মত সৎসাহস তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের মনে জেগে উঠতে পারে নাই। নানা দিক থেকে নানা ব্যক্তি উঁকি ঝুঁকি দিলেও একে ঝেড়ে ফেলবার অভিমত কেউই প্রকাশ করেন নাই। জাবিরই সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির এতদিনকার পূজ্য মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দেন।

গোলীয় ত্রিকোণমিতিতে (Spehrical Trigonometry) এর পূর্বেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ নানা উদ্ভাবন করেছিলেন —জাবির তাঁর স্বাধীন মতবাদের দ্বারা একে আরও উন্নত করে তোলেন। তিনি টলেমির উদ্ভাবিত এতদিনকার অতি শ্রদ্ধার তলে নিষ্পেষিত 'Rule of six quantities এর বৈজ্ঞানিকত্বের মধ্যেকার ত্রুটি ঘোষণা করেন এবং এ যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্তরায় হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে সে নিপুনতার সঙ্গেই দেখিয়ে দেন। তিনি এর পরিবর্তে "Rule of four quantities" প্রচলন করেন। ত্রিকোণমিতির ভাষায় একে বলা যেতে পারে যে যদি PP, এবং QQ, A বিন্দুতে ছেদকারী দুইটি বৃহৎ বৃত্তের চাপ হয় এবং PQ ও P_1Q_1, QQ এর লম্বতে অঙ্কিত বৃহৎ বৃত্তের চাপ হয় তাহোলে

$$\text{Sin AP} : \text{Sin PQ} = \text{Sin AP}_1 : \text{Sin P}_1\text{Q}_1$$

এ থেকেই তিনি গোলীয় সমকোণী ত্রিভূজের (Spherical right angled triangle) ত্রিকোণমিতিক ফরমুলাগুলিও উদ্ভাবন করেন। জাবিরের এই নব উদ্ভাবনী পন্থাই তাঁকে

বিজ্ঞান ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তবে তাঁর বহু পূর্বেই এ ফরমুলাগুলি ত্রিকোণমিতিতে প্রচলিত হয়ে পড়ে। ছাবেত ইবনে কোরাই সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞান জগতে সাইন ফরমুলার প্রবর্তন করেন। তার পর থেকেই এ শনৈ শনৈ উন্নতির পথেই যেতে থাকে। ক্রমশ জটিলতর ও সূক্ষ্মতর বিষয়ের অনুধাবনেই পূর্বেকার অনুসৃত পন্থার দোষ ত্রুটি বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে এসে দেখা দিতে থাকে এবং আস্তে আস্তে সেগুলোর সমাধানও হতে থাকে। গোলীয় সমকোণী ত্রিভূজের ছয়টি ত্রিকোণমিতিক ফরমুলার মধ্যে $\text{Cos A} = \text{Cos a Sin B}$ ফরমুলাটি সাধারনত জাবেরের উদ্ভাবিত বলে পরিচিত। তাঁর নামে এটি প্রচলিত হওয়ার কারণ বোঝা দুষ্কর। আলবেরুনীও ত্রিকোণমিতির এই অত্যাবশ্যকীয় ফরমুলাটি আবিষ্কার করেন। খুব সম্ভব আলবেরুনীর নীরস ভাষার জন্যেই সাধারন বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে অনুসরণ করতে সক্ষম হন নাই ; তাই তাঁর আবিষ্কৃত ফরমুলাও গ্রন্থের বাইরে প্রচার লাভ করতে পারে নাই। জাবিরের নব উদ্ভাবন ও অভিনব ভাবে ত্রিকোণমিতিক ফরমুলাগুলির ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে এটি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই ফরমুলাটিও তাঁর ফরমুলা নামে সর্বসাধারনে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

গোলীয় ত্রিকোণমিতিতেই জাবিরের মনোযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল মনে হয়। এতে তিনি যেমন ভাবে চিরাচরিত পন্থাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অসমসাহসিকতার সঙ্গে

নব উদ্ভাবনের পথে অগ্রসর হয়েছেন সরল ত্রিকোণমিতির (Plane Trigonometry) বেলায় তাঁর সে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানে তিনি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের পথই অনুসরণ করেছেন। খুব সম্ভব জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার জন্যই গোলীয় ত্রিকোণমিতির দিকে তাঁর নজর পড়ে. এবং এর দোষ ত্রুটিও তাই তাঁর চোখে ধরা পড়ে কিন্তু সরল ত্রিকোণমিতির বেলায় তেমন কোন সুযোগই হয় নাই: তাই এদিকে তিনি বিশেষ নজরও দেন নাই। সরল ত্রিকোণমিতিতে তিনি সোজাসুজি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ করেছেন। অনেক সময়ে তিনি তাঁর পূর্বেকার মুসলিম বৈজ্ঞানিকদেরও অনুসরণ করেন নাই। তাঁদের ব্যবহৃত ও ত্রিকোণমিতিতে সর্বজন গৃহীত সাইন কোসাইনের পরিবর্তে তিনি টলেমি তথা গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের "Chord of double the angle" ব্যবহার করেছেন। এই অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এমনি অন্ধ অনুকরণ সত্যিই আশ্চর্যজনক। মানুষ যে রক্ষণশীলতা একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে পারে না এ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্যাজোরী সত্যি সত্যিই বলেছেন "Radical and bold as were his innovations in Spherical Trigonometry, in Plane Trigonometry he followed slavishly the old beaten path of the Greeks..... So painful was the departure from old ideas, even to an independent Arab."

ত্রিকোণমিতির বেলায় যেমন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেলায়ও সেই কথাই খাটে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বেকার আধ্যাত্মিকতার হাত তিনিও এড়াতে পারেন নাই বটে কিন্তু এখানেও তিনি এতদিনকার পূজ্য টলেমির মতবাদকে ভীষণভাবে সমালোচনা করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে নয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—এগুলির নাম "কিতাবুল হায়া" (জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ)। বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে এর নাম দেখা যায় "ইসলাহোলমাজিস্তি" ("আলমাজেষ্টের সংশোধন)। এর মধ্যে প্রথমখানিতে ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। ত্রিকোণমিতির সঙ্গে সঙ্গে টলেমির কাজের সমালোচনা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এই সমালোচনা প্রধানত গ্রহগুলিকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। টলেমির মতে বুধ (Mercury) এবং শুক্র (Venus) গ্রহের কোন দৃশ্য লম্বন (parallax) নাই, তবে সূর্যের প্রায় ৩´ মিনিট লম্বন রয়েছে এবং গ্রহগুলি সূর্যের চেয়ে পৃথিবীরই নিকটবর্তী ; জাবিরের মতে এমন মনে করবার কোন কারণই নাই। তাঁর মতে নিম্নগ্রহগুলি বিশেষত বুধ এবং শুক্রের নিশ্চয়ই কিছু লম্বন থাকবে এবং শুক্র হয়ত পৃথিবী ও সূর্যের সংযোজক রেখার উপরেই অবস্থিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ওপপত্তিক কাজ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সুনিপুনভাবে পর্যবেক্ষনের জন্য তিনি এর যন্ত্রপাতির দিকেও মনোযোগ দেন। এরই ফলে Turquet যন্ত্রটির উদ্ভব হয়।

জাবিরের জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থখানি জিরার্ড কর্তৃক "Gebri filii Affla Hispalensis de astronomia Libri IX in quibus Ptolemaeum alioqui doctissimum, emendavit নামে লাটিনে অনুদিত হয়। অনুবাদখানি নিউরেমবার্গে পিটার এপিয়ান (Peter Apian) কর্তৃক ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। M. Stein Schaeider "গুপ্ত বিজ্ঞান" নাম দিয়ে একখানি লাটিন অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এর মূল গ্রন্থখানি জাবির প্রণীত। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। মূল গ্রন্থখানি প্রণেতার নামও রয়েছে আবু আফলাহ আসসারকোশী।

পূর্বে প্রাচ্যে দর্শনের যে বাড়াবাড়ি দেখা গিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনেও তার পুনরভিনয় হয়। এই সময়ে স্বাধীন দার্শনিক মতবাদ প্রচারকারী হিসাবে ইবনে বাজ্জা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রূশদ দর্শন জগতে যে বিপ্লব এনেছিলেন, সে সব দিক দিয়েই বিস্ময়কর। আলগাজ্জালীর ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার পর এই বিপ্লবকারী মতবাদ এতদিনকার সঞ্চিত ক্রুদ্ধ আবেগের স্বরূপ প্রকাশ বলা চলে, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখাও তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; তবে দর্শনের মত এতে তাঁরা তেমন বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন বলা চলে না।

ইবনে বাজ্জা ইউরোপীয় ভাষাবিদদের কল্যাণে এভেন পেস (Avenpace) বা এভেম পেস (Avempace) নামে পরিচিত।

তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে বাজ্জা আত্‌তুজিবি আল আন্দালুসী আসসারাকোস্তী।

ইবনে বাজ্জা

সারাকোস্তী অর্থ সারাকোসার (জারাগোজা) অধিবাসী। তবে সাধারনত তিনি ইবনোসসাইম ও ইবনে বাজ্জা নামেই পরিচিত। ইবনে আসসাইম অর্থ স্বর্ণকারের পুত্র। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) —সারটনের মতে ১১০৬ খৃঃ অব্দের পূর্বে—কোন এক সময়ে জারাগোজায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভার জন্যে সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল আলমোরাবিত নৃপতি আলি ইবনে ইউসুফের নিকট আত্মীয় গ্রানাডা ও পরে জারাগোজার গভর্ণর আবুবকর ইবনে ইব্রাহিমের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। আলফানসো কর্তৃক জারাগোজা অধিকৃত হবার পর তিনি ফেজ নগরীতে গমন করেন এবং এই স্থানেই ৫৩৩ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্বাধীন দার্শনিক মতবাদের জন্য তিনি ধর্মান্ধ মুসলমানদের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েন। তাঁর মতবাদ নাস্তিকতায় পূর্ণ এবং তিনি কোরাণ হাদিস অবজ্ঞা করেন বলে ফতেহ ইবনে খাকান তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণ প্রচার কার্য চালান। ফলে তাঁর উপর নানা প্রকার অত্যাচারও হয়। আলফানসো কর্তৃক জারগোজা অধিকৃত হবার পর তিনি যখন সেতুবায় গমন করেন, তখন তাঁর ইসলামবিরোধী মতবাদের জন্য স্থানীয় আমির আবু ইসহাক ইব্রাহিম কর্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হন।

প্রাণরক্ষার জন্য তিনি আবার ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ করেন। এমনিতেও তাঁর অসামান্য প্রভাবের জন্য বিদ্বেষ বশে অনেকেই তাঁর শত্রুতে পরিণত হন। মন্ত্রী অবস্থায় তিনি জারাগোজার নৃপতি ইমাদউদ্দৌলাহ ইবনে হুদের অসন্তোষভাজন হন পরে নৃপতি তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। অনেকেরই ধারনা ফেজনগরীতে তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগে তিনি নিহত হন। ইবনে খাল্লিকানের মতে তিনি বিষাক্ত "বাদিনজান" আহার করেন এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দার্শনিক হিসাবে ইবনে বাজ্জার স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। দর্শনের আলাপ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের নানা বিভাগেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন চিকিৎসক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিকদান, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান যে কত উন্নত হয়েছিল সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সর্বোপরি সঙ্গীত বিভাগে তাঁর অপূর্ব দান, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে। সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক দিকে নূতন আদর্শ প্রচার কার্যের জন্যে আলফারসী প্রাচ্যে যেরূপ সমাদর লাভ করেন ইবনে বাজ্জাও পাশ্চাত্যে তেমনি সমাদর লাভ করেন। অঙ্কশাস্ত্র, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি টলেমির নানা মতের বিশেষ সমালোচনা করেন। তাঁর এই সমালোচনাই আলবিতরুজির Theory of Spiral motion এর উদ্ভাবনার সহায়তা করে।

এ থেকেই বোঝা যায় তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচনা করেছিলেন। এতে তিনি কিরূপ অনুরক্ত ছিলেন ফতেহ ইবনে খাকানের প্রচার কার্য থেকেও তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। তিনি তাঁর "মাত্‌মাহোল আনফুস" নামক গ্রন্থে ইবনে বাজ্জার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন "তিনি এই সমস্ত বিষয় খুব ভাল ভাবেই অধ্যয়ন করেছেন এবং তাঁর মনকে গোলকের পরিধি এবং জলবায়ুর সীমার দিকেই প্রধাবিত করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ খোদার গ্রন্থকে অবজ্ঞা ভরে পরিত্যাগ করেছেন। ঐশীবানীকেও তিনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।" ইবনে খাল্লিকান অবশ্য খাকানের বর্ণনাকে অতিশয়োক্তি বলেই প্রকাশ করেছেন। যা হোক অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানই তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। নানা বিষয়ে মনোসংযোগ তদুপরি ধর্মান্ধদের অত্যাচার যে তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভাকে অসামান্যভাবে দমিয়ে দিয়েছিল সে বলাই বাহুল্য। কবি হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইবনে খাল্লিকান তাঁর কয়েকটি কবিতাও উধৃত করেছেন।

সর্ববিদ্যাবিশারদ হিসাবে এভেরোসের মত খ্যাতি অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। দার্শনিক হিসাবে তাঁর স্থানে পৌঁছান জগতে খুব কম লোকেরই সৌভাগ্য হয়, কিন্তু এই দর্শনের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই; বিজ্ঞান ও রাজনীতিতেও এর ব্যাপ্তি ঘটে। এভেরোস, ইবনে রুশদের

ইউরোপীয় বিকৃত নাম। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে' রুশদ। কর্ডোভার এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে ৫২০ হিজরীতে (১১২৬ খৃঃ অব্দ) ইবনে রুশদের জন্ম হয়। তাঁদের পূর্বপুরুষগণ স্পেনের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন মোরাবিত খলিফাদের অধীনে আন্দালুসিয়ার প্রধান বিচারক—কাজী অলকুজ্জাত—তাঁর পিতাও কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইবনে রুশদও পিতামহ ও পিতার মত সুবিশেষ আইনজ্ঞ ছিলেন এবং ১১৬৯ খৃঃ অব্দে সেভিলের কাজীর পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে তিনি কর্ডোভার কাজীর পদ প্রাপ্ত হন। শুধু বিচার কার্যেই নয় চিকিৎসক হিসাবেও তিনি অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর চিকিৎসক খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে আলমোওয়াহেদ খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ তাঁকে ১১৮২ খৃঃ অব্দে মারাক্কাসে ডেকে পাঠান এবং বৃদ্ধ চিকিৎসক, দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের স্থানে তাঁকে রাজচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তী খলিফা ইয়াকুব আলমনসুরও তাঁকে প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। এদিকে এমনি একের পর এক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করলেও তাঁর দার্শনিক মতবাদের জন্য তিনি গোঁড়া মুসলিম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মযাজকদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। সমসাময়িক মুসলিমগণ "তিনি সয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ" বলে ঘোষনা করেন, খৃষ্টান পাদ্রীরা তাঁর নাম পাপের প্রতিশব্দ বলে

প্রচার করা সুরু করেন। ইয়াকুব আলমনসুরের সময় ধর্মান্ধদের, এই অসন্তোষ চরম ভাব ধারণ করে। প্রচারের ফলে জন সাধারনের মনও দার্শনিকের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে। ফলে খলিফা তাঁকে কর্ডোভার নিকটবর্তী ইলিসানা (বর্তমান Lucena) নামক স্থানে নির্বাসন দেন এবং তাঁর চিকিৎসা, অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থছাড়া সমস্ত গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ দেন। দার্শনিক চরম দুরবস্থায় পতিত হন এবং নানা স্থানে নানাভাবে অপমানিতও হন। যাহোক ১১৯৮ খৃঃ অব্দে ইয়াকুব আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু দার্শনিকের বেশী দিন এই অনুগ্রহ ভোগ করবার অবসর হয় নাই। তিনি ১১৯৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মারাক্কাসে এখনও তাঁর কবর দৃষ্ট হয়।

বিচারকপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই তিনি অবসর সময়ে দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁকে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বানগণের আসনে স্থান দিয়েছে। ধর্মতত্ত্ব, ব্যবহার শাস্ত্র, দর্শন ও চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর বিপুল গ্রন্থরাজি আরবী সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। বস্তুত সমস্ত বিবেচনা করলে তাঁকে সে যুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী লেখক বলেই স্বীকার করতে হবে। কথিত আছে যে তিনি কেবল বিবাহের রাত্রি এবং পিতার মৃত্যুর রাত্রি ছাড়া অন্য কোন রাত্রিতেই অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই।

. বিজ্ঞানের আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গানের সুরে আকৃষ্ট হন। কিম্বা হয়ত গানের সুরের মোহই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনকে আকৃষ্ট করে গানের মধ্যেকার বৈজ্ঞানিকত্বের অনুসন্ধানে রত করে দেয়। যে ভাবে এবং যে কারণেই হোক না কেন গানের বৈজ্ঞানিকত্ব সম্বন্ধে যে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গান সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিতে। দর্শনে উদ্ভ্রান্ত মন অন্যান্য নানা বিষয়ে মনোসংযোগ করলেও দর্শনের মধ্যেই বেশীভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ হয়ত অস্বাভাবিক নয়। অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করলেও এদিকে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন নাই। অঙ্কশাস্ত্রের নীরস হিসাব নিকাশও হয়ত তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নাই। এখানেও তিনি অনেকটা দার্শনিক আলোচনাই করেছেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় টলেমির কাজের সমালোচনাতে। Theory of Multiplicity এবং Eccentricity of the Spheres সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, পুরাতন মতবাদের বিরোধী হোলেও এর বৈজ্ঞানিকত্ব সবাইকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণের উপর তাঁর এই মতবাদের প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তিনি গোলকের গতি (Motion of the Sphere) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানির নাম হোল "কিতাবু ফি হারকাতোলফালাক"। এছাড়া আলমাজেস্তের একখানি সংক্ষিপ্ত ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। ভাষ্যখানি দুই ভাগে বিভক্ত ;

একভাগে হয়েছে গোলক সম্বন্ধে বর্ণনা দ্বিতীয়ভাগে হয়েছে গোলকের গতির সম্বন্ধে আলোচনা। গ্রন্থখানি জ্যাকব আনাতোলি (Jacob Anatoli) কর্তৃক হিব্রুতে অনূদিত হয়। স্মিথের মতে বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দার্শনিক বৈজ্ঞানিক কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন তার সঠিক খবর পাওয়া যায় না। তবে রেঁনা (Renan) তাঁর Averroes গ্রন্থে সব সমেত ৬৭টি খানা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে (১) দর্শন ২৮ খানা (২) ধর্মতত্ব ৫ খানা (৩) আইন ৪ খানা (৪) জ্যোতির্বিজ্ঞান ৪ খানা (৫) ব্যাকরণ ২ খানা এবং (৬) চিকিৎসা বিজ্ঞান ২০ খানা।

ইবনে রুশদের গুরু ইবনে তোফায়েলও ছিলেন দার্শনিক ও চিকিৎসক। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তোফায়েল আলকায়সি। আলকায়সি তাঁর বংশ নির্দেশক হিসাবেই ব্যবহৃত হত। তিনি ছিলেন আরবের আলকায়স বংশের বংশধর। এ ছাড়া তিনি আবুজাফর আন্দালুসি আলকুরতুবী আলইশবিলি নামেও অভিহিত হতেন। আবুবকর শেষ পর্যন্ত লাটিনে আবুবাথরে পরিণত হয় এবং সেই নামেই তিনি সমগ্র ইউরোপে পরিচিত। অনেকের ধারনা তিনি ইবনে বাজ্জার ছাত্র কিন্তু তাঁর লেখা থেকে তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

১১০০—১১২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে গ্রানাডার ৪০ মাইল

ষ্টত্তর পূর্বে ওয়াদিআশ (বর্তমান Guadix) নগরীতে ইবনে তোফায়েলের জন্ম হয়। ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন চিকিৎসক। খুব সম্ভব চিকিৎসার খ্যাতির জোরেই তিনি তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণরের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১১৪৪-৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি কিউটা ও তাঞ্জিয়ারের গভর্ণরের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন পরে আলমোওয়াহেদ নৃপতি আবু ইয়াকুব ইউসুফের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অনেকের মতে তিনি ইউসুফের মন্ত্রীও ছিলেন কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রামান্য কোন কিছু পাওয়া যায় না। যা হোক বৃদ্ধ বয়সের দরুন তিনি ১১৮২-৮৩ খৃঃ অব্দে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর শিষ্য ও বন্ধু ইবনে রুশদ তাঁর স্থানে রাজচিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন।

ইবনে তোফায়েল

ইবনে তোফায়েল ছিলেন প্রধানত দার্শনিক। তাঁর দার্শনিক উপন্যাস "হাই ইবনে ইয়াকজান" মধ্যযুগে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। দর্শন ছাড়া অন্য যে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন সে হোল চিকিৎসাবিদ্যা। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর দান দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন। ইবনে বাজ্জা ও জাবির ইবনে আফলাহ টলেমির নানা ভ্রান্তমতের যে সংশোধনের সূচনা করেন, ইবনে তোফায়েল তাতে আরও ইন্ধন যোগান। নানা জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষনে টলেমির কাজে নানা ভুল ধরা পরা সুরু করে, ইবনে তোফায়েল ও অন্যান্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে টলেমির মতই ভুল। যা হোক ইবনে

তোফায়েলের সমালোচনার জের টানেন তাঁর শিষ্য আলবিতরুজী। টলেমির Epicycle এবং Eccentric circle এর Theory সম্বন্ধে আলবিতরুজী যে গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন তার প্রথমেই তিনি আভাস দিয়েছেন যে তিনি শুধু ইবনে তোফায়েলের মতকেই কাজে লাগাচ্ছেন। এ থেকেই ইবনে তোফায়েলের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিভা সম্বন্ধে ধারনা করা যেতে পারে।

এ সময় পর্যন্ত ভারতের মুসলিম রাজ্য পাঞ্জাবের ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানকার শাসন ও কার্য পদ্ধতিও ছিল গজনীর মুখাপেক্ষী। গজনীর ইতিহাসকে তখনকার ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস বল্লেও অত্যুক্তি হয় না তবে এই শতাব্দীতেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ভাস্করের আবির্ভাব হয়। দাক্ষিণাত্যের বিদূর অধিবাসী এই অঙ্কশাস্ত্রবিদই ভারতের ইতিহাসে একাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একমাত্র বৈজ্ঞানিক যিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন, বৈজ্ঞানিক কার্য কলাপে মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সভাসদ ফৈজি ভাস্করের কার্যাবলী পারসীতে অনুবাদ করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী

দ্বাদশ শতাব্দীতেই জ্ঞান বিজ্ঞান রাজ্যে মুসলিম প্রাধান্য থমকে দাঁড়ায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এমনি চলতে থাকে। মুসলিম প্রাধান্য রয়েছে বটে, জ্ঞানে গরিমায় প্রতিভায় তখনও তারা অন্য সবার চাইতে অনেক মহীয়ান গরীয়ান পদ অধিকার করে রয়েছে বটে, কিন্তু অন্য দিকেও আলো দেখা যাচ্ছে। মুসলিম প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য অন্য সবাইকে ছাপিয়ে রইলেও সেই একক জ্যোতির্ময় ভাস্কর নয়, অন্যেরাও এগিয়ে আসছে তার কাছাকাছি। তারা তেমন জ্যোতির্ময় না হোলেও তাদের অস্তিত্ব বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যায়।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রের পরিবর্তনও বিস্ময়কর। বাগদাদ হতমান; সেখানে আর কোন স্পন্দন নাই। বাগদাদের আশে পাশে অন্যান্য যেখানে বিজ্ঞানের চর্চা চলছে, সেখানেও সবাই চলেছে অনেকটা এককভাবে,—কেন্দ্র হিসাবে কারুর নাম করা যেতে পারে না। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে অজ্ঞতা ও বর্বরতার পূর্ব লীলাভূমি মারাঘা।

রাজনীতির দিক থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যে যে ভাঙ্গন ধরেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেটা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় মোগল আক্রমনে। সেলজুক তুর্কীদের রাজত্বে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা কষ্টকর হোলেও অসম্ভব হয়ে উঠে নাই সে হিসাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস করুণার ইতিহাস বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

১২০৬ খৃঃ অব্দ থেকে ১২২৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত চেঙ্গিসখানের দুর্ধর্ষ অভিযানের ফলে উত্তর চীন থেকে ভারতের সিন্ধু নদ পর্যন্ত রক্তের স্রোত বয়ে যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানের স্পন্দনও যেন একেবারে থেমে যায়। এই মোগল অভিযানের ফলেই সমরকন্দ ও বোখারায় চিরকালের তরে জ্ঞানের আলো নির্বাপিত হয়ে পড়ে। এখানে এর পরে আর সত্যিকার জ্ঞানবিজ্ঞান কোনদিনই দেখা দেয় নাই বরং সে জায়গায় আসে যাদুবিদ্যা তার সমস্ত অন্ধ সংস্কার ও গোপন কার্য নিয়ে। হালাকু খানও চেঙ্গিসের পদাঙ্ক অনুসরন করেন। খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর দৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে বাগদাদকে তিনি ধূলিসাৎ করে দেন। গল্পের রাজধানী বাগদাদ, কৃষ্টির কেন্দ্র বাগদাদ, ইসলামের উৎস বাগদাদ চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। যাহোক এর পরেই এই নৃশংস মোগল নেতার জীবনে পরিবর্তন আসে। যে হালাকুখান জ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদিগকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করেন নাই, পাঁচ শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রন্থরাজিকে অগ্নি ও ইউফ্রেটিসের গর্ভে দিয়ে নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করেছিলেন তিনিই এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম, নাসিরউদ্দিন তুসীর পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ান। তাঁরই সহায়তায় মারাঘায় বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগদাদের স্থান মারাঘা অধিকার করে।

এ শতাব্দীতেও ক্রুসেড চলেছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্রুসেড মুসলিম ও খৃষ্টানদের এ সময়কার শৌর্য বীর্যের পরিচয়। এর মধ্যে

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা যে, বিশেষ স্থান পায় নাই সে বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষে তখন দাস বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে। আলতামাস বাগদাদের খলিফার সনদ পেয়ে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে মৌলিক দানের অধিকারী হিসাবে যে সমস্ত মনীষীর নাম এ পর্যন্ত জানা গিয়েছে তাঁদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন তুসী যে জ্ঞান গরিমায়, বিজ্ঞান প্রতিভায় সর্বশ্রেষ্ঠ সে বললে অত্যুক্তি হবে না। নাসির উদ্দিন ছাড়া আলরাজী, কামাল উদ্দিন ইবনে ইউনুস, ইবনোল ইয়াসিমিন, ইবনোল লুবিতি, শরফ উদ্দিন তুসী, আলউরদী, মহীউদ্দিন আল মাগরিবি প্রভৃতিও অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী হিসাবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। এঁদের সবাই প্রায় পারস্যের অধিবাসী। বস্তুত শুদ্ধ আরবীয় প্রভাব পূর্বে থেকেই যে ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছিল সে আর সঞ্জীবিত হয়ে উঠে নাই। অবশ্য আরবী এবং পারসীক প্রভাবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য টানা অসম্ভব—শুদ্ধ আরবীয় বা শুদ্ধ পারসীক প্রভাব কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয় নি। সবাই তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ভাষা আরবীতেই নিজেদের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেন। ওমর খৈয়ামের মত কেউ কেউ মাতৃভাষাতে সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি করেছেন বটে কিন্তু সে খুবই সামান্য। ওমর খৈয়ামের কবি প্রতিভা যেমন মাতৃভাষা পারসীতেই ফুটে উঠেছিল বিজ্ঞান প্রতিভা তেমনি আরবীতেই সীমাবদ্ধ। পারসী

ও আরবীর মধ্যে একটা সহজ সুন্দর সম্বন্ধ থাকার জন্যেই কেউ হয়ত এ বিষয়ে বিশেষ মাথাও ঘামান নাই। দুই একজন হয়ত বা নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যেই পারসীতে নিজেদের কার্যাবলী কিছু কিছু অনুবাদ করেছিলেন মাত্র। নাসির উদ্দিন তাঁর দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে ছোট একখানি পুস্তিকা পারসীতেই লিপিবদ্ধ করেন।

ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ২৭ বৎসর পরে ১১৪৯-৫০ খৃঃ অব্দে খোরাসান প্রদেশের রাই নগরে আলরাজীর জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনোল হোসায়েন ইবনোল কাতিব আবু আবদুল্লাহ ফখরউদ্দিন আলরাজী। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা অল্পদিনের মধ্যেই জন সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, এবং বিদ্বান হিসাবে তাঁর খ্যাতি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ে চিকিৎসক হোলেও চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ রয় নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রায় সমস্ত বিষয়েই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক হিসাবে তিনি বিখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞানে তাঁর প্রতিভার পরিচয় হোল তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী বিশেষ করে বিশ্বকোষ। শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চেয়ে জ্যামিতিই তাঁকে

আলরাজী

বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জ্যামিতিতে তাঁর দানও বিশেষ উচ্চস্তরের।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে আলরাজীর কার্যাবলীকে সর্বব্যাপী বলা চলে। প্রায় সমস্ত বিষয়েই তিনি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই; তাই সেগুলির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বা গ্রন্থকারের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করা অসম্ভব। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত দশখানিই প্রধান :—(১) ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্বন্ধে গ্রন্থ (২) আল ইখতিয়ারোতুল আলাইয়া—জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার এখানিকে পারসীতে লেখেন এবং খারিজম শাহ আলাউদ্দিন মোহাম্মদকে উৎসর্গ করেন। (৩) সিরোতাল মাকতুম (গুপ্তরত্ন)—জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ (৪) তারিখোদ দোয়াল—প্রথম চারি খলিফার ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (৫) মানাকিবোল ইমামুস শাফী—শাফী মজহাবের ইমামদের ইতিহাস (৬) মাহসুল ফি ওসুল আলফিকহ—আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ (৭) মাফাতিহুল গায়েব বা তাফসিরোল কবির—কোরাণ শরিফের ভাষ্য (৮) কিতাবুল মাবাহিতুল শারকীয়া—পদার্থবিদ্যা ও প্রাচ্যদর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ। দুইখানি বিশ্বকোষ—(৯) জাওয়ামিল ওলুম (বিজ্ঞানসমষ্টি) এতে চল্লিশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে; (১০) হাদায়কুল আনোয়ার ফি হাকায়েকুল আসরার (গুপ্তবিদ্যার সততা সম্বন্ধে আলোচনা)। দুইখানি গ্রন্থই পারসীতে লিখিত। এর একখানি খারিজম শাহ আলাউদ্দিনের

জন্য লিখিত হয়। সমস্ত হাদায়েক গ্রন্থখানি পাওয়া যায় নাই, শুধু অঙ্কশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অংশটুকুই পাওয়া গিয়েছে; খুব সম্ভব অন্য অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

১২১০ খৃঃ অব্দে হিরাট নগরে এই মনীষীর মৃত্যু হয়।

আকাশের গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করার বিজ্ঞানসম্মত সময়নিরূপক কোন কিছু আবিষ্কারের পরিকল্পনাই পেণ্ডুলাম আবিষ্কারের সূত্রপাত। এর পূর্বে অন্য নানা উপায়ে সময় নিরূপণ করা হত তবে কোনটিই যে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয় সে অস্বীকার করবার উপায় নাই। পেণ্ডুলামের দোলনের সঙ্গে সময় নির্দেশের সম্বন্ধের আবিষ্কর্তা হিসাবে গ্যালিলিওর নাম সর্বজন বিদিত। অনেকেরই ধারণা গ্যালিলিওর পূর্বে অন্য কেউ এই দোলনের সমকালীনতা লক্ষ্য করেন নাই। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কামালউদ্দিন ইবনে ইউনুসের কার্যাবলীতে। তিনিই সর্বপ্রথম এই সমকালীনতা লক্ষ্য করেন। শুধু লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হন নাই তিনি একে কাজেও লাগিয়ে নেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে নানা পর্যবেক্ষণে তিনি এর ব্যবহার করেন।*

আলমামুনের প্রিয় বাগদাদ নগরী বিধৌত করে তাইগ্রীস তখনও কুলুকুলুস্বরে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু তার পূর্বের গৌরবসূর্য অস্তমান। এই অস্তমানের ঝিকিমিকি আলোতে বাগদাদের পার্শবর্তী দুই একটি স্থানে যে একটু আধটু আলোকরশ্মি দেখা

* History of Math, Smith Vol II, P. 673.

যাচ্ছিস কামালউদ্দিন তাদেরই অন্যতম। তাইগ্রীসের তীরবর্তী মস্থুল নগরীতে ১১৫৬ খৃঃ অব্দে কামালউদ্দিনের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মুসা ইবনে ইউনুস ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মানা আবুল ফতেহ কামালউদ্দিন। কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বাগদাদ নগরে নিজামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি মস্থুলে প্রত্যাগমন করেন এবং পিতার পদ লাভ করে জাইনিয়া কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। প্রজ্ঞা ও প্রতিভার জন্য তিনি এত সমাদর লাভ করেন যে পরে তাঁর সম্মানার্থে কলেজটির নামকরণ করা হয় "কামালিয়া কলেজ"। রাজকীয় অনুগ্রহ যে খুব বেশী তিনি পেয়েছিলেন তা মনে হয় না কিন্তু সেজন্যে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণে এতটুকুও ক্ষুণ্ণতা আসে নাই। সমাদর না হোলে অনেক সময়েই প্রতিভা স্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় না বরং অনেক সময়েই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়; কামালউদ্দিনের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া দূরের কথা তাঁর প্রকৃতিগত উন্মেষশালিনী প্রবৃত্তি সুপ্ত প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে নিয়েছে।

কামালউদ্দিন ছিলেন আলরাজীর মত নানা বিষয়ে পারদর্শী। ধর্মশাস্ত্র, অঙ্ক, বিশ্বকোষ সব কিছুতেই তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী এখনও বর্তমান আছে। কোরাণ শরীফের ভাষ্য ইবনে সিনার গ্রন্থের ভাষ্য, আরবী ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ,

কামালউদ্দিন ইবনে ইউনুস

বীজগণিত, অঙ্ক, বিশেষ করে square number এবং magic square, জ্যামিতির সুষম সপ্তভূজ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর প্রজ্ঞার খ্যাতি কিরূপ বহুদূর বিস্তৃত ছিল একটি ঘটনা থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (Frederick II) মিসরের নৃপতি আলকামিলের মধ্যস্থতায় কামালউদ্দিনকে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করতে পাঠান। একটি প্রশ্ন হোল বৃত্তের অংশের সমান করে একটি বর্গ অঙ্কন করা। কামালউদ্দিন প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পাঠিয়ে দেন। তাঁর ছাত্র মুফাজ্জল ইবনে ওমর আল আভারী এর সমাধান করেন এবং এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন। ইউরোপের সম্রাট মধ্যপ্রাচীর বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছেন—এতেই বোঝা যায় বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি সুদূর ইউরোপেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

অঙ্কশাস্ত্রের অন্যতম বিষয় Theory of numbers উচ্চ স্তরের জিনিষ। এযুগেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্য। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতেই কামালউদ্দিন একে বিশেষ ভাবে উন্নত করে তোলেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভায়। এর আলোচনায় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি এক অভিনব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন; বস্তুত Theory of numbers সম্বন্ধে আলোচনাই চিরকালের জন্য কামালউদ্দিনকে শ্রেষ্ঠতম অঙ্কশাস্ত্রবিদদের পর্যায়ভুক্ত করে রাখবে। Conics sectionএও

তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নানা প্রতিপাদ্যের আলোচনায়।

১২৪২ খৃঃ অব্দে এই মনীষী পরলোক গমন করেন।

পারস্যের সুরভিরম্য কানন, গোলাপবাগ কবির কাব্যস্বপ্নে ভরপুর। কাব্যজগতের আদর্শ হিসাবে এর স্থান অনেক উচ্চে। কবির কাব্য এবং বিজ্ঞানের কঠোরতার মধ্যে বিশেষ কোন সামঞ্জস্য নেই, স্বপ্নবিলাসীর কল্পনা আর নিখুঁত সত্য উপাসকের পর্যবেক্ষণের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান বিশেষ হয় না তবুও একই জায়গায় একই দৃশ্য যে দুই বিভিন্ন ভাবপন্থীকেই অনুপ্রাণিত করতে পারে তার নিদর্শন পারস্যের তুস নগরী। মহাকবি ফেরদৌসীর জন্মস্থান তুস. কাব্যজগতে যেমন উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছে ফেরদৌসীর জন্মস্থান হিসাবে, বিজ্ঞানজগতেও সে তেমনি সমাদর লাভ করেছে নাসিরউদ্দিন তুসীর জন্মস্থান বলে। একাদশ শতাব্দীর তুসকে সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বাদ দিলে সাহিত্যজগতে যে অভাব পরিলক্ষিত হবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুসকে বিজ্ঞান জগত থেকে বাদ দিলে বিজ্ঞানজগতে ততোধিক অভাব পরিলক্ষিত হবে একথা নিঃসন্দেহভাবেই বলা যায়। নাসিরউদ্দিনের জন্মের পূর্বেই তুসে বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়। তাঁর অব্যবহিত পূর্বে যিনি বিজ্ঞানজগত আমোদিত করে রেখেছিলেন তিনি নাসিরউদ্দিনের মত অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী না হোলেও বিজ্ঞান জগতে তাঁর দান উপেক্ষনীয় নয়। নাসিরউদ্দিন যখন কিশোর মাত্র তখনই এই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়। হয়ত তাঁর

বিজ্ঞান চর্চা এই কিশোর বিদ্যার্থীর মনে অজ্ঞাতে বিজ্ঞানের প্রতি এক আগ্রহ জন্মিয়ে দেয় এবং তারই ফলে বিজ্ঞান জগত অপূর্ব রত্নসম্ভারের অধিকারী হয়। এই বৈজ্ঞানিকের নাম হোল আলমোজাফফর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলমোজাফফর শরফউদ্দিন আলতুসী। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাঁর জন্ম হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই (১২১৩ খৃঃ অব্দে) তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই চলে যে বর্তমানে Tusi's Staff নামে যে আস্তারলব বিজ্ঞানজগতে পরিচিত শরফউদ্দিনই তার আবিষ্কর্তা। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের অনুসৃত পন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, বিজ্ঞান সম্মত অপরূপ কৌশলে যন্ত্রপাতি নির্মাণের মধ্যেই শরফউদ্দিনের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য plane আস্তারলব থেকে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন। Plane আস্তারলবে plane এর উপর গোলকের projection পড়ে কিন্তু এর বেলায় একটি সরল রেখার উপর plane এর projection পড়ে। কোণ পরিমাপ করবার জন্যে এতে সুতোও বাঁধা থাকত। সর্বদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এর বৈজ্ঞানিক মূল্য বিশেষ কম নয়। সেডিলোর (sedillot) মতে Tusi's staff নাম হয় নাসিরউদ্দিন তুসীর নামানুসারে কিন্তু তাঁর এ ধারনা ভুল। আলমুসাত্‌তাহ নামে বৈজ্ঞানিক আস্তারলব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

শরফউদ্দিন তুসী

জ্যামিতি ও বীজগণিতেও তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরফউদ্দিন বীজগণিত আলোচনা নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করে তোলেন। তাঁর প্রভাব সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের উপরে বিশেষ করে মিসরীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ ইবনোল ইয়াসিমিনির কার্যকলাপে বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয় তাঁর মূল বীজগণিত গ্রন্থখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু অজ্ঞাতনামা এক বৈজ্ঞানিকের ভাষ্য থেকেই এর অস্তিত্ব এবং ভিতরকার কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জ্যামিতির গ্রন্থখানিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায় একটি বর্গকে চারভাগে ভাগ করবার বিষয় সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই শতাব্দীতে অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক অবদানের জন্য, যাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন, ইবনোললুবিদি তাঁদের অন্যতম। ১২১০-১১ খৃঃ অব্দে আলেপ্পোর অন্তর্গত হালেবে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদান আসসাহিব নাজম উদ্দিন ইবনোললুবিদি। দামস্কাসের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আবদুর রহিম ইবনে আলি মুহাজ্জাবউদ্দিন দাখওয়াবের নিকট তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি হিমসের শাসনকর্তা আলমনসুর ইব্রাহিমের অধীনে চাকরী সুরু করেন এবং পরে তাঁর মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। এই মন্ত্রীত্বের জন্যই তিনি আসসাহিব নামেও পরিচিত হয়ে পড়েন। আলমনসুরের মৃত্যুর

পর তিনি মিসরের শাসনকর্তা সালেহ নাজেমউদ্দিন আইয়ুবের অধীনে আলেকজেন্দ্রিয়ার গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। এ চাকরীতে তিনি কতদিন নিযুক্ত ছিলেন জানা যায় না তবে মিসর থেকে তিনি পুনরায় সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং সেখানেও অনুরূপ পদে নিযুক্ত হন। ১২৬৭ খৃঃ অব্দে সিরিয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই। তিনি এ সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন। ব্যবসায়ে চিকিৎসক হোলেও চিকিৎসা শাস্ত্রেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি। দার্শনিক এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবেও তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—এই কয়েক বিষয়েই তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিই প্রধান:— (১) ইউক্লিডের একটি সংক্ষিপ্ত সার (২) ইউক্লিডের স্বতসিদ্ধের ব্যাখ্যা (৩) অঙ্কের একটি পাঠ্যপুস্তক (৪) ইউক্লিড এবং মধ্যপুস্তকের (Middle Books) দরকারী বিষয় সমূহের সম্বন্ধে আলোচনা (৫) বীজগণিত গ্রন্থ (৬) ম্যাজিক স্কোয়ার (Magic square) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক এখানি আলমনসুরকে উৎসর্গ করেন (৭) জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রন্থ (৮) জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবল। বৈজ্ঞানিক আজজাহির এবং আল মুকাররব নামে দুইখানি টেবল তৈরী করেন। প্রথমটি অনেকটা

হাবাশ আলহাসিবের তালিকা থেকে গৃহীত দ্বিতীয়টি তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণ ফল।

আলফারিসিও এই সময়কার অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর আলফারিসি। শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়ামনে তাঁর কার্য কলাপের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাঁর জন্ম মৃত্যুর সঠিক তারিখ কিছুই জানা যায় না। বৈজ্ঞানিকের কার্যকলাপ থেকে মনে হয় তিনি ইয়ামনের নৃপতি আবুমোজাফফর ইউসুফ ইবনে ওমরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; হয়ত তাঁর দরবারেও স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের একখানি তিনি এই নৃপতির জন্যেই প্রণয়ন করেন।

আলফারিসি

অঙ্কশাস্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিই তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন মনে হয়। এই সম্বন্ধে তাঁর দুই খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানির নাম হোল নিহায়েতোল ইদরাক্ ফি আসরারে উলুমোল আফলাক্ (The highest understanding on the secrets of the science of the spheres) দ্বিতীয় খানির নাম হোল "মা'আরিজোল ফিক্রুল ওয়াহিজ (stairs of the burning thought)। শেষোক্তখানিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবল সমূহের দুর্বোধ্য বিষয়গুলির সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই খানিই নৃপতির জন্য বিশেষভাবে লিখিত হয়। হাজী খলিফা "জিজ-ই-মোহাম্মদ" নামক একটি টেবলের উল্লেখ করেছেন। যতদূর মনে হয় এই "জিজ-ই-মোহাম্মদ" এবং আলফারিসির

"মাআরিজ" একই জিনিষ। হাজী খলিফার মতে এই জিজটি তৈরী হয় দ্বাদশ শতাব্দীর ফরিদউদ্দিন আবুলহাসান আলি ইবনে আবদুল করিম আসশিরওয়ানীর পর্যবেক্ষণ ফল সন্নিবেশিত করে। আয়াতোল আফাক মিন খাওয়াসোলে আওফাক (Signs of Universe from the most appropriate properties) নামক একখানি গ্রন্থের প্রণয়ন কর্তার নামও মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর আলফারিসি। এই দুই ব্যক্তি একই কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ১৩৫০-৫১ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের প্রণেতার মৃত্যু হয় বলে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকের অন্যান্য কার্যাবলীর কথা বিবেচনা করলে মনে হয় এখানিও আলফারিসেরই প্রণীত। সে হিসাবে তাঁর "মাআরিজ" গ্রন্থখানি মুজাফফরের শাসন কালের শেষভাগে প্রণীত হয় বলে মেনে নিতে হবে।

নাসিরউদ্দিন তুসী

প্রত্যেক যুগে যুগে এক একজন যুগ মানবের আবির্ভাব হয় তাঁর সময়কে সর্বতোভাবে এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করতে। বিজ্ঞান জগতেও একথা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক শতাব্দীতেই দুই একজন অভূতপূর্ব মনীষাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায়: তাঁদের কার্যকলাপ, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন, পরীক্ষা, মৌলিকতা সব কিছুই এক যোগে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছে, পূর্বেকার জ্ঞান সীমা অতিক্রম করে নূতন রাজ্যের নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে, বিজ্ঞানের ধারাকে নূতন ভাবে

পরিচালিত করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতের এমনি যুগঅবতার হোলেন নাসিরউদ্দিন। নাসিরউদ্দিনের প্রতিভা, তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীরই গৌরবের সামগ্রী নয়; বিজ্ঞান জগতে এ নিউটনের মতই এক অভিনব বিস্ময়। বিজ্ঞান জগতে তাঁর অবদান মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় অসভ্যতা ও বর্বরতার কেন্দ্রস্থল মারাঘা হয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান; এমনিতে যাঁদের বিজ্ঞান প্রতিভা স্ফুরণের কোন সুযোগই হত না তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হন মারাঘার গবেষণাগারে লালিত পালিত হয়ে।

৫৯৭ হিজরী ১২ই জুমাদিয়াল আউয়াল (১৮ ফেব্রুয়ারি ১২০১ খৃঃ অব্দ) খোরাসান প্রদেশের তুসনগরে (কারুর কারুর মতে সাভায়) নাসিরউদ্দিনের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনোল হাসান নাসিরউদ্দিন তুসী আল মুহাক্কিক। তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কামালউদ্দিন ইবনে ইউনুসের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তবে অল্প বয়সেই যে তিনি প্রজ্ঞা ও প্রতিভার জন্য বেশ খ্যাতি লাভ করেন, পরবর্তী জীবনে নানা ঘটনা থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় সমস্ত স্থানের নৃপতিই তাঁকে নিজের দরবারে পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এ আগ্রহ শুধু অনুরোধেই সমাপ্ত হয় নাই অনেক সময়েই এ বল প্রয়োগেও মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে। প্রথমেই কুহিস্থানের ইসমাইলী গভর্ণর নাসিরউদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে আবুমনসুর বৈজ্ঞানিককে চুরি করে আলামুতে প্রেরণ করেন। সেইখানেই তিনি হালাকু খানের অভিযানের সময় পর্যন্ত অনিচ্ছুক অতিথি হিসাবে বাস করেন। তাঁর দিন কাটত অনেকটা বন্দী হিসাবেই। হালাকুর দুর্ধর্ষ পরাক্রমের সম্মুখে তখন সমস্ত এশিয়া মাইনর, পারস্য নত মস্তক। হালাকুর আক্রমণ সম্ভাবনা শুনেই, নাসিরউদ্দিনের পরামর্শ মত আলামুতের শাসনকর্তা রুকুন উদ্দিন কুরশাহ আত্মসমর্পন করেন এবং নগরটিও হালাকুর হস্তে সমর্পন করেন। হালাকুর এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল নাসিরউদ্দিনকে হস্তগত করা। হালাকু খানের ভ্রাতা সেই সময়কার মোগল দলপতি মঙ্গুখান (১২৪৮-১২৫৮) হালাকুকে পারস্যে পাঠানর সময় নাসিরউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে আসবার হুকুম দেন। বৈজ্ঞানিকও হালাকুর অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। যা হোক এই চাকুরী গ্রহণ হালাকু ও নাসিরউদ্দিন উভয়েরই এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। নাসিরউদ্দিনের জ্যোতিষী গণনার উপর হালাকু এত আকৃষ্ট হন যে শেষ পর্যন্ত তিনি নাসিরউদ্দিনের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করতেই এগুতেন না। এই প্রভাবের ফলেই নাসিরউদ্দিন হালাকুর মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন এবং পরে ওয়াকৃফ করের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ পদলাভ করেন। বৈজ্ঞানিক এই সুযোগ

বিজ্ঞানের কাজে লাগিয়ে নিতে কসুর করেন নাই। অনেকেরই ধারনা মারাঘার গবেষণাগার এবং লাইব্রেরী এই ওয়াকফ্ করের অংশ দ্বারাই নির্মিত হয়। ১২৫৮ খৃঃ অব্দে হালাকু যখন বাগদাদ বিধ্বস্ত করেন তখন নাসিরউদ্দিনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে মনে হয়। যা হোক ১২৫৯ খৃঃ অব্দে তিনি হালাকুর সঙ্গে মারাঘায় আগমন করেন এবং প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইখানেই অতিবাহিত করেন। ১২ ৷৪ খৃঃ অব্দে তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং সেইখানেই জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

যতদূর জানা যায় মারাঘার মানমন্দিরেই নাসিরউদ্দিন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্যকলাপ আরম্ভ করেন। এর পূর্বে তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ যে ধীর স্থির ভাবে চলতে পারে নাই সে বলাই বাহুল্য। আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করলে মারাঘা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। আজার বাইজান প্রদেশে উরমিয়া হ্রদের পূর্বে এবং তেব্রিজের দক্ষিণে সহরটি অবস্থিত। সহরটি কি জন্য হালাকু খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলা মুস্কিল। যে কোন কারণেই হোক মোগল দলপতি এখানে তাঁর বাসস্থান ও রাজধানী স্থাপন করেন। বাগদাদের শেষ খলিফা মুতাসিমকে পরাজিত করে তিনি মারাঘার নিকটেই বাগদাদের অনুকরণে একটি লাইব্রেরী ও মানমন্দির তৈরী করবার আদেশ দেন। নাসিরউদ্দিনের উপর এই নির্মান কার্যের তত্বাবধানের ভার পড়ে। খুব সম্ভব ১২৫৯ খৃঃ অব্দে এই নির্মান কার্য শেষ হয়। নগরীর পশ্চিম প্রান্ত সুদৃঢ় পাহাড়ের

উপর মানমন্দিরটি স্থাপিত হয়। এর ভিত্তি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যতদূর মনে হয় এর পরিমান ছিল ১৩৭ X ৩৪৭ মিটার।' অনেকের মতে হালাকু খানের পূর্বেই মঙ্গুখান মানমন্দির ও লাইব্রেরী তৈরী করবার পরিকল্পনা করেন এবং সেইজন্যেই নাসিরউদ্দিনকে মারাঘায় আনয়নের জন্য হালাকু খানকে আদেশ দেন।

শুধু মানমন্দির তৈরী করেই মোগল দলপতি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষান্ত হন নাই। এ যাতে সব দিক দিয়ে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিকের কাজের উপযুক্ত হতে পারে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে পরিণত হয়, উভয়েই তার ব্যবস্থা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। প্রথমেই এসে পড়ে যন্ত্রপাতির কথা। বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়া বিজ্ঞানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না; তাই এখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মানেরও ব্যবস্থা করা হয়। এর ভার পরে বৈজ্ঞানিক আলউরদীর উপর। অবশ্য বাগদাদ ও আলামুতের মানমন্দিরের অনেকগুলি যন্ত্রপাতিও লুণ্ঠিত হয়ে মারাঘার মানমন্দিরে স্থান লাভ করে। লাইব্রেরীও তেমনি ভাবে সুসজ্জিত করা হয়। ইবনে শাকিরের মতে এতে চারি লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এর অনেকগুলিই মোগল দলপতিগণ সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য অভিযানের সময় সংগ্রহ করেন। সবদিক দিয়েই এ জ্ঞান সাধনার উপযোগী হয়ে উঠে। লাইব্রেরীটি বাগদাদের খলিফা আলমামুনের "বয়তুল হিকমা" এবং কায়রোর আলহাকিমের "দারুল হিকমার" কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানমন্দিরটি এমনভাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর হোলেও এ বেশী দিন ঠিক থাকতে পারে নাই। নাসিরউদ্দিন এবং তাঁর পুত্রদের সময়ে এর কাজ চলে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে কিন্তু তার পরেই এ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় রাজকীয় উৎসাহের অভাবে। মারাঘার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে মুসলিমজগতের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কাজও বন্ধ হয়ে যায় বলা চলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমরকন্দের উলুগবেগের উৎসাহে কিছুদিন কাজ চলে বটে কিন্তু তার পরেই চির অন্ধকার এসে প্রাচ্য মুসলিম জগতকে ঘিরে ধরে।

নাসিরউদ্দিন মারাঘার সর্বপ্রথম ডিরেক্টর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র পর পর এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই সময় মানমন্দিরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কাজ করতেন নাসিরউদ্দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবলের মুখবন্ধে তাঁদের কয়েক জনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে আলি ইবনে ওমর আলকাজভিনি, আলউবদী, তিফলিসের ফখরউদ্দিন আলখালাতি, মসুলের ফখরউদ্দিন আলমারাঘী, মহীউদ্দিন আলমাগরিবী, আবুল ফারাজ এবং ইবনে ফুতী আবদুর রাজ্জাক ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আসশায়বানী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে ফুতী মোগল দলপতির বাগদাদ অভিযানের সময় বাগদাদে বন্দী হয়ে মারাঘা তে প্রথমে তিনি নাসিরউদ্দিনের সহকারী হিসাবে কাজ করতে থাকেন এবং পরে লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। মানমন্দিরে ঠিক কতজন বৈজ্ঞানিক কাজ করতেন সে সঠিকভাবে

জানা যায় না। E. Wiedeman ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের নাম দিয়েছেন। তবে এ যে সব দিক দিয়ে কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চীন থেকেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এখানে আনীত হন। তাঁদের একজনের নাম হোল ফাও-মন-জী। এঁর নিকটে নাসিরউদ্দিন চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পঞ্জিকার বিষয় শিক্ষালাভ করেন। মারাঘায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত আলউরদীর গ্রন্থে তার একটি তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর খাওয়ানদামিরের গ্রন্থেও কতকগুলির নাম উল্লেখ দেখা যায়। আলউরদীর তালিকার কথা তাঁর কার্যাবলীর সঙ্গে বিবেচনা করা যাবে। খাওয়ানদামিরের তালিকায় যে যন্ত্রগুলির নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান। তামাছিলই আশকালি-ই-আফলাক (Representations of the shapes of the spheres), তাদবিরাত (Epicycles), হাওয়ামিল (Deferents), দাওয়াবিরই মাওহুমা ওয়া সুওয়ার ওয়া বুরুজই দোওয়াজ দাহানা (Imaginary circles, constellations, and signs of the zodiac) Turquet (Torquetum) নামক যন্ত্রটি নাসিরউদ্দিন আবিষ্কার করেন বলে কারুর কারুর ধারণা। তবে খুব সম্ভব এটি জাবির ইবনে আফলাহই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। রেজিওমন্টেনাসের মতে জাবিরই এর সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা। জাবিরের কার্যাবলীর সঙ্গে নাসিরউদ্দিনের পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়েছিল কিনা ঠিক জানা যায় না তবে যতদূর মনে হয় তেমন পরিচয় হবার সুযোগ

ঘটে উঠে নাই। সে হিসাবে তাঁর এই যন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠে বলতে হয়।

মারাঘার যন্ত্রপাতির একটি বিশেষত্ব হোল এর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ। সত্যকে সুন্দর ও সঠিকভাবে জানতে হোলে তার প্রত্যেক খুঁটিনাটিকেও সুন্দরভাবে জানতে হয়। জানবার কায়দা কাননগুলোকেও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয়; নইলে সত্যকে কিছুতেই আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। এই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান যন্ত্রপাতিগুলো কতদূর উন্নত হয়েছিল দু একটির কথাতেই তার আভাস পাওয়া যাবে। Armillary sphere মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অনেক পূর্বেই আবিষ্কৃত এবং বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে ভূমণ্ডলকে armillary sphere দিয়েই বোঝা হত, টলেমি এবং আলেকজেন্দ্রিয়ার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণও armillary sphere ব্যবহার করতেন। টলেমির ব্যবহৃত sphereএ ছিল তিনটি গোলক (Rings)—একটি মাধ্যন্দিন রেখা (Meridian) একটি গ্রহণরেখা (Ecliptic) এবং একটি মকরবৃত্তি সম্বন্ধীয় (Solistitial colure)। এই তিনটি ব্যতীত পর্যবেক্ষণের নিমিত্তও দুইটি গোলক ছিল। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য এর সঙ্গে অন্য দুইটি গোলক সংযোগ করেন। একটি হোল নক্ষত্রগুলির Co-ordinate সম্বন্ধীয় (Co-ordinates of stars with respect to horizon) অন্যটি উচ্চতা পরিমাপক। এ দুটি ছাড়া বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ যে বিশুদ্ধ হতে পারেনা সে বলাই বাহুল্য। পর্যবেক্ষণ যন্ত্র বড় হবে,

পরিমাপও সেই অনুপাতে নির্দোষ এবং নির্ভুল হবে, এ বৈজ্ঞানিক সত্য। মারাঘায় বৈজ্ঞানিকদের নিকট এ সত্য যে অপরিজ্ঞাত ছিল না, তাঁদের যন্ত্রগুলির পরিমাপ থেকেই সে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ মানমন্দিরে গ্রহণরেখার (ecliptical) জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হত তার একটি গোলক ছিল ১২ ফিট। এ ছাড়া প্রত্যেক যন্ত্রই বর্তমানে অনুসৃত প্রথামত ডিগ্রি ও মিনিটে বিভক্ত ছিল। ইউরোপের রিনাসাঁর সঙ্গে যখন বিজ্ঞানচর্চার জন্য সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কথা উঠে তখন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের দিকেই। এর উপর ভিত্তি করেই বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উৎপত্তি, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।*

আরবী এবং পারসী উভয় ভাষার উপরেই নাসিরউদ্দিনের অগাধ দখল ছিল—এই দুই ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীতেই তার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। তবে তিনি গ্রীকভাষা কেমন জানতেন সে নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে তিনি গ্রীক ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং গভীরভাবে গ্রীক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কেউ কেউ এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

---

* When Alfanso of Castile wanted to construct an armillary sphere, which would be the finest & best that had yet been made, it was to the Arabs that he turned for information. At the Renaissance, Regiomontanous, in order to reconstruct the ecliptical of Ptolemy; used Arabic books and it was from them that he became acquainted with the alidade, the name of which is Arabic—Carra De Vaux: Legacy of Islam p. 396.

তাঁদের মতে আরবীতে অনুদিত গ্রীক গ্রন্থাবলী থেকেই তিনি গ্রীক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন ; সাক্ষাৎভাবে তিনি এগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এ সন্দেহ অহেতুক বলেই মনে হয়। তিনি কতকগুলি গ্রীকগ্রন্থ আরবী ও পারসীতে অনুবাদ করেন। কোন ভাষার উপর বিশেষ আধিপত্য না থাকলে সেই ভাষার বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী ভাষান্তরিত করা যে বিশেষ সহজসাধ্য নয় সে বলাই বাহুল্য। এই অনুবাদ থেকেই তাঁর গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু ধারনা করা যেতে পারে।

নাসিরউদ্দিনের বিজ্ঞান প্রতিভা কি ধরনের ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই। অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, গান, ভূগোল, চিকিৎসা, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, ধর্মতত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই তিনি আলোচনা করেন। এ সমস্ত বিষয়েই তাঁর প্রণীত বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা কত সে এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। ব্রকেলম্যান তাঁর তালিকায় ৫৬ খানা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর তালিকা সম্পূর্ণ নয়। সারটন ৬৪ খানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর তালিকার সঙ্গে ব্রকেলম্যানের তালিকার বিশেষ মিল নেই।*

* My list including 64 items is largey independent of Brockelmann's—Sarton, Introduction to the History of Science Vol. 2, P. 1001.

এখানে বৈজ্ঞানিকের কতকগুলি পুস্তকের নাম দেওয়া গেল।
(১) কিতাবুল মুতাওয়াস্‌সিতাত্‌ বায়নোল হান্দাসা ওয়াল হাইয়া (The middle books between Geometry and Astronomy) এখানে মধ্যপুস্তক বলতে বোধ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইউক্লিডের Elements এবং টলেমির আলমাজেষ্টের সঙ্গে যে পুস্তক পাঠ করা দরকার, তারই কথা বুঝাচ্ছে। বস্তুত পূর্বেকার গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী বিশেষ করে Element এবং Almagest এর সঙ্গে আরব বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাবলী একত্রিত করেই আলমুতাওয়াসসিতাত্‌ প্রণীত হয়। এতে অটোলাইকাস, এরিষ্টারকাস, ইউক্লিড, এপোলোনিয়াস, আর্কিমেডিস, হিপসিকলস, থিওডোসিয়াস, মেনিলস, এবং টলেমি ইত্যাদি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাবলীর ভাষ্য বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং ছাবেত ইবনে কোরা, বনিমুসা প্রভৃতি মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাবলীর ভাষ্য একত্রিত করা হয়েছে। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিজের গ্রন্থও জুড়ে দিয়েছেন। মোটকথা গ্রন্থখানি সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ের পূর্বপরের একত্র সমাবেশ। অঙ্ক ও বীজগণীত—(২) মুখতামার বি জামিয়ল হিসাব বিল তাখতো ওয়াতভোরাব (Summary of the whole of computation with table and earth) আরবী পারসী উভয় ভাষাতেই গ্রন্থখানি বিদ্যমান। (৩) দুইটি অযুগ্ম (odd) বর্গের সমষ্টি যে বর্গ হয় না সে সম্বন্ধে প্রমান (৪) উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ (৫) কিতাবুল জাবরওয়াল মুকাবিলা—

বীজগণিত। জ্যামিতি—(৬) আলওস্সুলোলমাওহুয়া-ইউক্লিডের 'স্বীকার্য (postulates) সম্বন্ধে গ্রন্থ (৭) কাইসার ইবনে আবুল কাসিমের সঙ্গে পঞ্চম স্বীকার্য সম্বন্ধে পত্রালোচনা। খুব সম্ভব এখানি পূর্বোক্ত গ্রন্থের একটি অংশ বিশেষ। এতে আলোচনা হয়েছে বহু ব্যাপক এবং বহু সমস্যা বিজড়িত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জিরোলামো সাকেরীর (Girolamo Saccheri) বিখ্যাত গ্রন্থ Euclides ab omni nœvo vindicatus, নাসির উদ্দিনের এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই লিখিত হয়। জন ওয়ালিস (John wallis) De postulate quinlolib: 6. Euclidis নামে এর একখানি লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। (৮) কাওয়ায়েদুল হান্দাসা (Principles of Geometry) (৯) তাহরিরুল ওসুল—ইউক্লিডের Elementsএর দুইটি সংস্করণ (Redaction)। এই দুইখানি Longer Redaction of the Elements এবং Shorter Redaction of the Elements নামে পরিচিত। প্রথম গ্রন্থখানিতে নবম শতাব্দীর আলহাজ্জাজ ইবনে মাতার এবং ছাবেত ইবনে কোরার ভাষ্য ও তাঁদের প্রবর্তিত প্রমান প্রয়োগও যোগ করে দেওয়া হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রোমে এর একখানি লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি ১৫ খণ্ডে বিভক্ত। ১৮০১ খৃঃ অব্দে কনস্তান্তিনোপল থেকে এর এক সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতা থেকে প্রথম ছয় খণ্ডের (Books 1 to VI) এক সংস্করন প্রকাশিত হয়। আবুইসহাক এর একখানি

ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এ আবুইসহাকের পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। সুটারের মতে ইনি ইবনোল বান্নার শিক্ষক—আবুইসহাক আলআত্তার আজজাজুলি। তবে তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে বিশেষ কোন কারণ দেখান নাই। যা হোক বৈজ্ঞানিকের এ গ্রন্থখানি তৎকালে খুবই সমাদর লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে এর সমাদর সমভাবেই অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিশেষত বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা বিবেচনা করলে এখানিকে বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। ইউক্লিডের বিপরীত ভাবে তিনি কতকগুলি বিশেষ সমস্যার সমাধান পন্থা উদ্ভাবন করেন—Pythegorean theorem এর পক্ষেই তিনি ১৬টি অভিনব সমাধান পন্থার উল্লেখ করেছেন। এতে বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত বিজ্ঞান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও এ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাহায্য করে নাই। (১০) Element এর ১০৫টি সমস্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ (১১) ইউক্লিডের Dataর ভাষ্য (১২) তাহরিরোল মাফরুদাত লি ছাবেত ইবনে কোরা—ছাবেত ইবনে কোরার Dataর সংস্করণ (১৩) এপোলোনিয়াসের কনিকসের প্রথম সাত খণ্ডের (Book I to VII) অনুবাদ (১৪) ছাবেত ইবনে কোরা এবং ইসহাক ইবনে হোনায়েনের প্রবর্তিত নিয়মানুযায়ী আর্কিমেডিসের Sphere এবং Cylinder সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাষ্য। (১৫) আর্কিমেডিসের বৃত্তের ভাগ (Division of Circles) সম্বন্ধে গ্রন্থের ভাষ্য। (১৬) আর্কিমেডিসের Lemanta সম্বন্ধে ভাষ্য।

এতে ছাবেত ইবনে কোরা এবং আলি ইবনে আননাসাভীর ভাষ্যের অনেকটা অনুসরন করা হয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যামিতির ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ বর্তমান। জ্যামিতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে কিভাবে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে গ্রন্থকার তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ "তাজকিরাতে" তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমান করেন যে যদি কোন বৃত্ত অন্য একটি দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের বৃত্তকে অন্তস্থিত কোন বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং বৃত্ত দুইটি সমানভাবে বিপরীত দিকে গড়াতে থাকে, এবং ছোট বৃত্তটির গতি ও ট্যানজেন্ট অন্যটির দ্বিগুণ হয় তা হোলে ক্ষুদ্র বৃত্তের প্রথম স্পর্শ বিন্দুটির গতি হবে বৃহত্তর বৃত্তের এক ব্যাসার্ধের পথে (If a circle internally touches another circle of double diameter and if the two circles turn or roll uniformly in opposite directions remaining tangent and the speed of the smaller being twice greater than that of the other then the original point of cantact of the smaller circle will move along a diameter of the greater circle).

ত্রিকোণমিতিকে নূতন রূপ এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেওয়া নাসিরউদ্দিনের বিজ্ঞানজগতে অন্যতম প্রধান অবদান। তাঁর হাতেই ত্রিকোনমিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান ছেড়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিজ্ঞান

হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁরই সময় থেকে পূর্বেকার জবরজঙ্গ প্রথার অবসান ঘটে। নাসিরউদ্দিনের ত্রিকোণমিতিতে অবদানের কথায় কিতাবুস শাকলোল কাত্তার কথাই সর্বপ্রথম মনে পড়ে। এই একখানি গ্রন্থই যে কোন বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান জগতে অমরত্ব দান করতে সক্ষম। তবে শাকলোল কাত্তা ছাড়া (১৭) মেনিলসের sphericsর সংস্করণ প্রকাশ করাও ত্রিকোণমিতিতে তাঁর অন্যতম কীর্তি। এতে দশম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবু নসর মনসুর ইবনে আলির পন্থা অনুসৃত হয়েছে। (১৮) কিতাবুস শাকলোল কাত্তা—গ্রন্থখানি কিতাবু দাওয়াবীল শাকলোল মারুফ বিল কাত্তা বা কাশফোল কানা আন আসরার শাকলোল কাত্তা নামেও পরিচিত। সমস্ত গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। এর তৃতীয় খণ্ডে Plane trigonometry এবং চতুর্থ খণ্ডে Spherical trigonometry সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। দশম শতাব্দীর যুগ অবতার আবুল ওয়াফার হাতে ত্রিকোণমিতির স্বাধীন সত্বার বীজ রোপিত হয় তবে একে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন সত্বা দান করেন নাসিরউদ্দিন। তাঁর শাকলোল কাত্তাই বিশুদ্ধ ত্রিকোণমিতিক গ্রন্থ হিসাবে সর্ব প্রথম। সারটনের মতে এ গ্রন্থখানিকে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রেজিওমণ্টেনাসের De triangulis omnimodis libri quinque এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। "শাকলোল কাত্তা" অর্থ হোল sectorএর চিত্র। ভেদক দ্বারা কর্তিত ত্রিভুজের (triangle cut by a transversal)

সমস্যা সম্বন্ধে মেনিলসের theorem থেকেই এর যাহোক এটি শেষ পর্যন্ত মধ্য যুগের লাটিন অনুবাদে Figuara Cata বা Regula Cata নামে পরিচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কনস্তান্তিনোপলে আলেকজাণ্ডার কারাথিওডোরি পাশা (Alexandre Caratheodory Pasha) কর্তৃক এ গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির বেলায় শুধু যন্ত্র আবিষ্কার করেই বৈজ্ঞানিক ক্ষান্ত হন নাই। তিনি Sine quadrant সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানির নাম হোল (১৯) নুজহাতুন নাজির (The observers delight)। আস্তারলব সম্বন্ধেও তাঁর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানি পারসীতে লিখিত। এর নাম হোল (২৫) রিসালাতি বিস্ত বাব দার মারিফাতি উস্তারলাব (Twenty chapters in the science of the astrolabe)। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক আবদুল আলি ইবনে মোহাম্মদ ইবনোল হোসায়েন আলবারজান্দি এর একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

নাসিরউদ্দিন ও তাঁর সহকর্মীদের সুদীর্ঘ বার বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হোল জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবল। টেবলটির নাম হয় অবশ্য মোগল দলপতিদের নামানুসারে—জিজ-ই ইলখানি (The table of the Ilkhan)। মানমন্দির নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হালাকুখান নাসিরউদ্দিনকে টেবল তৈরী করতে আদেশ দেন। সম্পূর্ণ টেবল তৈরী করতে ত্রিশ বৎসর

দরকার হবে বলে বৈজ্ঞানিক মোগলদলপতিকে জানিয়ে দেন—কেন না তাঁর মতে এর কম সময়ে গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিষয় জানা অসম্ভব (This was the shortest period during which the planetary cycles were completed) হালাকু অত সময় দিতে রাজী হন নি। তিনি বার বৎসর মধ্যে এটিকে সম্পূর্ণ করতে বৈজ্ঞানিককে অনুরোধ জানান। হালাকুর আগ্রহাতিশায্যে নাসিরউদ্দিন এটিকে বার বৎসরের মধ্যে তৈরী করে দিতে সম্মত হন এবং ১২৭২ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ টেবলটি তৈরী হয়।

খুব সম্ভব জিজ-ই-ইলখানি প্রথম পারসীতে লিখিত হয়। এটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চীন, গ্রীক, আরব ও পারস্যের Chronology সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে গ্রহগুলির গতি সম্বন্ধে, তৃতীয় ভাগে Ephemerides এবং চতুর্থভাগে জ্যোতিষ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শিহাবউদ্দিন হালাবী এর আরবী অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পুনরায় আলি ইবনোল রিফাই আল হোসায়েনী (১৫২৭-২৮) "হল আলজিজ" (Solution of the tables) নাম দিয়ে আর একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রধানত বৈজ্ঞানিকদের নিজেদের পর্যবেক্ষনের ফল নিয়েই টেবলটি তৈরী হয় তবে পূর্বকার বৈজ্ঞানিক হিপারকাস, টলেমি, আলমামুনের জ্যোতির্বিদমণ্ডলী, আলবাত্তানী, ইবনোল আলম, ইবনে ইউনুস প্রভৃতির কার্যাবলীর উপরে ভিত্তি করেই এর নির্মান কাজ সুরু

হয়। নাসিরউদ্দিন গ্রন্থের প্রারম্ভেই এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। প্রাচ্যে টেবলটি অভাবনীয় সমাদর লাভ করে। চীনের বৈজ্ঞানিকদের উপরেও এ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উলুগবেগের নূতন টেবল প্রকাশিত হওয়ার পরেও এর সমাদরের মধ্যে বিশেষ ক্ষুণ্ণতা আসে নাই। এর সমাদরের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতে এর ভাষ্য প্রণীত হওয়া থেকেই। চতুর্দশ শতাব্দীতেই আলি শাহ ইবনে মোহাম্মদ আল খারেজমী "আল ওমদাতোল ইলখানিয়া" (Ilkhanic support) নামে এর একখানি ভাষ্য প্রকাশ করেন। এই শতাব্দীতেই ১৩৯২-৯৩ খৃঃ অব্দে আলহাসান ইবনোল হোসায়েন শাহিন শাহ আস্‌সিমনানি "তাওজিহ-ই-জিজ-ই-ইলখানি" নাম দিয়ে বিস্তৃত ব্যাখা সহ অন্য একখানি ভাষ্য প্রকাশ করেন। মাহমুদ শাহ খুলজী তাওজিহেরও একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলহাসান ইবনে মোহাম্মদ আন্‌নিশাপুরী "কাশফুল হাকায়েক" (Unveiling of the truths) নাম দিয়ে একখানি ভাষ্য তৈরী করেন। এই শতাব্দীরই মধ্যভাগে উলুগবেগের সমরকন্দের মানমন্দিরের প্রথম ডিরেক্টর জামসিদ ইবনে মাসুদ আলকাশী এরই পরিপূরক স্বরূপ "জিজোল খাকানী (The table of the great khan) নামে একটি টেবল তৈরী করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে জন গ্রীভস (John Greaves) আলখুলজীর ভাষ্যের এক অংশের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। নাসিরউদ্দিনের

পুত্র আসিলউদ্দিন হাসান কৃত টেবলের একখানি নকল এখনও বর্তমান রয়েছে।

এই টেবল প্রণয়নেই নাসিরউদ্দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে সব চেয়ে দরকারী হোল "তাজকিরা ফি ইলমোল হাইয়া" (Memorial of Astronomy) "তাজকিরা আন নাসিরিয়া" নামেও গ্রন্থখানি পরিচিত। এ নামটি অবশ্য গ্রন্থকারের নামানুসারে গড়ে উঠে নাই, এ গড়ে উঠে নাসিরউদ্দিনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কুহিস্থানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিনের নামানুসারে। মারাঘা গমনের পূর্বেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। খুব সম্ভব ১২৫৬ খৃঃ অব্দের পূর্বেই এখানি প্রণীত হয়। তখনই এর দুইটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

"তাজকিরা" বৈজ্ঞানিকদের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করেছিল এর ভাষ্য এবং ভাষ্যের প্রতিভাষ্যের সংখ্যা থেকেই তার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এর দুইখানি ভাষ্য প্রণীত হয়। একখানির প্রণেতা ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে আলি ইবনোল হোসায়েন আলহিমাজী। এখানির নাম হোল "বায়ান মাকাসিদোত তাজকিরা" (Explanation of the aims of the Tadhkira) মাহমুদ ইবনে মাসুদ কুতুবদ্দিন আসশিরাজীর কিছু কিছু নোটও এতে সংযুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয়খানার নাম হোল "তাওজিহাত তাজকিরা" (Illustration of the Tadhkira) হাসান ইবনে মোহাম্মদ আননিশাপুরী কর্তৃক

১৩১১-১২ খৃঃ অব্দে এখানি লিখিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও এর দুইখানি ভাষ্য প্রণীত হয়। একখানির প্রণেতা হোলেন কাজীজাদা আলরুমী। এই শতাব্দীতে ফতেহ আল্লাহ শিরওয়ানী তুর্কী ভাষায়ও একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আলখাফারী একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাজকিরা পারসীতে অনতিবিলম্বেই অনুদিত হয়; অনুবাদখানির নাম হোল "রিসালাই-ই-হাইয়া বা রিসালাই মুইনিয়া"।

তাজকিরার এত ভাষ্যের কারণ হোল এর আলোচিত বিষয় বস্তু। সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এতে আলোচিত হয়েছে এবং সেই জন্যেই সাধারন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এর মর্ম গ্রহন করা বিশেষ সহজসাধ্য নয়। যা হোক সেদিক দিয়ে যত কঠিনই হোক না কেন বৈজ্ঞানিকের জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রতিভা ও অবদানের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে হোলে এই গ্রন্থখানি ছাড়া গত্যন্তর নাই। দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ "তাজকিরা" এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কোন প্রধান ইউরোপীয়ান ভাষায়ও এর অনুবাদ হয় নাই। কারা দ্য ভো এর অংশ মাত্র অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন, সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত ও অনুদিত হওয়া একান্ত দরকার।

গ্রন্থখানি চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমে রয়েছে জ্যামিতিক এবং cinematical ভূমিকা। এতে সরল এবং জটিলগতি, স্থিরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদে সাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞান সূত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতার (Obliquity of the ecliptic) secular পরিবর্তন, Trepidation of Equinoxes প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। আলহাইছামের বিশ্ববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মতবাদের (cosmological view) সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন। আলহাইছামের মতে গ্রহগুলির কক্ষ বিভিন্ন আকারের ও কেন্দ্রের, কঠিন গোলাকার পদার্থের মত এবং একে অন্যের ট্যানজেন্টে অবস্থিত। এই পরিচ্ছেদেরই এক অংশে বৈজ্ঞানিক আলমাজেস্টের নানা মতবাদ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনা হয়েছে বিশেষ করে চন্দ্রের কোণ ও (anomalies of the Moon) গ্রহগুলির অক্ষরেখার গতিকে (motion in latitude of the planets) কেন্দ্র করে। বৈজ্ঞানিক শুধু টলেমির মতবাদের প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন নাই তিনি এই জবরজঙ্গ পন্থা বিদূরিত করবার জন্য নূতন মতবাদ ও পন্থারও প্রবর্তন করেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পৃথিবীর উপর অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের প্রভাবের কথা এবং আলমামুনের জ্যোতির্বিদগণের, কুস্তাবিন লুকা ও আলবেরুনীর অনুসরণ করে Geodesy সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া সমুদ্র, বায়ু ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে গ্রহগুলির আকার ও দূরত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে।

আলমাজেস্টের সমালোচনার মধ্যেও বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে এমনি ধারণা, বৈজ্ঞানিকের এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসারই পরিচয় দেয়। তাঁর প্রবর্তিত পন্থা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকে কতটা সুগম করে দেয় সে নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে এ টলেমির চেয়ে বিশেষ উন্নত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হোলেও জটিলতার দিক দিয়ে এও কম যায় নাই তাই সাধারণ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এর অনুসরণ করা বিশেষ সহজসাধ্য হয়ে উঠে নাই। এই জটিলতা পরবর্তী স্বল্পপ্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ বৃদ্ধি না করে দমিয়ে দেয় মনে হয়; তাই মুসলিম জগতে বিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতবাদও বৈজ্ঞানিক বিস্মৃতির ফাঁক দিয়ে অতল অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে যায়। এমনি ভাবে তাজকিরার কার্যোন্মাদিনী অংশ (positive side) নিষ্কর্ম হয়ে গেলেও এর অন্য অংশ (negative side) বৈজ্ঞানিকদিগকে উৎসাহিত করে তোলে। তাজকিরার এই সমালোচনাই কোপার্নিকাসের সংস্কারের সূচনা করে. বলা যেতে পারে।*

"তাজকিরা" ছাড়া বৈজ্ঞানিক আরও কতকগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (২৩) "জুবদাতুল হাইয়া" (The cream of

* The positive part of the Tadhkira was soon forgotten but the negative part—his new and forceful criticism of Ptolemaic Astronomy was an additional step towards the Copernicus reform—Sarton, Introduction to the History of Science, Vol. II, P. 1007.

Astronomy)-এর পূর্ণ নাম হোল "জুবদাতুল ইদরাক্ ফি হাইয়া আল আফ্‌লাক"। আরবী ও পারসী উভয় ভাষাতেই গ্রন্থখানি দেখতে পাওয়া যায়। (২৪) "কিতাবুত তাসহিল ফিন নজুম" (The Stars made Easy). (২৫) মঙ্গলের আকার, দূরত্ব ও Trajectory সম্বন্ধে গ্রন্থ (২৬) "ফিত্‌তুলু্ ওয়াল গুরুব" (Risings & Settings)—ছাবেত ইবনে কোরার ধারা অনুসরণ করে অটোলাইকাসের ভাষ্য (২৭) গোলকের গতি সম্বন্ধে (on the moving of the spheres) অটোলাইকাসের ভাষ্য—এতেও ছাবেতের পন্থা অনুসৃত হয়েছে। (২৮) "কিতাবো আরস্তিখাস" সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব এবং আকার সম্বন্ধে অলোচনা—এরিষ্টারকাসের গ্রন্থের ভাষ্য (২৯) ঘটনা সমূহ (Phaenomena)—ইউক্লিডের গ্রন্থের ভাষ্য। (৩০) নক্ষত্রের উদয় সম্বন্ধে গ্রন্থ—হিপসিকলসের গ্রন্থের ভাষ্য—এতে আলকিন্দি এবং কুস্তা বিন লুকার ধারা অনুসৃত হয়েছে। (৩১) গোলক সম্বন্ধে গ্রন্থ—থিওডোসিয়সের ভাষ্য। (৩২) দিন রাত্রি সম্বন্ধে গ্রন্থ। (৩৩) বাসস্থান সম্বন্ধে গ্রন্থ—এতে কুস্তা বিন লুকার ধারা অনুসৃত হয়েছে। (২৬) থেকে (৩৩) সংখ্যা পর্যন্ত এই আটখানি পুস্তক খুব সম্ভব মুতাওয়াস্‌সিতাতের অংশ। এর কয়েকখানিতে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। (৩৪) "তাহরিরুল মাজিস্তি"—১২৪৭ খৃঃ অব্দে প্রণীত। এটিকে আলমাজেষ্টের একটি সংস্করণ বলা যেতে পারে। তবে এতে টলেমির কার্যাবলীর সঙ্গে নিজের উদ্ভাবিত অনেক নূতন তথ্যও

বৈজ্ঞানিক যোগ করে দিয়েছেন। এই নূতন তথ্যগুলির মধ্যে অনুপাত (proportions), armillary spheres এবং নব পর্যবেক্ষণ ফল সমূহ অন্যতম। তাজকিরাতে যেমন আলমাজেষ্টের সমালোচনা হয়েছে এখানে তেমন আলোচনা নেই। ১২৭৬ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ ইবনে আশরাফ শামসউদ্দিন আসসমরকন্দী এর একখানি ভাষ্য লেখেন। তার পরে ১৩০৪-৫ খৃঃ অব্দে আলহাসান ইবনে মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন আননিশাপুরী এবং ষোড়শ শতাব্দীতে আবদুল আলি ইবনে মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন আলবারজান্দিও একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে পঞ্জিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবল প্রস্তুত করার কথা উঠতে পঞ্জিকার কথা আপনিই এসে পড়ে। নাসিরউদ্দিনেরও দুইখানা পঞ্জিকা সংক্রান্ত গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে যেমন পঞ্জিকা বলতেই তার সঙ্গে বর্ষফল ইত্যাদি জ্যোতিষিক আলোচনা ও ভবিষ্যদবাণীর ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায় নাসিরউদ্দিনের পঞ্জিকাতেই তার সূচনা দেখা যায়। এর মধ্যে পঞ্জিকার সন তারিখ গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিধির সঙ্গে জ্যোতিষের কার্যকলাপও অনেক অংশই জুড়ে রয়েছে। এর একখানার নাম হোল (৩৫) "মুখতাসার ফি ইলমোত তানজিম ওয়া মা রফাতোত তাকবিম" (Summary of Astrology and of the calendar) এর একখানি পারসী সংস্করণও দেখা যায়। এই পারসী সংস্করণের নাম হোল "রিসালাই সি ফসল" (Treatise in thirty

chapters)। বাদরুলতাবারী এর একখানি পারসী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ১৩৯৪–৯৫ খৃঃ অব্দে আবছুল ওয়াহিদ ইবনে মোহাম্মদ এর একখানি আরবী ভাষ্য লেখেন। অন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরও একখানি আরবী ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। (৩৬) "কিতাবুল বারি ফি গুলুমোত তাকবিম ওয়া হারাকাতোল আফলাক ওয়া আহকামুন নজুম" (The excellent book on the calendar, the movements of the spheres and Judicial Astrology). সম্পূর্ণ জ্যোতিষ বিষয়েও তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—(৩৭) টলেমির Quadripartitumর অনুকরণে পারসীতে লিখিত একখানি গ্রন্থ (৩৮) আরবী ও পারসীতে লিখিত Pseudo Ptolemy (Centiloquium) এর অনুকরণে অন্য একখানি গ্রন্থ ও ফালনাম (presage) (৩৯) "কিতাবুল ওয়াফি ফি ইলমোর রামল" (The perfect treatise on the science of Sand i.e. Geomaney) এর অন্য নাম হোল "আররিসালা আস্ সুলতানিয়া ফি খাততোল রামল" (sultanian epislte on the sand figure) (30) ইখতিয়ারাত—(choices i.e. of propitious days) তুর্কী ভাষায় লিখিত।

শুধু অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যেই নাসিরউদ্দিনের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানেরঃ অন্যান্য শাখায়ও তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পদার্থবিদ্যার Optics সম্বন্ধে

তাঁর দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানির নাম হোল (৪১) "তাহ্‌রির কিতাবোল মানাজির"—এখানি খুব সম্ভব মুতাওয়াস্‌সিতাতের এক অংশ। এতে ইউক্লিডের Optics সম্বন্ধে মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন জিনিস থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে বলেই আমরা দেখতে পাই কিন্তু এ এমনভাবে সংঘটিত হয় যেন আমাদের চোখ থেকেই আলো যাচ্ছে (৪২) "মাবাহিছ ফি ইনিকাসোস শুয়াত ওয়া ইনি তা ফিহ্‌া" (Research in the reflection and deflection of rays)—আপতন (Incidence) এবং প্রতিফলনের (Reflection) কোণ যে সমান এতে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থখানি Eilhard Wiedemann কর্তৃক জার্মানিতে "Uber die Reflexion und umbiegung des Lichtes" নামে অনুদিত হয়েছে। (৪৩) শুকনো ও ভিজা জিনিসের রং এর উপর শীত গ্রীষ্মের প্রভাব সম্বন্ধে ইবনে সিনার মতবাদ সম্বন্ধে আলি ইবনে ওমর আলকাজবিনির প্রশ্নের উত্তর। E. Wiedemann "Uber die Entstehung der Farben nach Nasir al-Din al Tusi" নাম দিয়ে এর একখানি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করেন। (৪৪) "তানসুখ নামাই ইলখানি"—Mineralogy সম্বন্ধে গ্রন্থ। গান সম্বন্ধেও নাসিরউদ্দিনের কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। (৪৫) "কিতাবু ফি ইলমোল মুসিকি" (৪৬) "কানজোত তোহাফ"—পারসীতে লিখিত। খুব

সম্ভব এখানি পূর্বোক্ত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ। তুর্কী প্রবাদ অনুসারে নাসিরউদ্দিন একটি নূতন রকমের বাদ্য যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। এর নাম হোল "মাহতার হুহুক" (chapel flute) ;

ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর নাম হোল "কিতাবু সুরাতুল আকালিম"। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে অনেকগুলি ম্যাপ দেওয়া রয়েছে। অনেকেরই ধারণা এখানি দশম শতাব্দীর ভৌগলিক আলবালখির "সুওয়ারোল আকালিমের" অনুবাদ কিন্তু এতে শেষোক্ত গ্রন্থখানির অনুকরণ থাকলেও একে অনুবাদ বলা চলে না। বৈজ্ঞানিকের জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ ও টেবল সমূহেও ভৌগলিক নানা বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। তাজকিরার তৃতীয় পরিচ্ছেদ ত সমুদ্র, সামুদ্রিক বায়ু প্রভৃতির বর্ণনাতেই ভরপুর।

নাসিরউদ্দিন চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয় না তবে এদিকেও তাঁর প্রতিভা যে খুব কম ছিলনা তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থাবলী থেকেই। (৪৮) এর একখানি হোল ইবনে সিনার "কুল্লিয়াত" এর ভাষ্য (৪৯) দ্বিতীয় খানার নাম হোল "কিতাবুল বাবুল বাহিয়া ফিত তারাকিবোস সুলতানিয়া"। কাজানের সুলতানের ব্যাধি উপশম উপলক্ষে এখানি রচিত হয়। গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুইভাগে স্বাস্থ্যের নিয়ম কানুন এবং পথ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে কামশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। নাসিরউদ্দিন হালাকুখানের জন্য "দারায়েকুল ফারুকী"

বা সমস্ত প্রকার বিষের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধেও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এখানি তাঁর নিজের রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হালাকুখানের পুত্র আবাকা বন্য গোরু কর্তৃক আহত হোলে নাসিরউদ্দিন তাঁর চিকিৎসা করেন।

ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ—(৫০) "কিতাবোত তাজরিদ ফি ইলমোল মানতেক" (Compendium of Logic)। বৈজ্ঞানিকের শিষ্য আল হাসান ইবনে ইউসুফ ইবনোল মোতাহ্হার আল হিল্লি "সারহো তাজরিদোল মনতেক" নামে এর একখানি ভাষ্য লেখেন (৫১) ইবনে সিনার "কিতাবুল ইশরাত ওয়াত তানবিহাতের" একখানি ভাষ্য। ফখরউদ্দিন রাজীর প্রতিবাদের উত্তর স্বরূপ এখানি রচিত হয়। (৫২) "কিতাবু আকসামোল হিকমা" (Division of Philosophy).

দার্শনিক হিসাবেও নাসিরউদ্দিন তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেন। দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সাতখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। (৫৩) "কিতাবুল ফুসুল" Metaphysics সম্বন্ধে গ্রন্থ—এখানি পারসীতে লিখিত হয়, আলজুরজানি এর আরবী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অজ্ঞাত নামা কোন এক ব্যক্তির "আনোয়ারুল জালালিয়া" নামে এর একখানি ভাষ্য দেখতে পাওয়া যায়। (৫৪) "রিসালা ফি ইছবাতোজ জাওহার আল মুফারিক"—জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে গ্রন্থ। শামসউদ্দিন আলকাশমি এবং ষোড়শ শতাব্দীর মোহাম্মদ ইবনে আসাদোদদাওয়ানি সিদ্দিকি এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। (৫৫) আলফারাবীর "জ্ঞান ও সুখের

বন্ধ অবস্থায় আস্তারলবের সম্মুখভাগ

জন্ত শিক্ষা" সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ভাষ্য। (৫৬) "তালখিছোল মুহাস্সল" —১২৭০-৭১ খৃঃ অব্দে প্রণীত। এখানি ফখরউদ্দিনের "কিতাবো মুহাস্সল আফকারোল মুতাকাদ্দামিন ওয়া মুতাখখারিন" গ্রন্থের ভাষ্য। এতে বিজ্ঞানের নানা বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। (৫৭) জাফর ইবনে মোহাম্মদ আলহিল্লি আলমোহাককিকের স্বাদের প্রকৃতি (Nature of taste) সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর (৫৮) আলি ইবনে ওমর আলকাজবিনি আলকাতিবীর "শারহোল মুহাককিক" এর ভাষ্য (৫৯) আলি ইবনে ওমরের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা।

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায় যেমন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় ধর্মশাস্ত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ সম্বন্ধেও তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন(৬০)"জাওয়াহিরোল ফারায়েজোন নাসিরিয়া"। খুব সম্ভব কুহিস্তানের গভর্ণর নাসিরউদ্দিনের নামানুযায়ী এর নামকরণ করা হয়। এতে ফিকাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আলি ইবনে মোহাম্মদ আলজুরজানি এর একখানি ভাষ্য লেখেন। (৬১) "তাজরিদোল আকায়েদ" উচ্চস্তরের দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ। এখানি যে সে সময় খুবই সমাদর লাভ করে নানা ভাষ্য এবং প্রতিভাষ্য থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু আরবী এবং তুর্কী পণ্ডিত এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কতিপয় ভাষ্যকারের নাম থেকেই এর ব্যাপকতা বোঝা যাবে—আলহাসান ইবনে ইউসুফ ইবনোল

মুতাহহার আলহিল্লি (১৩২৬ খৃঃ অব্দে মৃত্যু), মাহমুদ আলইস্পাহানি (১৩৪৮-৪৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যু)—এঁর ভাষ্যের নাম হোল "আশশারহোল কাদিম"; আলি ইবনে মোহাম্মদ আলকুশজী (১৪৭৪–৭৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যু)—ভাষ্যের নাম "আশশার হোজ জাদিদ"; মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে সোলায়মান ইবনে কামাল পাশা" (১৫৩৩-৩৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যু) —ভাষ্যের নাম "আশশারহোত তাজবিদ"-এর একখানি পাণ্ডুলিপি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান আছে। (৬২) "কিতাবু কাওয়ায়েদোল আকায়েদ"—খোদার গুণ ও Essence এবং ঐশীবানীর প্রকৃতি, কিয়ামত প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঁচ পরিচ্ছেদে আলোচনা। Ethics সম্বন্ধে তাঁর দুইখানি গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। এর একখানির নাম হোল (৬৩) "আখলাকিন নাসিরি"—গ্রন্থখানির নাম হয় ইসমাইলি গভর্ণর নাসিরউদ্দিনের নামানুসারে। গ্রন্থকারের মতে জ্ঞান দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—Speculative এবং Practical. Speculative জ্ঞান আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (১) Metaphysics. ধর্মশাস্ত্র (২) অঙ্কশাস্ত্র, গান, পদার্থবিদ্যা, মেকানিকস্ (৩) প্রাকৃত বিদ্যা—Elements, Science of transformation, Meteorology, Mineralogy, Botany, Zoology, Psychology, Medicine, Astrology, Agriculture প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। Practical জ্ঞান (১) Ethics, (২) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৩) রাজনীতি। গ্রন্থখানি তখন খুবই সমাদর লাভ

করে। বর্তমান আরব জগতেও এর সমাদর কমে নাই। প্রকাশিত হওয়ার অনতিবিলম্বেই এখানি আরবীতে অনুদিত হয়। আরবী অনুবাদখানির নাম হোল "রিসালা ফি তাহাককোল ইলম"। ভারতবর্ষেও এর অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১২৬৭ হিজরীতে বোম্বেতে, ১২৬৯ হিজরীতে কলিকাতায় এবং ১২৮৬ হিজরীতে লাখনৌতে এর কয়েক সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় পারসী শিক্ষার জন্য এই গ্রন্থখানিকে খুবই সমাদরের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন, এর কতক অংশ J. Stephenson কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে। (৬৪) "আওসাফোল আশরাফ ফিস সিয়ারেস সুলুক"—এখানিও পারসীতে" লিখিত। তবে প্রথমখানির অনেক পরে এখানি লিখিত হয়। এর মধ্যে সুফী প্রভাবই বেশী দেখা যায়। মোহাম্মদ ইবনে আলি আলজুরজানি এর আরবী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

ওমর খৈয়ামের কাব্য প্রীতি নাসিরউদ্দিনকেও পেয়ে বসে। সেকালের অন্যান্য পারসী বৈজ্ঞানিকের মত তিনিও কতকগুলি রুবাইয়াত রচনা করেন। তাঁর রুবাইয়াতগুলির কাব্য ও দর্শন যে বিশেষ উপেক্ষনীয় নয় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত বলে পরিচিত হওয়াতেই সে বোঝা যায়।

নাসিরউদ্দিনের বিজ্ঞান প্রতিভা কোন স্তরের ছিল উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এস্থানে সম্ভবপর নয়। অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও অঙ্কশাস্ত্রের জ্যামিতি

ও ত্রিকোণমিতিতে তিনি যে নূতন পথের সন্ধান দেন সেই তাঁকে বিজ্ঞান জগতে চির অমর করে রাখবে। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত জ্যামিতিতে ইউক্লিডের প্রদর্শিত পন্থাই অনুসৃত হচ্ছিল। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হাতে প্রভূত উন্নতি হোলেও ইউক্লিডের সংজ্ঞার বাইরে এ আর এগুতে পায় নাই। ইউক্লিডের সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ জ্যামিতি ও জ্যামিতিকদের মন জুড়ে বসে থাকে। তার উপরেই বৈজ্ঞানিকদের কাজ চলতে থাকে। অন্য প্রকারেও যে জ্যামিতির উদ্ভাবনা করা যেতে পারে সে কেউই বিবেচনা করেন নাই। নাসিরউদ্দিনই সর্বপ্রথম ইউক্লিডের এতদিনকার পূজ্য মতবাদকে দূরে ঠেলে দিয়ে জ্যামিতিতে নূতন পথ প্রদর্শন করেন। বর্তমানে এই নূতন পন্থাই বিজ্ঞান জগতে Non-Euclidean Geometry নামে পরিচিত। অষ্টদশ শতাব্দীর জিরোলামো সাকেরী (Girolamo Saccheri) এই Non-Euclidean Geometryর উদ্ভাবনকর্তা হিসাবে পরিচিত কিন্তু সাকেরীর উদ্ভাবনের মূলে রয়েছে নাসিরউদ্দিনের কার্যাবলী। অন্যান্য আবিষ্কারের মতই মুসলিম বৈজ্ঞানিকের এই আবিষ্কারও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য বলেই ঘোষিত হচ্ছে।*

নাসিরউদ্দিনের এই নূতন মতবাদের উদ্ভাবনা হয় ইউক্লিডের

* (The History of Non-Euclidean Geometry can be traced back through Saccheri to one of Nasiraldins writings—Sarton, Introduction to the History of Science—vol. 2, p. 754).

পঞ্চম সংজ্ঞা Postulates of parallels এর আলোচনায়। টলেমি থেকে আরম্ভ করে অনেক বৈজ্ঞানিকই ইউক্লিডের দুর্বল যুক্তিকে খণ্ডন করে এর সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। নাসিরউদ্দিন ও এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা উত্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গেই ইউক্লিডের সংজ্ঞার দুর্বলতা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুর্বলতা খণ্ডনের উপায় স্বরূপ তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে জ্যামিতিকে গড়ে তুললেই এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলতে পারে। তেমনিভাবে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও উত্থাপন করেন। সাকেরী নাসিরউদ্দিনের এই আলোচনাকে আরও সুবিস্তারিত করে তোলেন Postulates of Parallels ব্যাপারে। তাঁর
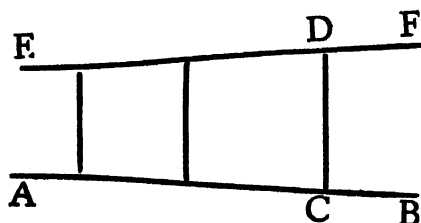
মতে AB যদি CD সরলরেখার C বিন্দুতে লম্ব হয় এবং EDF অন্য একটি সরল রেখা এর সঙ্গে EDC সূক্ষ্ম কোণ গঠন করে তা হোলে AB এর উপরকার CD এর পাশে AB এবং ED এর মধ্যে অঙ্কিত লম্বগুলি CD থেকে যত E এর দিকে যাবে ততই ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

এটি কিন্তু সাকেরীর মৌলিক আবিষ্কার নয় যদিও

ইউরোপীয় ইতিহাসে এ তাঁর মৌলিক অবদান বলেই পরিচিত। সাকেরীর বহু পূর্বে নাসিরউদ্দিনই সর্বপ্রথম এর উত্থাপন করেন। এখানে নাসিরউদ্দিনের নিজস্ব যুক্তি ও প্রমাণ উধৃত করা গেল—এ থেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ইউক্লিড কতকগুলি Postulate প্রচার করেন। তাঁর পঞ্চম Postulate হোল—"যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটি সরল রেখাকে ছেদ করে, এবং ছেদকের একই পার্শ্বে অবস্থিত অন্তঃস্থ কোণ দুইটির সমষ্টি দুই সমকোণের কম হয়, তা হোলে সরল রেখা দুইটিকে ঐ পার্শ্বে বর্ধিত করলে পরস্পর ছেদ করবে"। এর প্রমাণের জন্য নাসিরউদ্দিন অন্য দুইটি Postulate এর সাহায্য নেন। একটি হোল "একই সমতলে অঙ্কিত দুইটি সরল রেখার ব্যবধান একদিকে দূরতর থাকলে সেদিকে নিকটতর হতে পারে না বা একদিকে নিকটতর থাকলে সে দিকে দূরতর হতে পারে না"। অন্যটি হোল "যদি দুইটি সরল রেখার একটি অপরটির ছোট হয়, তা হোলে ছোটটির দ্বিগুণ ত্রিগুণ বা কয়েকগুণ নিয়ে বড়টি অপেক্ষা বড় করা যেতে পারে"।

বৈজ্ঞানিক সাতটি অনুজ্ঞায় Postulateটির প্রমাণ দিয়েছেন। সংক্ষেপের জন্য এখানে শুধু তাঁর তৃতীয় অনুজ্ঞাটি উধৃত করা গেল।

"যদি একটি সরল রেখার উপর দুইটি সমান লম্ব টানা হয় এবং লম্ব দুইটি একটি সরল রেখা দিয়ে যোগ করে দেওয়া যায় তা হোলে উৎপন্ন কোণ দুইটির প্রত্যেকে এক সমকোণ হবে।

AB সরল রেখার A ও B বিন্দুতে CA ও DB তুইটি সমান লম্ব টানা যাক। C ও D কে CD সরল রেখা দিয়ে যোগ করে দেওয়া যাক্। তা হোলে ACD এবং BDC কোণ তুইটি প্রত্যেকে এক সমকোণ হবে। (কোন তুইটি যে সমান দ্বিতীয় অনুজ্ঞায় তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে)।
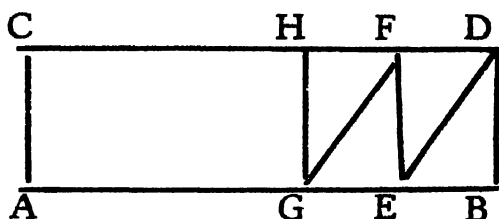
প্রমাণ :—যদি কোণ তুইটি সমকোণ না হয় তা হোলে প্রত্যেকে হয় (ক) স্থূল কোণ অথবা (খ) সূক্ষ্ম কোণ হবে।

(ক) প্রথমত মনে করা যাক্ এর প্রত্যেকটি স্থূল কোণ। CD এর উপর ED লম্ব টানা যাক্। BDC কোণকে স্থূল কোণ ধরে নেওয়া হয়েছে, অতএব ED, CA ও DBর মধ্যেই অবস্থিত থাকবে, এবং বহিঃস্থ কোণ ∠DEA, ∠DBA থেকে বড় হবে, কিন্তু ∠DBA এক সমকোণ অতএব ∠DEA স্থূল কোণ।

এখন আবার EA রেখায় E বিন্দুতে, EF একটি লম্ব টানা যাক্। DEA কোণটি স্থূল কোণ বলে EF, DE এবং CA এর মধ্যেই অবস্থিত থাকবে। পূর্বের মতই তা হোলে EFC কোণটিও স্থূল কোণ হবে।

আবার FC রেখার F বিন্দুতে GF একটি লম্ব অঙ্কণ করা যাক্ এবং AG রেখার G বিন্দুতে HG একটি লম্ব অঙ্কণ করা যাক্।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে CD রেখার D, F, H বিন্দু থেকে AB রেখার উপর অাঙ্কত লম্বগুলির দৈর্ঘ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে DBই সব চেয়ে ছোট। কেননা DEB ত্রিভূজের DE বাহু, DBE সমকোণের বিপরীত অতএব DE, DBর চেয়ে বড়, তেমনি EF, EDF সমকোণের বিপরীত বাহু বলে DEর চেয়ে বড়। এমনি FG, FE এর চেয়ে বড়, HG আবার FG এর চেয়ে বড়। এমনি যে সমস্ত লম্ব টানা যাবে সেগুলিও এমান ক্রমশ দীর্ঘতর হবে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে CD এর যে সমস্ত বিন্দু থেকে লম্ব টানা হয়েছে, AB রেখা থেকে তাদের দূরত্ব, Cএর দিকে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ CD সরল রেখা Dএর দিকে ABর নিকটতর এবং C এর দিকে দূরতর হচ্ছে। অন্য কথায় AB ও CD বর্ধিত করলে Dএর দিকে এদের ব্যবধান ক্রমশ কম হতে থাকবে এবং C এর দিকে এদের ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

আবার $\angle$ACD কোণের দিক থেকে বিবেচনা করলে (এটিও স্থূল কোণ এবং BDC কোণের সমান) ঠিক পূর্বের মতই দেখান যায় যে AB ও CD সরল রেখা দুইটির ব্যবধান, Dএর দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে এবং C এর দিকে ক্রমশ কমতে থাকবে। কিন্তু পূর্বে দেখান হয়েছে যে রেখা দুইটির

ব্যবধান Dএর দিকে ক্রমশ কমছে—অর্থাৎ রেখা দুইটি পরস্পর ছেদ না করলেও একই দিকে নিকটতর ও দূরতর হতে থাকবে। এ অসম্ভব। অতএব কোণ দুইটির স্থূল কোণ হওয়াও অসম্ভব।

(খ) দ্বিতীয়ত মনে করা যাক দুইটি কোণই সূক্ষ্ম কোণ। এবার ও পূর্বের মতই লম্ব টানা যাক। প্রথমে B বিন্দু থেকে CD এর উপর BE লম্ব টানা যাক। BE তা হোলে AC এবং BD এর মধ্যেই অবস্থিত থাকবে তা না হোলে DBE ত্রিভূজের একটি কোণ হবে সমকোণ অন্যটি হবে স্থূল কোণ। কিন্তু সে অসম্ভব। এমনি ভাবে DB, EF, GH লম্ব টানলে, এগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে। এ থেকে পূর্বের মতই প্রমাণ করা যাবে যে CD রেখাটি C এর দিকে ক্রমশ AB রেখার নিকটতর হতে থাকবে, এবং D এর দিকে দূরতর হতে থাকবে।
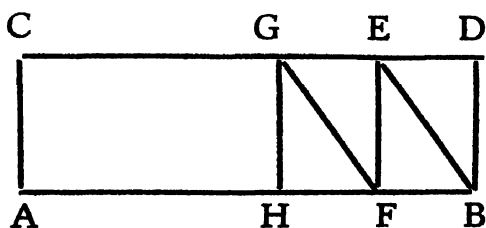
তেমনি ACD কোণের দিক থেকে বিবেচনা করলে, পূর্বের মত লম্ব টেনে দেখা যাবে যে রেখা দুইটি D এর দিকে ক্রমশ নিকটতর হতে থাকবে। কিন্তু দুইটি রেখা একই দিকে

নিকটতর ও দূরতর হওয়া অসম্ভব। অতএব কোণদুটি সূক্ষ্ম কোণ হতে পারে না।

যা হোক এ থেকেই দেখা যাচ্ছে নাসিরউদ্দিনই সর্বপ্রথম Reductio-ad-absurdumএর সূচনা করেন। এই Reductio-ad-absurdum ননইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির মূল উপাদান। দুর্ভাগ্যের বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কল্যাণে নাসিরউদ্দিনের এই মৌলিক অবদানের কথা বিজ্ঞান ইতিহাস থেকে নির্বিবাদে বাদ পড়ে গেছে। নাসিরউদ্দিনের নামও কোথাও উল্লিখিত হয় না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সোমারভিলের কথা থেকেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

সোমারভিল তাঁর Non-Euclidean Geometry গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সাকেরীর বিষয় বলেছেন "জোরালামো সাকেরী সমস্যাটির (parallel postulate এর প্রমাণ) সমাধানার্থে একেবারে পৃথক ধরনের উপায় উদ্ভাবন করেন। উপায়টি হোল Reductio-ad-absurdum. তিনি AB রেখার উপর AC, BD দুইটি সমান লম্ব নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। CD যোগ করে সহজেই প্রমাণ করেন যে কোণ দুইটি সমান।" বলা বাহুল্য নাসিরউদ্দিন তাঁর দ্বিতীয় অনুজ্ঞায় এটি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এর উপর নির্ভর করেই তৃতীয় অনুজ্ঞার প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। যা হোক সাকেরী কোণ দুইটি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হয়েছেন সোমারভিল সঙ্গে সঙ্গে তারও উল্লেখ করেছেন "এখন কথা হোল কোণ দুটি কি

সমকোণ ? সাকেরী এখানে কোন ধরা বাঁধা কথা মেনে নেন নাই। তিনি মুক্তমনে অগ্রসর হয়েছেন এবং এ সম্বন্ধে তিনটি সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কোণগুলি (১) সমকোণ (২) স্থূলকোণ (৩) সূক্ষ্ম কোণ যে কোন প্রকারের হতে পারে। তবে এমনিতে তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে প্রথম সম্ভাবনা অর্থাৎ ইউক্লিডের প্রস্তাবনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।"

যা হোক সোমারভিল ও অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাকেরীর জন্য যে মৌলিকতার গৌরব দাবী করেছেন ন্যায়ত সাকেরী সে মৌলিকতা দাবী করতে পারেন কিনা সন্দেহ। অন্তত Reductio-ad-absurdum বিষয়ে তিনি হুবহু নাসিরউদ্দিনের অনুসরণ করেছেন মাত্র। সাকেরীর "মৌলিক চতুর্ভুজ" নামে অভিহিত চতুর্ভুজটিও নাসিরউদ্দিনের পঞ্চম অনুজ্ঞার অনুকরণ মাত্র। বস্তুত নাসিরউদ্দিনের এই অত্যদ্ভুত পরিকল্পনাগুলিকেই সাকেরী পুনর্জীবিত করে তোলেন। পরে উনবিংশ শতাব্দীতে গাউস (Gauss), বোলাই (Bolyai), লোবাট সিউসকি (Lobat schewsky) বৈজ্ঞানিকত্রয় এর উপর ভিত্তি করে Non-Euclidean Geometry প্রচার করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওয়ালিস (Wallis) লাটিনে নাসিরউদ্দিনের এই প্রমাণ ও আলোচনার অনুবাদ করেন। তা থেকেই এর প্রচার হয় এবং এ সাকেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মোগলদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহের প্রধানতম কারণ ছিল বিজয় অভিযানের সহায়তায় একে কাজে লাগান। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মন সাধারণ মানবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের দিকেই শুধু লক্ষ্য রাখে নাই শুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকেও সে ঝুঁকে পড়েছিল, প্রথমটায় হয়ত বা সবার এবং নিজেরও অলক্ষ্যে কিন্তু তারই ফলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান শাখার সৃষ্টি হয়।

নাসিরউদ্দিনই ত্রিকোণমিতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্বা দান করেন সে পূর্বেই বলা হয়েছে। ক্যাজোরির মতে নাসিরউদ্দিনের ত্রিকোণমিতির সঙ্গে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের পূর্ণ পরিচয় থাকলে বিজ্ঞানজগতের অগ্রগতি আরও দ্রুততর হতে পারত। আবুল ওয়াফা এর স্বতন্ত্রতার বীজ রোপণ করে গেলেও এ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হাত থেকে একেবারে রেহাই পায় নাই। নাসিরউদ্দিন একে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে মুক্তি দিয়ে সঞ্জীবিত করে তোলেন বলা চলে। যে যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া ত্রিকোণমিতির কল্পনাই ছিল অসম্ভব—সেই যুগের এক বৈজ্ঞানিকের এমনি মনোবল তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞানপ্রতিভার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রিকোণমিতিতে তাঁর "শাকলোলকাত্তা"

* He for the first time elaborated trigonometry independently of Astronomy and to such a great per--fection that had his works been known, Europeans of the fifteenth century might have spared their labors. Cajori—A History of Math. P. 108.

গ্রন্থখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে ত্রিকোণমিতির সমস্ত বিষয়ই বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য গোলীয় ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আলোচনাই এতে সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মৌলিকতা ও যুক্তিবত্তার দিক দিয়ে, এই নবপ্রবর্তিত নিয়ম পদ্ধতিগুলি অঙ্কশাস্ত্রে নবযুগ আনয়ন করে—মৌলিক আবিষ্কারের দিক থেকে এ পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এতে তিনি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে সরল ভাষায় প্রথমে মেনিলস ও টলেমির প্রবর্তিত নিয়মানুসারে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন তৎপরে নিজের উদ্ভাবিত নিয়মে এর সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের অনুসৃত পন্থা ও তাঁর উদ্ভাবিত পন্থার পার্থক্য এবং উভয়ের সুবিধা অসুবিধাও তিনি সুন্দরভাবে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে উত্থাপিত করেছেন।

Spherical Trigonometryর সঙ্গে সঙ্গে Plane Trigonometryর দিকেও বৈজ্ঞানিক আকৃষ্ট হন। সাইন সম্বন্ধ যে Plane Trigonometryতেও যথাযথভাবে খাটে তিনিই সর্বপ্রথম এ গ্রন্থে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেন এবং এই সঙ্গে দুইটি প্রমাণও প্রয়োগ করেন। Spherical Trigonometryর ফরমুলা ছয়টিও তিনি স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রবর্তিত পরিপূরক সংখ্যার (Supplementary Figure) নিয়ম টলেমির জবরজঙ্গ প্রথা থেকে অঙ্কশাস্ত্রবিদদের রেহাই দিয়েছে। টলেমির স্থানে বর্তমানে নাসিরউদ্দিনের সরল বৈজ্ঞানিক পন্থাই অনুসৃত হয়। 'পরিপূরক সংখ্যা'

নিয়মটি সাধারণভাবে কোণ এবং বাহুর সম্বন্ধ দেখিয়ে দেয়। আধুনিক প্রচলিত চিহ্ন আনুসারে এ দাঁড়াবে

$$\frac{\text{Sin a}}{\text{Sin A}}=\frac{\text{Sinb}}{\text{Sin B}}=\frac{\text{Sin c}}{\text{Sin C}}$$

এরই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ট্যানজেন্টের নিয়মটিও যোগ করে দেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাতে এ সম্বন্ধটি হোল $\text{Sin b}=\frac{\text{Tan c}}{\text{Tan C}}$. এর পূর্বেও ছাবেত ইবনে কোরা, আবুল ওয়াফা, আলবেরুনী, জাবির ইবনে আফলাহ ত্রিকোণমিতির দিক থেকে বাহুর সঙ্গে কোণের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। নাসিরউদ্দিন এই আলোচনাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্পষ্ট করে তোলেন। ফলে

$$\frac{a}{\text{Sin A}}=\frac{b}{\text{Sin B}}=\frac{c}{\text{Sin C}}$$

প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি পূর্বেকার জড়তা ভাব কাটিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই মোগল বৈজ্ঞানিকের হাতে সুন্দরভাবে সুপ্রকট হয়ে উঠে এর সঙ্গে অন্যান্যগুলির যোগ দেওয়াতেই। সমকোণীগোলীয় ত্রিকোণমিতির অন্য ছয়টি সম্বন্ধও নাসিরউদ্দিনই সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেন। আধুনিক চিহ্ন অনুসারে এ ছয়টি সম্বন্ধ হোল

$$\text{Cos c}=\text{Cos a Cos b}\,; \qquad \text{Cos A}=\text{Tan b Cot c}\,;$$
$$\text{Cos c}=\text{Cot A Cot B}\,; \qquad \text{Sin b}=\text{Sin C Sin B}\,;$$
$$\text{Cos A}=\text{Cos a Sin B}\,; \qquad \text{Sin b}=\text{Tan a Cot A}.$$

* Trigonometry, plane and spherical, is now well established and finds in this book its first methodically developed and deliberate expression,—Carra de Vaux, The Legay of Islam. P. 397.

শুধু Plane এবং Spherical ত্রিভূজ নিয়েই বৈজ্ঞানিক ক্ষান্ত হন নাই ; অন্যান্য ত্রিভূজের বেলায়ও একে কেমন ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে সেও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেন। বাহুর সঙ্গে কোণের এবং কোণের সঙ্গে বাহুর সম্বন্ধ তিনি Polar ত্রিভূজের সাহায্যেও বিশেষভাবে প্রমাণিত করেন। বৈজ্ঞানিক অবশ্য বর্তমান মতানুযায়ী Polar ত্রিভূজ সংজ্ঞা দিয়ে নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে Polar ত্রিভূজের সমস্ত ভাবই ফুটে উঠেছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত Polar ত্রিভূজের সম্বন্ধে এর চেয়ে সুস্পষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক নির্দেশই দেখতে পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানপ্রতিভা বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হতে দেখা যায় খুবই কম। মিসরের বৈজ্ঞানিক ইবনে ইউনুসের পুত্র ছিল পিতার ঠিক বিপরীত। নাসিরউদ্দিন কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পান। তাঁর তিন পুত্রও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পিতার মত অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হোলেও তাঁদের বিজ্ঞান জ্ঞানও যে বেশ উচ্চ স্তরেরই ছিল মারাঘার মানমন্দিরের ডিরেক্টর নির্বাচিত হওয়াতেই সে বেশ বোঝা যায়। পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে সদরউদ্দিন আলি, আসিল উদ্দিন আল হাসান, এবং ফখরউদ্দিন আহম্মদ। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর সদর উদ্দিন মারাঘার ডিরেক্টর পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর আসিলউদ্দিন তাঁর স্থানে নির্বাচিত হন। আসিলউদ্দিন অন্যান্য কাজের সঙ্গে "জিজ-ই-ইলখানি" নকল করেন। রাজনীতিতেও

তিনি বেশ অনুরক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। গাজান মাহমুদের সঙ্গে তিনি সিরিয়ায় গমন করেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে বাগদাদের গভর্ণর নিযুক্ত হন। রাজনীতির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলেও এতে তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নাই—কোন এক কারণে তিনি কিছুদিন পরে পদচ্যুত হন। ১৩১৪-১৫ খৃঃ অব্দে আসিলউদ্দিন পরলোক গমন করেন।

সদরউদ্দিন যখন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন আল হাসান ইবনে আহম্মদ আল হাকিম মানমন্দিরটি পরিদর্শন করেন। তাঁর মতে তখন আল উরদী, শামসউদ্দিন শিরাজী, কামালউদ্দিন আলইকি এবং সিরিয়ার হাসানউদ্দিন মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

আল উরদী

বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দরকারও বিশেষ কম নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায় এর দরকার আরও বেশী। যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মতা ও বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ণীত ফলের বিশুদ্ধতাও নির্ভর করে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, যন্ত্রপাতির বিশুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার দিকেই তাঁদের প্রথম নজর দিতে হয়। মারাঘার মানমন্দিরকে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি দিয়ে সম্পূর্ণ ও সুসজ্জিত করে তোলবার ভার পরে বৈজ্ঞানিক আলউরদীর উপর। আলউরদীর পূর্ণ নাম হোল মোয়ায়েদ উদ্দিন আলউরদী আলদামিস্কি।

সিরিয়াতেই তাঁর জন্ম হয় তবে জন্মের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যায় না। প্রথম জীবনেই তিনি বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে যন্ত্রপাতি নির্মানের দিকেও মনোনিবেশ করেন। তাঁর অসাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি অতি সহজেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিভার খ্যাতি রাজদরবারে পৌছতেও দেরী হয় না। হিমসের নৃপতি আলমনস্থর ইব্রাহিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য তাঁকে দামস্কাসে ডেকে পাঠান। বৈজ্ঞানিক এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পরাঙ্মুখ হন নাই। দামস্কাসে ইব্রাহিমের অনুরোধ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি নির্মাণের সঙ্গে অন্য বিষয়েও তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। দামস্কাসে একটি Hydraulic প্রস্তুত করা তাঁর অন্যতম ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। নৃপতি ইব্রাহিম বৈজ্ঞানিক নির্মিত যন্ত্রপাতিগুলি নিজের রাজধানীতে নিয়ে মানমন্দিরে কাজে লাগান। এসবেই তাঁর খ্যাতি সমস্ত আরব পারস্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে মারাঘার মানমন্দির তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারাঘায় তাঁর ডাক পড়ে।

খুব সম্ভব ১২৫৯ খৃঃ অব্দেই তিনি মারাঘায় গমন করেন এবং নাসিরউদ্দিনের সহকর্মী হিসাবে কাজ সুরু করেন। মানমন্দিরের সংস্কার এবং টেবল প্রণয়নে উরদীর যে অনেকখানি হাত ছিল নাসিরউদ্দিনের ভূমিকাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাসিরউদ্দিন তাঁকে বন্ধু বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর

কার্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানমন্দিরের সঙ্গেই ছিল যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা। এ কারখানাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে আলউরদীর তত্বাবধানে। যন্ত্রগুলি যে শুধু বিজ্ঞান সম্মত তাই নয়, এর সূক্ষ্ম কারুকার্যও অতীব বিস্ময়কর।

মানমন্দিরে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নির্মাণপ্রণালী ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি বর্ণনা করে আলউরদী একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এখানির নাম হোল "রিসালা ফি কায়ফিয়া আল আরসাদ ওয়া মা ইওহতাজা ইলা ইলমিহি ওয়া আমালিহি মিনতুরুক আলমুয়াদ্দিয়া ইলা মারিফা আওদাতোল কাওয়াকেব" (The art of astronomical observations and the theoretical and practical knowledge needed to make them and the method leading to the understanding of the regularities of the stars).

এতে এগারটি যন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজী নামানুসারে এগুলোর নাম হোল (১) Mural quadrant (২) Armillary sphere (৩) Solistitial armil (৪) Equinoctial armil (৫) Hipparatis diopter (alidade) (৬) Instrument with two quadrants (৭) Instrument with two limbs (৮) Instrument to determine sine and azimuth (৯) Instrument to determine sines and versed sines (১০) The perfect instrument (এটি হোল

সার্বজনীন যন্ত্র—সিরিয়াতে তিনি এর মডেল তৈরী করেন).
(১১) Parallactic ruler. গ্রন্থকার নির্মাণপ্রণালী ও ব্যবহারবিধির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগুলি সম্বন্ধেও বর্ণনা দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে অংশে বিস্তারিত Technical বর্ণনা ছিল সে অংশের সন্ধান পাওয়া যায় নাই তাই সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরও পাওয়া যায় না। মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা, দৈনন্দিন কার্যতালিকা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় না।

বৈজ্ঞানিকদের মনে এই সময়ে সূক্ষ্মবিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির জন্য কিরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল উরদীর বর্ণনা থেকেই তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। এর প্রত্যেকটী ভাগ যাতে সঠিক হয়, এগুলো যাতে স্থায়ী হতে পারে, তলগুলো যাতে বেশ সমান হয় সেজন্যে বৈজ্ঞানিকদের ও যন্ত্রনির্মাণকারীদের যত্নের ও পরিশ্রমের অবধি ছিল না। সবাই ছিলেন অতি মাত্রায় ব্যাগ্র যাতে এ সবের মধ্যে এতটুকু ক্রটীবিচ্যুতি না ঘটে। আলউরদীর গ্রন্থের প্রতি ছত্রে বৈজ্ঞানিকদের এই আগ্রহের কথা ফুটে উঠেছে। গ্রন্থখানির সমস্ত অংশ পাওয়া যায় নাই। যন্ত্রপাতির সমস্ত কার্যাবলীর প্রমাণ, প্রয়োগ ও সমস্ত পর্যবেক্ষণ গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে ভূমিকাতে বলা হয়েছে কিন্তু প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে এই সমস্ত প্রমাণ, প্রয়োগ ইত্যাদি যে অংশে বর্ণিত হয়েছে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যা হোক ৮ এবং ৯নং যন্ত্রগুলি sine এবং verse নির্ণয় করবার জন্য ব্যবহৃত

হত সে হিসাবে এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের চেয়ে ত্রিকোণমিতিরই বেশী উপযোগী।

এখানা ছাড়া বৈজ্ঞানিকের আরও তুইখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানার নাম হোল "রিসালা ফি আমালোল কোবা আলকামিলা" (Construction of the perfect Sphere)। অন্যখানা হোল সূর্যের কেন্দ্র এবং apogeeর মধ্যেকার দূরত্ব নির্ণয়:সম্বন্ধে। টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করেও তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবলও প্রস্তুত করেন।

আলউরদীর তুই পুত্রও নাসিরউদ্দিনের পুত্রদের মতই বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। মারাঘায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বৈজ্ঞানিক পুত্রদ্বয়কে নিজের নিকট নিয়ে আসেন। পুত্রদ্বয়ও মারাঘার মানমন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত হন। পুত্রদের নাম হোল শামসউদ্দিন এবং মোহাম্মদ ইবনে মোয়ায়েদ আলউরদী।

শামসউদ্দিনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নাসিরউদ্দিনের পুত্র সদরউদ্দিন যখন মানমন্দিরের ডিরেক্টর তখন শামসউদ্দিনও এই মানমন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তবে বিজ্ঞানে তাঁর কোন মৌলিক দান আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁর মাত্র একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই, এতে আলোচিত হয়েছে নাসিরউদ্দিনের শিক্ষকদের ইতিহাস।

মোহাম্মদ পিতার যন্ত্রকুশলী প্রতিভার অধিকারী হন। তিনি মানমন্দিরের জন্য একটি Celestial Globe তৈরী করেন। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত মাত্র চারটি Celestial Globeএর খবর পাওয়া যায়। প্রথমটি তৈরী করেন একাদশ শতাব্দীর ইব্রাহিম ইবনে সাইদ আসসাহলী তাঁর পুত্র মোহাম্মদ এর সাহায্যে ; দুইটি পিতলের ফাঁপা গোলাকার খণ্ড এক সঙ্গে জুড়ে। এর ব্যাসার্ধ হোল ২০৯ মিলিমিটার। এতে ১০১৫টি নক্ষত্র এবং ৪৭টি সংযোগের (Constellation) যথাস্থান এবং পরিমাপ খোদিত রয়েছে। বর্তমানে এটি ফ্লোরেন্স ইউনিভার্সিটিতে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয়টি তৈরী করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাইসার ইবনে আবুল কাসিম। ১২২৫-২৬ খৃঃ অব্দে এটি তৈরী হয়। অন্যান্য Globe এর থেকে এর পার্থক্য হোল যে এতে পিতলের গোলকখণ্ড দুইটি জোড়া হয়েছে চারিটি পায়ার উপর ; এতে দিগন্ত (Horizon) এবং Meridian circleও দেখান আছে। বর্তমানে নেপলসের National Museum এ এটি রক্ষিত আছে। তৃতীয়টিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্মিত হয়। এটির নির্মানকর্তা হোলেন মোহাম্মদ ইবনে হিলাল। ১২৭৫-৭৬ খৃঃ অব্দে এটি তৈরী হয়। এটিও পিতলের তবে এর উপরে পারসীয় কারুকার্য বিশেষ ভাবেই পরিদৃশ্যমান। এইটিই মধ্যযুগের গ্নোবের মধ্যে সব চেয়ে বড় ; এর ব্যাসার্ধ হোল ২১৪ মিলিমিটার। রাশিচক্র, সাতচল্লিশটি সংযোগ এবং দিগন্তের পরিধির উপর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমস্তই এর

উপরে খোদিত রয়েছে। বর্তমানে এটি লণ্ডনের Royal Asiatic Society-তে রক্ষিত আছে। চতুর্থটির নির্মান কর্তা বা নির্মান তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; প্যারিসের Bibliotheque Nationale-এ এটি রক্ষিত আছে। এর ব্যাসার্ধ হোল ১৯৯ মিলিমিটার; এর উপরে ৪৯টি সংযোগ খোদিত রয়েছে। এর উপরকার খোদাই কার্য সমূহ ঠিক মোহাম্মদ ইবনে মোয়ায়েদ আলউরদীর গ্লোবের উপরকার খোদাই কার্যের মতই।

মোহাম্মদ তাঁর গ্লোবটি তৈরী করেন ১২৬৯ কিম্বা ১২৭৯ খৃঃ অব্দে। সঠিক তারিখ এখনও জানা যায় নি। এটিতেও দুইটি পিতলের গোলকখণ্ড রয়েছে তবে এ দুইটির মধ্যে ক্রান্তিবিন্দু (Ecliptic)-ও দেওয়া রয়েছে। অন্যগুলির থেকে এর পার্থক্য অতি সহজেই চোখে ধরা পড়ে। এতে দিগন্ত (Horizon circle) ও মধ্যবিন্দুর (Zenith point) সঙ্গে দুইটি ঘূর্ণায়মান (moveable) মধ্যবৃত্ত একটি point এর দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে। বৃত্তগুলিতে পরিমাপ খোদিত থাকার ফলে যে কোন নক্ষত্রের বিষুবলম্ব (Declination) এবং বিষুবাংশ (Right ascension) অতি সহজেই মেপে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া এতে ৪৮টি সংযোগ, বিষুব রেখা এবং ক্রান্তিবিন্দু থাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিমাপের জন্য কোন অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয় না। এগুলির উপর সোনা বা রূপার কাজ করা। গ্লোবটির ব্যাসার্ধ হোল ১৪০ মিলিমিটার। ড্রেসডেন

ইউনিভার্সিটির Mathematical Salon-এ এটি রক্ষিত আছে।

মারাঘার মানমন্দিরের অন্যতম বৈজ্ঞানিক হোলেন মহীউদ্দিন আলমাগরিবী। এঁর জন্ম হয় স্পেনের আন্দালুসিয়ায়। সে হিসাবে এঁকে প্রাচ্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে গননা না করাই হয়ত সঙ্গত হত কিন্তু এঁর সমস্ত কার্যকলাপ ও বিজ্ঞান প্রতিভার স্ফুরন হয় মারাঘার মানমন্দিরে। সেইজন্যে এঁকে প্রাচ্যের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গেই স্থান দেওয়া গেল।

মহীউদ্দিনের পূর্ণ নাম হোল মুহী আলমিল্লা ওয়াদ্দিন ইয়াহিয়া ইবনে মোহাম্মদ আবিস শুকুর আলমাগরিবী আল আন্দালুসী। স্পেনে জন্ম হোলেও সিরিয়াতেই তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের সূত্রপাত দেখা যায়। মারাঘার মানমন্দির তৈরী হবার পর হালাকুর অতিথি হিসাবেই তিনি মারাঘায় আগমন করেন এবং গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাঁর জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ কিছুই জানা যায় না। তবে ১২৬৮-১২৮৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে আবুল ফারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অনেক বিবরণ পাওয়া যায় এ থেকেই মনে হয় নাসিরউদ্দিনের পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর, বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থাবলীকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে— (১) জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি (২) গ্রীকগ্রন্থাবলীর সংস্কার ও ভাষ্য

(৩) Chronology (৪) জ্যোতিষ (৫) আস্তারলব। জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি উভয়ই একত্র আলোচনা করে তিনি "শাকলোল কাত্তা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি তাঁর মৌলিক প্রতিভার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমান। গ্রন্থের নাম দেখে মনে হয় এখানির নামকরণ হয় নাসিরউদ্দিনের গ্রন্থের নামানুসারেই। এমনিতে অবশ্য নাসিরউদ্দিনের গ্রন্থের কতক অংশকে ভিত্তি করেই এখানি রচিত হয় তবে এর মধ্যে অন্ধঅনুকরণ বিন্দুমাত্রও নেই। গ্রন্থকার পূর্বেকার গ্রন্থের অনুসরণ করলেও মৌলিকতার দিক থেকে একটুও কম যান নাই। উদাহরণ স্বরূপ সমকোণী গোলীয় ত্রিভূজের (Right angled spherical triangle) সাইন theorem এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নাসিরউদ্দিনের প্রস্তাবিত ও উপস্থাপিত প্রমাণ উল্লেখ করার করার পর বৈজ্ঞানিক নিজেরও একটি মৌলিক প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। নাসিরউদ্দিনের প্রমাণ থেকে এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিক শুধু এই প্রমাণ উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নাই অন্য ত্রিভূজের বেলায়ও একে কেমন ভাবে খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে সেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক অনেকগুলি গ্রীকগ্রন্থের সংস্কার করেন ও ভাষ্য লেখেন। ইউক্লিডের গ্রন্থ ছাড়া আর সবগুলিই "তাহজিব" নামে অভিহিত। এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলি হোল ইউক্লিডের Elements এপোলোনিয়সের কনিক্স্, থিওডোসিয়োসের Spherics এবং মেনিলসের Spherics। এ ছাড়া "খোলাসাতুল মাজিস্তি"

(Essence of Almagest) নামে আলমাজেষ্টের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি রচিত হয় মারাঘাতে বৈজ্ঞানিক আবুল ফারাজের অনুরোধে। গ্রন্থকার এতে শুধু আলমাজেষ্টের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেই নিরস্ত হন নাই মারাঘার মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ ফলও এতে সন্নিবেশ করেন। গ্রন্থখানি তিনি পরে নাসিরউদ্দিনের পুত্র আবুল হাসান আলি বিন মোহাম্মদ ইবনোল হাসান আলতুসীর লাইব্রেরীতে উপহার দেন। এ থেকে মনে হয় গ্রন্থখানি নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১২৭৪ খৃঃ অব্দের পর প্রণীত হয়। "খুলাসাত" অনুসারে মারাঘাতে ১২৬৪ খৃঃ অব্দে ক্রান্তিবৃত্তের আনতি হোল (Obliquity of the Ecliptic) ২৩°৩০′; বর্তমান গণনা অনুসারে ১২৫০ খৃঃ অব্দে এর পরিমান ছিল ২৩°৩২′১৯″।

Chronology সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থখানির নাম হোল "রিসালাতোল খিতাওয়াল উইঘার" (Memior on the Chinese and the Uighur)। চীন এবং উইঘারের লোকদের ইতিবৃত্ত ও পঞ্জিকা সম্বন্ধে এতে আলোচনা হয়েছে। মারাঘা যে তখন পৃথিবীর সর্বজাতির সমন্বয় স্থল হয়ে উঠেছিল এই গ্রন্থখানিই তার প্রমাণ। এ থেকেই মনে হয় চীনা জ্যোতির্বিদগণও তখন এখানে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে তখন জ্যোতিষের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রায় প্রত্যেক জ্যোতির্বিদই জ্যোতিষ নিয়েও আলোচনা করতেন। মহীউদ্দিনও এদিক দিয়ে কম যান নাই। জ্যোতিষ

সম্বন্ধে তাঁর ছয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সংখ্যায় ছয় হোলেও আসল গ্রন্থ চারখানি। গ্রন্থগুলির নাম হোল (১) "কিতাবুল মাদখাল আলমুফিদ ফি হুকমোল খাওয়ালিদ" (Useful introduction to the judgment of births) (২) "কিতাবুন নজুম" (Book of Stars) (৩) "কিতাবুল আহকাম আলাকিরানাতোল কাওয়া ফিল বুরুজ আলইসনা আশার" (Judgments relative to the conjunctions of the planets in the twelve signs of the Zodiac) (৪) "কাইফিয়াতোল হুকম্ আলাতাহবিল সিনিল আলম" (Mode of Judgment relative to the return of the years of the world) (৫) "কিতাবোজ জামিওয়াস সাগির" (Small compendium) (৬) "উমাদাতোল হাসিব ওয়া-গুনিয়াতোত তালিব" (Prop of the calculator and wealth of the searcher)। এ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবল এবং জ্যোতিষী কার্যের জন্য অন্যান্য নানা তথ্যও তিনি সংগ্রহ করেন।

শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আস্তারলব সম্বন্ধে গ্রন্থেও তাঁর বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁর দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানার নাম হোল "তাসতি হোল আস্তরলব" (The Flattening of the Astrolabe)। খুব সম্ভব এর কিছু অংশে জ্যোতিষ সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়খানার নাম হোল "তাজোল আজ-জাজ ওয়া গুনিয়াতোল

মুহতাজ" (Crown of the tables and wealth of the one in need)। এ গ্রন্থখানির প্রকৃত প্রণেতা কে সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম রয়েছে আবু আবতুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবুস্ শুকুর আলমাগরিবী। এ আমাদের বৈজ্ঞানিকের নাম, না বৈজ্ঞানিকের পিতার নাম সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। মহীউদ্দিনই যদি এর প্রকৃত প্রণেতা হন তা হোলে গ্রন্থে "ইয়াহিয়া ইবনে" কথাটা বাদ পড়ে গেছে বলতে হবে। তবে যদি গ্রন্থের নামের মধ্যে কোন ভুল না থেকে থাকে তা হোলে এ তাঁর পিতার নাম ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। সে হিসাবে বৈজ্ঞানিকের পিতাও বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলে মেনে নিতে হবে। গ্রন্থখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিবৃত্তের নানা বিষয়ের সংগ্রহ।

আশরাফ আসসমরকন্দী এই শতাব্দীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তাঁর পূর্ণ নাম হোল শামসউদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে আশরাফোল হোসায়েনী সমরকন্দী। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

আরবী পারসী উভয় ভাষাই এই সময়ে বিজ্ঞানের চর্চা হত; আরবী অবশ্য সিংহভাগ অধিকার করত। আসসমরকন্দীও এই সময়কার ভাবধারার পূর্ণ অনুসরণ করেন। প্রথমে তিনি আরবীতে গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু শেষে পারসীকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁর সবচেয়ে সমাদৃত গ্রন্থ হোল "রিসালা ফি

আদাবোল বাহাছ"। গ্রন্থখানিতে Dialectics সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থখানি যে তৎকালে বিশেষ সমাদর লাভ করে ভাষ্যের পর ভাষ্যই তার প্রমাণ। এ ছাড়া ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একখানির নাম হোল "কিতাবোল কাস্‌তাস্‌" (Balance, Justice) অন্যখানির নাম হোল "কিতাবো আইনোন নজর ফিল মনতেক্‌" (The source of speculation, dealing with Logic).

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জ্যামিতি গ্রন্থখানির নাম হোল "কিতাবো আশকালোত তাসিস্‌" (Figures or difficulties of the Foundation)। এখানি "রিসালার রিয়াদয়া" নামেও পরিচিত। গ্রন্থখানিতে ইউক্লিডের Elements এর প্রথম পুস্তকের পঁয়ত্রিশটি উপপাদ্যের সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রন্থখানি বেশ সমাদর লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসা বিন মাহমুদ কাজীজাদা রুমী এর একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে তিনি ১২৭৬-৭৭ খৃঃ অব্দে বর্ষের নক্ষত্র পঞ্জিকা তৈরী করেন। এর নাম হোল "আমালি তাকবিমই কাওয়াকিবি ছাবিতা" (arrangements of the tables of the stars)। এ গ্রন্থখানি পারসীতে লিখিত।

শামসউদ্দিন সমরকন্দী

বৈজ্ঞানিকের নামে অন্য একখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থও দেখতে পাওয়া যায়। এখানি ১৩২৩ খৃঃ অব্দে পারসী থেকে

গ্রীক ভাষায় অনুদিত হয়। এই অনুবাদ অনুসারে গ্রন্থকারের নাম হোল শামসউদ্দিন। তবে এ শামসউদ্দিন প্রকৃত পক্ষে কোন শামসউদ্দিন সে বলা কঠিন। চতুর্দশ শতাব্দীর অন্য এক বৈজ্ঞানিকের নামও শামসউদ্দিন। গ্রন্থখানি তাঁরই লিখিত কি শামসউদ্দিন সমরকন্দীর লিখিত সে সঠিকভাবে বলা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর শামসউদ্দিনের পূর্ণ নাম হোল শামসউদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে মুবারকশাহ আলবোখারী। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

Dogmatics সম্বন্ধেও শামসউদ্দিন সমরকন্দীর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর নাম হোল "কিতাবুস সাহায়েফ" (Book of Leaves)

পূর্বে দর্শন ও বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয় হিসাবে আলোচিত হত না। বিজ্ঞানও দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করতেন তাঁরাও প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ দর্শন নিয়েও আলোচনা করতেন আবার যাঁদের কাজ ছিল প্রধানত বিশুদ্ধ দর্শন নিয়ে তাঁরাও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এমনি যাঁরা প্রধানত দর্শন নিয়ে আলোচনা করলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষত অঙ্কশাস্ত্র নিয়েও আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আলআবহারি, আলকাতিবি এবং আলকাজবিনির নাম করা যেতে পারে।

আল আবহারির পূর্ণ নাম হোল আল মুফাজ্জল ইবনে ওমর আলআবহারি আছির উদ্দিন। জিবাল প্রদেশের অন্তর্গত

আবহার নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। জন্ম তারিখ সঠিক ভাবে জানা যায় না। কামাল উদ্দিন ইবনে ইউনুসের নিকট তিনি প্রথম জীবনে দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। ১২২৮ খৃঃ

আল আবহারি

অব্দে তিনি মসুল থেকে ইবরিলে গমন করেন এবং সেখানেই ১২৬০ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের সব সমেত আটখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির নাম হোল (১) "হিদায়েতোল হিকমা" (Guide to wisdom)। গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত —প্রথমভাগে মনতেক (Logic), দ্বিতীয় ভাগে তাবিইয়াত (Physics) এবং তৃতীয় ভাগে ইলাহিয়াত (Theology) সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থখানি খুবই সমাদর লাভ করে এবং এর অনেক ভাষ্য লিখিত হয়। (২) "কিতাবুল ইসাঘোজি"—পরফিরির (Porphyry) ইসাঘোজির Summary (৩) "জিজ আস শামিল" —জ্যোতির্বিজ্ঞান টেবল (৪) "মুখাতাসার ফি ইলমোল হাইয়া" —বাইশ পরিচ্ছেদে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ (৫) "রিসালা ফিল আস্তারলব"—আস্তারলব সম্বন্ধে গ্রন্থ (৬) "কাশফোল হাকায়েক ফি তাহরিরোদ দাকায়েক" (৭) জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও তিনখানি গ্রন্থ—এ গ্রন্থগুলি সুসংবদ্ধ নয়। এর একখানা "মুখতাসার ফিল ইলমোল হাইয়া" বা "জিজ আস শামিল" এর অন্যতম সংস্করণও হতে পারে। যাহোক এর একখানিতে গোলক সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। (৮) "জুবদাতোল আসরার" (Cream of secrets)—এতে বিশুদ্ধ দর্শন নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মীর হোসায়েন ইবনে মঈনউদ্দিন আলমায়কুদী প্রণীত "হিদায়েতোল হোকমার" একখানি ভাষ্য কলিকাতাতে ছাপা হয় এবং লাখনৌতে লিথোগ্রাফ হয়।

আলকাতিবিও মারাঘার বৈজ্ঞানিক ইনষ্টিটিউটের অন্যতম সদস্য। তাঁর পূর্ণ নাম হোল নাজম উদ্দিন আলি ইবনে ওমর আলকাজবিনি আলকাতিবি। তাঁর কাজও প্রধানত দর্শনকে কেন্দ্র করে তবে এই সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানও তাঁর বৈজ্ঞানিক মনকে আকৃষ্ট করে। শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান হিসাবে আলমাজেষ্টের একটি সংস্করণ প্রকাশ করাই তাঁর একমাত্র কাজ বলা যেতে পারে; অন্য সমস্তই দর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সর্ব প্রধান গ্রন্থ হোল "কিতাব আইনোল কাওয়ায়েদ ফিল মনতেক ওয়াল হিকমা" (Source of the principles of Logic and Philosophy)। এর এক ভাগে অঙ্ক এবং প্রাকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তাঁর অন্য একখানি গ্রন্থের নাম হোল "কিতাব হিকমাতোল আইন"। এখানিকে প্রথমখানির দ্বিতীয় খণ্ডের অন্য সংস্করণও বলা চলে। এ গ্রন্থখানিতে দার্শনিকের মতই পৃথিবী ঘোরে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। "পৃথিবী ঘোরে" এ মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি তর্ক থাকতে পারে তিনি দার্শনিকের মত সবগুলিই বিশেষভাবে আলোচনা করে বাদ দিয়েছেন, কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত অন্ধ অনুকরণের পথকে এড়াতে পারেন নাই—টলেমিকেই অনুসরণ করেছেন। একটি

আলকাতিবি

যুক্তির বিষয় হোল পাখীর গতি সম্বন্ধে। একটি প্রশ্ন উঠে যে পৃথিবী যদি ঘোরে তা হোলে যে পাখী পৃথিবীর গতির দিকেই উড়তে থাকবে, তার পৃথিবী থেকে পিছিয়ে পড়া উচিত। দার্শনিক কিন্তু একে যুক্তিসম্মত বলে মেনে নিতে পারেন নাই। তাঁর মতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এর উপরকার বাতাসও সমান গতিতে ঘুরতে থাকবে পাখীকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যাবে—তাই এর পিছিয়ে পড়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। এ দিক দিয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দিলেও অন্য দিকে কিন্তু বিজ্ঞানবুদ্ধিকে উদার করে নিতে অপারগ হয়েছেন বলা চলে। তাঁর মতে সমস্ত পার্থিব (terrestrial) গতিই যখন সরল রেখায় সংঘটিত হয় তখন পৃথিবী যে বৃত্তাকার পথে ঘুরবে এ মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক "আর রিসালাতোস শামসিয়া ফিলকাওয়ায়েদোল মনতাকিয়া" এবং "জামিয়োদ দাকায়েক ফি কাশফোল হাকায়েক" নামে অন্য দুইখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে Logic, Physics, এবং Metaphysics সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া ইবনে মাহমুদ আলকাজবিনি সাধারণত আলকাজবিনি নামে পরিচিত। তাঁর এ আলকাজবিনি নাম হয় জন্মস্থানের নামানুসার। তিনি পারস্যের কাজবিনে ১২০০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জীবন কাটে দামাস্কাসে। পরে তিনি ইরাকের ওয়াসিত এবং হিল্লির কাজী নিযুক্ত হন।

কাজবিনি ছিলেন দার্শনিক আল আবহারির ছাত্র, তাঁর সংস্পর্শে এসেই হয়ত তিনি দর্শনে অনুরক্ত হয়ে উঠেন। এ ছাড়া দামাস্কাসে থাকতে তিনি ইবনে আরাবীর সঙ্গেও পরিচিত হন। এখানে তৎকালে দার্শনিক সুধীবৃন্দের সংস্পর্শে আসার দরুণও দর্শনের দিকেই তিনি বেশী ঝুঁকে পড়েন। তবে শুধু দর্শনই তাঁর মন জুড়ে বসে রয় নাই জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই তাঁর অবাধ প্রতিপত্তি ছিল। সে হিসাবে তাঁকে সর্ববিদ্যাবিশারদ বলা চলে। এই অসাধারণ জ্ঞানের জন্যই তিনি সাধারণত Mediaeval Pliny নামে পরিচিত। প্রধানত তাঁর দুইখানি গ্রন্থ সবচেয়ে বিখ্যাত। একখানি হোল Cosmography সম্বন্ধে। এখানির

আলকাজবিনি

নাম হোল "আজায়েবোল মখলুকাত ওয়া গারায়েবোল মাওজুদাত" (Marvels of created things and their singularities)। এর প্রথম খণ্ডে celestial বিষয়—গ্রহ, নক্ষত্র, ফেরেস্তা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে পার্থিব বিষয়, খণিজদ্রব্য, লতাপাতা, জীবজন্তু, মানুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থখানি অনেকদিন পর্যন্ত বেশ সমাদর লাভ করে এবং পারসী, তুর্কী, চাগতাই প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হোল প্রধানত ভূগোল সম্বন্ধে। এর দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। একটি হয় ১২৬২-৬৩ খৃঃ অব্দে। এর নাম দেওয়া হয় "আজায়েবোল বুলদান" (Marvels of the countries) দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১২৭৫-৭৬ খৃঃ অব্দে। এটির

নাম দেওয়া হয় "আছারোল বিলাদ ওয়া আখবারোল ইবাদ" (Vestiges of the countries and stories of the servants—servants of God i. e. the people)

১২৮৩ খৃঃ অব্দে এই মনীষী পরলোক গমন করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ব শতাব্দীর চেয়ে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করে বলা যেতে পারে। সুলতান সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে তেমন প্রতিভাবান আর কারুর খোঁজ পাওয়া যায় না, তাঁদের মামলুক দাসগনই মিসরের সিংহাসন আত্মসাৎ করেন (১২৫০ খৃঃ অব্দ)। এখন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মামলুকগনই প্রকৃতপক্ষে মিসরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। মামলুকগণ আদতে ছিলেন যুদ্ধজীবী, জ্ঞানবিজ্ঞানের তাঁরা বিশেষ ধার ধারতেন বলে মনে হয় না। এমনি তাঁদের শাসন মোটের উপর সুফলপ্রদ হোলেও তাঁদের সময় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা আর বেশী উৎসাহ পায় নাই। যাহোক এমনি নিরুৎসাহের মধ্যেও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা একেবারে নীরব হয়ে যায় নাই। এই শতাব্দীর মিসরকে যাঁরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে জাগ্রত করে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে ইবনোল ইয়াসিমিনি এবং তাআসিফই সর্বপ্রধান।

ইবনোল ইয়াসিমিনির পূর্ণ নাম হোল আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাজ্জাজ। তিনি ছিলেন মরক্কোর অধিবাসী। এইখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও

স্ফুরিত হয়। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় বিজ্ঞানের বিষয় কাব্যে লেখা হয় নাই। কাব্যের অতিশয়োক্তি, ছন্দবিন্যাস প্রভৃতি বিজ্ঞানে ঢুকলে স্বাভাবিকভাবে কাব্য ও বিজ্ঞান দুইই খাট হতে বাধ্য; হয়ত এমনি অসুবিধার জন্যেই ভারতবর্ষের কাব্য-প্রীতি অন্য কোন বৈজ্ঞানিককে বিশেষ অনুপ্রাণিত করতে পারে নাই, কিন্তু ইবনোল ইয়াসিমিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবার বিজ্ঞানে কাব্য জাগিয়ে তোলেন। সে হিসাবে তাঁকে সাধারণ বৈজ্ঞানিকের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। বীজগণিত বিষয়ে সুন্দর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নের জন্যই তিনি বিজ্ঞান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি শুদ্ধ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশেষ মৌলিকতা দাবী করতে না পারলেও সাধারণের মনে বীজগণিত সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মাতে এ খুবই কার্যকরী হয়েছিল। অঙ্কশাস্ত্রের মত নীরস বিষয়ে জন সাধারণের আগ্রহ কোন দিনই বেশী নয়। তাই এই নীরস জিনিসে আগ্রহ জন্মাবার ক্ষমতা, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে না হোক অন্য দিক দিয়ে বিশেষ ক্ষমতারই পরিচায়ক। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ইয়াসিমিনির "আরজুজা" প্রণয়নে যে প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় সে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমান আসন দিতে সক্ষম বলা চলে। এ গ্রন্থখানির কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি এখনও বর্তমান রয়েছে। ইয়াসিমিনির অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিকতার অন্য বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই

ইবনোল ইয়াসিমিনি

(১২০৩-১২০৫) এই কবি বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

তাআসিফের পূর্ণ নাম হোল কাইসার ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আবছুল গণি ইবনে মুসাফির আলিমউদ্দিন আলহানাফী। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১১৭৮-৭৯ খৃঃ অব্দে (কারুর কারুর মতে ১১৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে) মিসরের উত্তর ভাগে আসফূনে তাআসিফের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি মিসর এবং সিরিয়ায় অধ্যয়ন করেন। পরে মস্‌লে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কামাল উদ্দিন ইবনে ইউনুসের নিকট গান এবং অন্যান্য নানা বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। এর পরেই তাঁর চাকুরী জীবন স্বুরু হয়। তিনি হামাহর নৃপতি আলমূজাফফর তাকিউদ্দিন মাহমুদের (১২২৯-১২৪৪) অধীনে কার্যে নিযুক্ত হন। এইখানেই তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয় বলা চলে।

কাইসার ইবনে আবুল কাসিম

তাআসিফ ছিলেন একাধারে আইন শাস্ত্রজ্ঞ এবং ইঞ্জিনিয়ার। এই ছুই নীরস বিষয়ের অনুশীলনের মধ্যে অন্যতম নীরস বিষয় অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় হিসাবে জলকল (water mills) এবং গ্লোবের উল্লেখ করা যেতে পারে। হামাহর গৌরব ওরোন্তেসের (Orontes) জলকল তাআসিফেরই কীর্তি। নৃপতি মুজাফফরের জন্যই তিনি এটি তৈরি করেন। অনেকেই মনে করেন ক্রুসেডের খৃষ্টানগণ হামাহর এই জলকল

ভেঙ্গে ইউরোপে নিয়ে আসে এবং তখন থেকেই ইউরোপে জলকলের প্রচলন হয়। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। তবে ক্রুসেডারগণ যে প্রাচ্যের এই জলকল থেকেই উন্নততর জলকলের ধারণা নিয়ে আসে যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অন্তত সে বিষয়ে সবাই একমত। এর পরেই ইউরোপে উন্নত ধরণের জলকলের প্রচলন হয়। প্রাচ্যের water wheels এর নিদর্শন এখনও ফ্রাঙ্কোনিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। ১২২৫-২৬ খৃঃ অব্দে তিনি একটি Celestial globe তৈরী করেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এটি ভোলত্রিতে কার্ডিনাল বর্জিয়ার (Cardinal Borgia) দরবারে রক্ষিত ছিল। এখন এটি নেপলসের ন্যাশনাল মিউজিয়মে (Museo Nozionale) রক্ষিত আছে। চারিটি পায়ের উপর দুইটি পিতলের গোলক অংশ, দিগন্ত (Horizon) এবং মাধ্যন্দিন বৃত্ত (Meridian circle) ইত্যাদি সংযোগ করে এটি তৈরী হয়। একটি ফলকে বৈজ্ঞানিকের নাম এবং নির্মান তারিখ দেওয়া রয়েছে। তারিখটি হোল হিজরি ৬২২ অব্দ।

শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় জ্যামিতিতে। জ্যামিতির প্রথম সূত্রপাত ইউক্লিডের সংজ্ঞার উপর নিজের অভিমত ব্যক্ত করে তিনি যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন তাতে তাঁর জ্যামিতিতে অবাধ প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থখানিকে নাসিরউদ্দিনকে উৎসর্গ করেন। ১২৫১ খৃঃ অব্দে দামাস্কাসে এই বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

মিসরে বিজ্ঞানের চর্চা কম হয়ে গেলেও, উত্তর আফ্রিকার অন্য অংশে এই সময়ে বেশ তৎপরতা দেখা যায়। এর কারণ অবশ্য স্পেনের সান্নিধ্য। স্পেনের মুসলিম রাজ্য স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যগুলিকে প্রভাবান্বিত করে; তার জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাও উত্তর আফ্রিকায় সংক্রমিত হয়। উত্তর আফ্রিকাকে এই সময়কার বিজ্ঞান ইতিহাসে যিনি উজ্জল করে রেখেছেন তাঁর নাম হোল আলহাসান আল মাররাকুশী। হাসান মরক্কোর অধিবাসী। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু আলি আলহাস্নান ইবনে আলি ইবনে ওমর আল মাররাকুশী। এমনিতে তিনি আবুল হাসান আলি নামেও অভিহিত হতেন।

হাসান ছিলেন অঙ্কশাস্ত্র ও ভূগোলে অসাধারণ রূপে পারদর্শী। এই উভয় শাস্ত্রেই তাঁর অগাধ প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতিতে তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি

আবুল হাসান

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। তবে এর মধ্যে শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান হিসাবে চারখানি গ্রন্থই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই চারখানা গ্রন্থের নাম হোল (১) "জামিয়ল মাবাদিওয়াল গায়াত" (The uniter of the beginnings and ends i,e, principles and results), (২) "তালখিছোল আমাল ফি রুইয়াতোল হিলাল" (On the occupations at the apparition of the new moon) (৩) "আলাতোত তাকবিম" (On the calender),

অন্যখানি হোল গ্রহের সংযোগ এবং গ্রহণের প্রভাব সম্বন্ধে (On the influence of the planetry conjunctions and eclipses)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রন্থখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না ; খুব সম্ভব এ দুইখানি বিনষ্ট হয়ে গেছে। চতুর্থখানি হাসানেরই প্রণীত কিনা সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। দ্বিতীয় খানিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের নানা তথ্যেরও আলোচনা হয়েছে, চতুর্থখানিতে প্রধানত জ্যোতিষ নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

আলহাসান আলমাররাকুশী

যা হোক প্রথম গ্রন্থখানি তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলা যেতে পারে। গ্রন্থখানি ১২২৯-৩০ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়। এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, পর্যবেক্ষণ প্রণালী, কার্যকরীজ্ঞান (practical knowledge) সম্বন্ধে যেমন আলোচনা হয়েছে তেমনি ত্রিকোণমিতি এবং নমনিকস (Gnomonics) সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। ত্রিকোণমিতি এ সময় কত উন্নত হয়েছিল হাসানের এই গ্রন্থখানিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বৈজ্ঞানিক তাঁর পূর্ববর্তী আলখারেজমি, আলফারগণি, আলবাত্তানী, আবুলওয়াফা, আলবেরুনী, ইবনে সিনা, আলজারকালি, জাবির ইবনে আফলাহরগ্রন্থ ও কার্যাবলীর সঙ্গে বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। হয়ত এই জন্যেই তিনি অনেক সময় তাঁদের অনুসরণও করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ক্রান্তিবৃত্তের আনতির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে তিনি আলজারকালির মতকেই সমর্থন করে গেছেন—

তাঁর মতেও এই আনতি ২৩°৩৩′ এবং ২৩°৫৩′ মধ্যে নিবদ্ধ।

ত্রিকোণমিতিতে তিনি যে নূতন পথ প্রদর্শন করেন সে আরও বিস্ময়কর। তিনি শুধু কোণের পরিমানের সঙ্গে সাইন এবং ভার্সের সম্বন্ধ দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নাই, ত্রিকোণমিতিতে তিনি আরও অনেকগুলি নূতন পন্থা প্রবর্তন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম জাইবোততামাম (Complementary sine) এবং জাইবোফদলের (Exceednig sine) সম্বন্ধ প্রমাণ করেন। জাইবোত তামাম বর্তমান চিহ্নাদি অনুসারে লেখা হয় Sin $(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$ এবং জাইবোফদল হোল $\sin(\alpha - 90^\circ) = -\cos\alpha$. এ থেকেই তাঁর ত্রিকোণমিতির জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। তিনি প্রত্যেক অর্ধডিগ্রীর সাইন দিয়ে একটি সাইন টেবলও প্রস্তুত করেন। অবশ্য সাইন টেবল এর পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছিল। আলবেরুনীর টেবলে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর গণনাই স্থান পেয়েছে। তবে হাসান শুধু সাইন টেবল প্রস্তুত করেই ক্ষান্ত হন নাই তিনি ভার্স এবং arc sine টেবলও প্রস্তুত করেন। তিনি arc sine টেবলটিকে আলখারেজমির টেবল বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে আলখারেজমিই সর্বপ্রথম এমনি একটি টেবল প্রণয়ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে, নমন ব্যবহার যাতে সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য হতে পারে, সেইজন্যে তিনি একটি arc ট্যানজেণ্টের তালিকাও এর সঙ্গে যোগ করে দেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সমস্যাগুলি চিত্রের (Graph) সাহায্যে, কিভাবে সহজে সম্পন্ন করা যায় বৈজ্ঞানিক জামির দ্বিতীয় ভাগে সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এর পূর্বেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল বলে মনে হয় কিন্তু কেউই এমন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন নাই। যা হোক এই সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নতির জন্যে Plain sphere, আস্তারলব, কোয়াড্রেন্ট এবং নমনের ব্যবহার পূর্বেকার চেয়ে আরও বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে কিন্তু এগুলি অন্য থিওরেটিক্যাল শাখার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উন্নত হতে পারে নাই; ফলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করা কষ্টকর হয়ে উঠে। হাসানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁরই প্রতিভায় এগুলো বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠে নবজীবন পায় বলা চলে। ত্রিকোণমিতি, নমনিকস্ এবং তৎসঙ্গে পাশ্চাত্যের মুসলিমদের অত্যাবশ্যকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যাও তিনি করেন। হাসানের হাতে নমনিকস্ কত উন্নত হয়েছিল এর ডায়ালের কথা থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। Horizontal, স্তম্ভকীয় (cylindrical), শঙ্করীয় (conical), এক কথায় জ্যামিতিক সমস্ত প্রকার তলের উপরেই এই ডায়াল তৈরী হয় এবং এটি যাতে প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক অক্ষরেখায় ব্যবহারোপযোগী হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়। এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানে Temporary Hours ব্যবহার করে আসছিলেন

হাসানই একে বদলিয়ে Equinoctial Hours ব্যবহারের প্রচলন করেন। তাঁর গ্রন্থে Equinoctial Hours অনুসারেই সমস্ত গণনা দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বের মতবাদ ত্যাগ করে নূতন মতকে সমর্থন করতে দ্বিধা বোধ করেন ; তাই তখন এ আর সাধারণে প্রচলিত হতে পারে নাই। ফলে Temporary Hours আরও কিছুকাল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

জামিতে ১২২৫-২৬ খৃঃ অব্দের ২৪০টি নক্ষত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১৩৫টি স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার পরিমাপও দেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক নিজেই ৩৪টি স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার পরিমাণ নির্ণয় করেন। তিনি Precession of Equinoxes এরও গণনা করেন। তাঁর মতে এ হোল বৎসরে ৫৪″।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে J. J. Sedillot ফরাসী ভাষায় "Traite des instruments astronomiques des Arabes compose par Aboul Hassan Ali de Marco" নামে ৭৭০ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে জামির অনুবাদ করেন। তিনি নিজে এ অনুবাদ প্রকাশ করে যেতে পারেন নাই ; তাঁর পুত্র L. A. Sedillot এর প্রকাশ করেন। কারা দ্য ভো এর অপ্রকাশিত কতক অংশের অনুবাদ করেন।

উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়ায় এই সময়ে অন্য একজন বৈজ্ঞানিকের বেশ প্রভাব দেখা যায়। তাঁর নাম হোল

আলবুনী। অবশ্য শুদ্ধ বিজ্ঞানের দিক থেকে আলবুনীকে বৈজ্ঞানিক বলা চলে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁর প্রধান কাজ হোল যুগযুগান্তের সঞ্চিত মানুষের আধিভৌতিক শক্তির উপর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে।

আলবুনীর পূর্ণ নাম হোল আবুল আব্বাস আহম্মদ ইবনে আলি ইবনে ইউসুফ আলকোরেশী মহীউদ্দিন। আলজিরিয়ার বোনা নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বিজ্ঞানকে অনেকটা জ্যোতিষের সংস্কারও বলা চলে। তিনি বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহর নাম, আরবী অক্ষর, তাবিজ প্রভৃতির বরকত ও প্রভাব ইত্যাদি মুসলিম জগতের আধিভৌতিক বিশ্বাস নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুসলিম জগতে Occult Scienceএর প্রকৃত স্থান নির্ণয় করতে, তাঁর গ্রন্থগুলিকে সর্বাপেক্ষা মৌলিক উপাদান বলা চলে। তাঁর বহুগ্রন্থের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিই প্রধান— "শামসোল মাআরিফ ওয়া লাতায়েফোল আওয়ারিফ" (The Sun of knowledge), "কিতাবোল খাওয়াস" (The book of magic properties), "সিরোল হিকম" (The secret of sciences). ম্যাজিক স্কোয়ারকে অঙ্কশাস্ত্র হিসাবে গণনা করলে তাঁর গ্রন্থকেও অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ম্যাজিক স্কোয়ার সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। ১২২৫ খৃঃ অব্দে বা তৎপরে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলবুনী

স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস কোন দিনই সুখের নয়।

মুসলিম জাতি স্পেন অধিকার করবার পর থেকেই, খৃষ্টানদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ লেগেই ছিল। এর পরিসমাপ্তি হয় মুরদের চিরনির্বাসনে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এ কুরুক্ষেত্রের বিরাম হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতিদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ বিস্তারই লাভ করছিল কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ একটুও হ্রাস পায় নাই। এই সময়কার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল মুসলিম ছাড়া অন্যান্য অধিবাসীদেরও এই বিজ্ঞান চর্চায় যোগদান। অন্য অধিবাসীদের মধ্যে ইহুদীরাই সিংহভাগ অধিকার করে রয়েছে, খৃষ্টানদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা তখন পর্যন্ত ধর্মের গণ্ডী পার হয়ে মুক্ত হতে পারে নাই। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ইহুদীদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহ ও আগ্রহ আরম্ভ হয়। উত্তরোত্তর এ উৎসাহ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। বস্তুত ইউরোপের নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে ইহুদীদের স্থান মুসলিমদের পরেই। তবে পার্থক্য এই যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ঈর্ষাভাব সব সময়ে খৃষ্টানদের মনে উগ্র হয়েছিল, ইহুদীদের বিরুদ্ধে তেমন ঈর্ষাভাব পরিলক্ষিত হয় না। সর্বত্রই প্রারম্ভে অনুবাদ কার্য শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে; এখানেও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম হয় নাই। আরবী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থগুলি শনৈ শনৈ অনুবাদ হতে থাকে। কালের চক্র পরিবর্তিত হয়েছিল। ইউরোপীয় ভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে আরবীতে অনুদিত হয় আরবদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রেরণা যোগানর জন্য, আবার সেই আরবী থেকে অনুবাদ

আরম্ভ হয় ইউরোপীয় ভাষায়—ইউরোপীয়দের বিজ্ঞান চর্চায়, অনুপ্রেরিত করবার জন্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দী ইউরোপের ভাগ্যাকাশে নবোদিত সূর্য। এতদিনকার অজ্ঞান বিভীষিকাগ্রস্ত ইউরোপ, স্পেনের মুরদের ছোঁয়াচ পেয়ে আস্তে আস্তে সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠেছিল। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তার রাক্ষুসে ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যে খোরাক যোগাচ্ছিল আরব বৈজ্ঞানিকদের আহরিত জ্ঞান এবং সংরক্ষিত ও অনুদিত গ্রন্থাবলী। এ জাগার মধ্যে যাদের হাত ছিল বেশী তারা ধর্মের আশ্রয় পায় নাই। ধর্মধ্বজীগণ তখন ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্মদাতা মুরদিগকে তাড়িয়ে, তাদের সমূলে বিনষ্ট করে, জ্ঞানের আলোককে চিরতরে নষ্ট করে সেখানে অজ্ঞানের রাজ্য স্থাপন করার প্রয়াসে। ইউরোপের সৌভাগ্য—তাদের চেষ্টা একদিকে সফল হোলেও অন্য দিকে নিষ্ফল হয়েছিল। জ্ঞান রাজ্য আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে ধর্মধ্বজীদের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্পেনের যে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রবিদ মৌলিক দানের জন্য বিজ্ঞান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন তন্মধ্যে আলহাসসার, আলবিতরুজী এবং ইবনে বিদর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

নীরস বিজ্ঞানের ততোধিক নীরস অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি যে সহজে সাধারণে আকৃষ্ট হয় না এ এক রকম স্বতসিদ্ধ হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অঙ্কের গ্রন্থ সাধারণত এক ভাষা থেকে

অন্য ভাষাতে অনূদিত হতে (আরবী থেকে পারসী এবং পারসী থেকে আরবীতে অনুবাদের কথা ছেড়ে দিলে) শতাব্দীকাল লেগে গেছে এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। আলহাসসারের বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয়। তাঁর অঙ্ক গ্রন্থ সেই শতাব্দীতেই আরবী থেকে লাটিনে অনূদিত হয়। গ্রন্থখানি কিরূপ সমাদর লাভ করে এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেই তাঁর আলহাসসার নামকরণ হয়। এমনিতে তাঁর নাম হোল আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ—কারুর কারুর মতে আবু জাকারিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। আলহাসসার অর্থ গণনাকারী বা অঙ্কশাস্ত্রবিদ। অঙ্ক ও বীজগণিত এই দুই শাখাতেই আলহাসসারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রণীত বীজগণিত গ্রন্থগুলি মোসেস বিন তিব্বন কর্তৃক ১২৭১ খৃঃ অব্দে লাটিনে অনূদিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইবনোল বান্নার "তালখিস্" গ্রন্থ প্রণীত হয় আলহাসসারের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই।

আলহাসসার

গ্রহ উপগ্রহের ঘূর্ণন সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞান ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টিকারী হিসাবেই আলপিট্রাজিয়াস সুবিদিত। আলপিট্রাজিয়াস, আবু ইসহাক নুরউদ্দিন আলবিতরুজী আলইসবিলির ইউরোপীয় নাম। কি ভাবে তিনি আলপিট্রাজিয়াস নামে পরিচিত হয়ে পড়েন সে বোঝা মুস্কিল। হয়ত ভাষাবিদদের কল্যাণেই আলবিতরুজী,

আলপিট্রাজিয়াসে পরিণত হয়ে পড়ে। কর্ডোভার উত্তরে, পেড্রিক নামক নগরীতে তাঁর জন্ম হয় তবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল সেভিলেই অতিবাহিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্পেনের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার ধারা পূর্বের অনুসৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারা থেকে যেন সম্পূর্ণ পৃথক। একটু মনোনিবেশ করলে এ পার্থক্য অতি সহজেই পরিলক্ষিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে নূতন ভাবধারা প্রবর্তিত হচ্ছে, পুরাতন মতবাদ আর বৈজ্ঞানিকদিগকে আকৃষ্ট করতে পারছে না, এই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের কার্যকলাপে সে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে। এ যেন পরবর্তী কালের পূর্বসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানের আগমনী সুরের একটি ঝঙ্কার। এই ঝঙ্কার তুলেছেন আলহাসসার, আলপিট্রাজিয়াস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক। বস্তুত আলপিট্রাজিয়াসের এই নূতন মতবাদ বিজ্ঞানে এক নব পর্য্যায়ের সূচনা করে। বৈজ্ঞানিক নিজে কিন্তু এটিকে তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত বলে দাবী করেন না। তিনি ছিলেন দার্শনিক ইবনে তোফায়েলের শিষ্য। তাঁর এ মতবাদের প্রেরণা দানকারীর সমস্ত গৌরব তিনি তাঁর গুরুর প্রাপ্য বলেই মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে তোফায়েলের দার্শনিক যুক্তি এর প্রেরণা যোগালেও এর বৈজ্ঞানিকত্ব বৈজ্ঞানিকের নিজেরই প্রাপ্য—তবে জাবির ইবনে আফলাহর প্রভাবও এতে বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর যুক্তি আলোচনা করলে মনে হয় তিনি Homocentric

sphere এর মতবাদকে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। তাঁর মত অনুসারে প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ একটি গোলকের (sphere) সঙ্গে সংযুক্ত, এবং এদের প্রধান শক্তি (motive power) স্থির নক্ষত্রের গোলকের বাইরে, নবম গোলকে অবস্থিত। এই শক্তি প্রত্যেক গোলকেই পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে গতিবেগ সৃষ্টি করে। অষ্টম গোলকেই এই গতিবেগ সর্বাপেক্ষা অধিক, তার পর অন্যান্য গোলকে প্রধান শক্তির উৎস থেকে দূরত্ব অনুসারে গতিবেগও ক্রমশ কম হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ স্থির নক্ষত্র এবং চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থির নক্ষত্র ২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ণভাবে ঘুরে আসে কিন্তু চন্দ্র অন্তস্থ গোলকে অবস্থিত বলে ২৫ ঘণ্টায় একবার ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করে। ক্রান্তি বৃত্তের মেরু (The pole of the Ecliptic)

আলবিতরুজী

বিষুব রেখার মেরু থেকে পৃথক হওয়ার জন্যে গ্রহের কক্ষগুলি বদ্ধ নয় অধিকন্তু গ্রহগুলি ক্রান্তিবৃত্তের মেরু থেকে অপরিবর্তনীয় দূরেও অবস্থান করে না, প্রত্যেকটিরই অক্ষরেখায় ও দ্রাঘিমায় একটি নিজস্ব গতি আছে। অষ্টম গোলকের দুইটি গতি আছে ; একটি হোল দ্রাঘিমায় (precession) আর একটি মধ্যস্থানের চতুর্দিকে ক্রান্তিবৃত্তের মেরুর ঘূর্ণনের জন্যে উদ্ভূত (এইটি হোল কাল্পনিক Trepidation] of Equinoxes)। প্রত্যেক গ্রহের মেরুই নিজের পথে ক্রান্তিবৃত্তের মেরুর চারিদিকে ঘোরে। বৈজ্ঞানিকের এই মতবাদ আরব বিজ্ঞানে "হরকাতোল লাওলাবি" (Spiral

motion) নামে পরিচিত। মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের টলেমির মতবাদের বিরোধিতায় এটিকে চরমপত্র বলা যেতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় একে বিজ্ঞানে কাজে লাগিয়ে নেবার মত আর কোন বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয় নাই এবং এর আর কোন উন্নতিও হয় নাই।

বৈজ্ঞানিক তাঁর "কিতাবুল হাইয়া" গ্রন্থে এই মতবাদ প্রচলন করেন। "কিতাবুল হাইয়া" সেই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক অভিনব চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিব্রু এবং লাটিনে অনুদিত হয়। এই মতবাদ তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে নবজীবন দানকারী হিসাবেই বৈজ্ঞানিকদের নিকট সমাদৃত হয়। শুধু মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণই নন, অমুসলিম বৈজ্ঞানিকগণও, বৈজ্ঞানিককে সম্মান দেখাতে পশ্চাৎপদ হন নি। হিব্রু অনুবাদে তিনি "হা মারিশ" বা "মতবাদ (আকাশচারী গ্রহ নক্ষত্রাদির) পরিবর্তনকারী" নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।*

মাইকেল স্কট নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ১২১৭ খৃঃ অব্দে "কিতাবুল হাইয়া" লাটিনে অনুবাদ করেন। ১২৫৯ খৃঃ অব্দে মোজেস বিন তিব্বন এখানাকে হিব্রুতে অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫২৮-২৯ খৃঃ অব্দে) কালোনিমস বিন ডেভিড

---

* Al Bitruji was considered the representative of a new astronomy and was aptly surnamed in Hebrew Ha-marish, he who causes the doctrine (or the heavens) to vacillate.—Sarton, Introduction to the History of Science, Vol. II, p. 399.

(Qalonymos ben David) হিব্রু অনুবাদ থেকে পুনরায় লাটিন অনুবাদ করেন।

আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে মোহাম্মদ সাধারণত ইবনে বিদার নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন সেভিলের অধিবাসী। সেভিলেই তাঁর জন্ম হয়—তবে তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে বীজগণিতই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। এর অন্য কোন শাখা সম্বন্ধে তিনি কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে আলোচনা করে থাকলেও তাতে যে প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন এমন মনে হয় না। তিনি বীজগণিতে একখানি ইখতিসার প্রণয়ন করেন। এতে Theoretical অংশের সঙ্গে সঙ্গে নানা উদাহরণ এবং আঙ্কিক সমস্যাও দেওয়া হয়েছে। দ্বিঘাত সমীকরণ, করণী (surds), Multiplication of polynomials, অনুপাতের আঙ্কিক থিওরী, Linear Diophantive equations প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থখানি ভরপুর। নামে ইখতিসার বা সংক্ষিপ্তসার হোলেও, এ বীজগণিতে বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। গ্রন্থের মধ্যে আবুকামিল নামক এক বৈজ্ঞানিকের বহু উল্লেখ দেখা যায়। খুব সম্ভব এ আবু কামিল মিসরীয় বৈজ্ঞানিক শুজা ইবনে আসলাম। ১৩১১-১২ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ ইবনে কাসিম ঘারনাতি, কাব্যে ইখতিসারের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

ইবনে বিদার

ইবনোল কাত্তিব নামে অন্য একজন বৈজ্ঞানিকও অঙ্কশাস্ত্রের নানা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থান লাভ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবু আবহুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবহুর রহমান। তবে সাধারণত তিনি ইবনোল কাত্তিব নামেই পরিচিত। অঙ্কশাস্ত্রে অঙ্ক, জ্যামিতি ও পরিমিতি সম্বন্ধে তাঁর ছুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে মৌলিক অবদানের দিক দিয়ে এগুলোকে বিশেষ উন্নত স্তরের বলা চলে না। ১২১১ খৃঃ অব্দে এই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়।

ইবনোল কাত্তিব

মুসলিম জগতের অন্যান্য দিকে মুসলিম জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যে ঘুন ধরলেও ভারতবর্ষে কিন্তু এই সময়ে বিপরীত ভাবই দেখা দেয়। এই শতাব্দীতেই এখানে মুসলিম রাজ্য এবং মুসলিম প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সমস্ত শতাব্দী ধরেই চলে দাস বংশের রাজত্ব। ইলতুতমিস, রাজিয়া, নাসিরউদ্দিন প্রভৃতি সুলতানগণ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী হিসাবে ইতিহাসে সুবিখ্যাত কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাঁদের বিদ্যোৎসাহ শুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকে কাউকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে মনে হয় না। শুদ্ধ বিজ্ঞানে কেউ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলেও জানা যায় না। বস্তুত অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মুসলিম, অমুসলিম কারুরই নাম করা যেতে পারে না।

শেষ অধ্যায়

প্রায়ই দেখা যায় জাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যেরও অধঃপতন শুরু হয়। মুসলিম জগতের ইতিহাসই এর বোধ হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক গোলযোগ বিদ্বৎবর্গের কার্যে প্রত্যক্ষভাবে কোন বাধা না জন্মালেও পরোক্ষভাবে তাঁদের মনে যে অনুৎসাহের সৃষ্টি করে তার ফল পূর্বে থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানরাজ্যে যে অধোগতির সূচনা দেখা দেয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সে অস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। এর পরেই সে নগ্নমূর্তিতে প্রকট হয়ে পড়ে। এখন থেকেই এ অধোগতি চলেছে অতি দ্রুতগতিতে এবং পরে আর কোথাও উন্নতির রেশ দেখা দেয় নাই। স্থানে স্থানে অত্যন্ত ছাড়াছাড়িভাবে দুই একজন মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিলেও, পূর্বের মত বিজ্ঞান চর্চার আর কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। মারাঘা, সমরকন্দ, স্পেন, মরক্কো প্রভৃতি স্থানে পূর্বের মতই চর্চা চলেছে কিন্তু অধঃপতন দেখা দিয়েছে সর্বত্র। প্রায় সবাই পূর্বেকার চর্বিত চর্বনে ব্যস্ত। নূতন ভাব, নূতন উদ্ভাবনা, নব আশার বাণী কোথাও নেই সবই যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। বন্যার যে জোয়ার স্রোত এসেছিল দুকূল ভাসিয়ে সে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। যা তার দেবার ছিল সে যেন নিঃশেষে সব দান করে সর্বস্বান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে। এখন সে কর্মক্লান্ত, পূর্ব

গৌরবের অসার আলোচনা, পূর্ব স্মৃতির জন্য অকারণ হাহুতাশই তার জীবনমন্ত্রে পর্যবসিত।

বিজ্ঞানের জন্মভূমি মারাঘা ছাড়া খাঁটি আরব পারস্যে চতুর্দশ শতাব্দীতে অঙ্কশাস্ত্রে সামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ইবনোস শাতির ব্যতিরেকে এমন অন্য কারুর নাম করা যাবে না। অদৃষ্টের পরিহাস যে স্থানের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উপর সমস্ত জগৎ উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত সেখানে বিজ্ঞানের নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই। আবুল ওয়াফা, ছাবেতের কর্মভূমি আস্তে আস্তে অজ্ঞান অন্ধকারে চিরনিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। গৌরবময় বাগদাদের গৌরব নিঃশেষে নীরব হয়ে গেছে।

ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি অঙ্কের প্রায় সমস্ত শাখাতেই ইবনোস শাতিরের হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনি বিশেষ মৌলিক গবেষণায় এগুলির উন্নতির পথ সুগম করে তুলতে পেরেছিলেন এমন বলা চলে না। সাধারণভাবে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা, কতকগুলি নিয়মের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন এবং অন্য কতকগুলো নূতন প্রণালীর সন্নিবেশের মধ্যেই তাঁর কাজ নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সে হিসাবে তিনি ওমর খৈয়াম নাসিরউদ্দিনের শ্রেণীভুক্ত হবার দাবী না করতে পারলেও, এই অধঃপতনের যুগে জ্ঞান শিখা প্রজ্জলিত রাখার প্রচেষ্টার জন্যেই তাঁর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি চিরঅক্ষুণ্ণ থাকবে। ইবনোস শাতিরের পূর্ণ নাম হোল আবুল হাসান আলি ইবনে ইবরাহিম ইব্নে মোহাম্মদ আলমোতিম আল আনসারি। ১৩০৪ খৃঃ অব্দে

তাঁর জন্ম হয় এবং ১৩৮০ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পরও মারাঘায় কিছুদিন অনেকটা পূর্বের মতই কাজ চলে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মৌলিক গবেষণার বিরাম হয় নাই তবে এ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। হালাকুর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা বিজ্ঞানের প্রতি আর তেমন অনুরাগ দেখান নাই। তাই হালাকুর প্রতিষ্ঠিত মারাঘার মানমন্দিরও বিজ্ঞান জগতকে আকর্ষণ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। নাসিরউদ্দিনের শিষ্য কুতুবউদ্দিন শিরাজীই বোধ হয় এখানকার সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক। নাসিরউদ্দিনের মত যুগ প্রবর্তক প্রতিভার অধিকারী না হোলেও কুতুবউদ্দিন, মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ ইবনে মাসুদ ইবনে মসলিহ কুতুবউদ্দিন শিরাজী।

১২৩৬ খৃঃ অব্দে শিরাজ নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে কুতুবউদ্দিনের জন্ম হয়। এই বংশ পারস্যের অন্যতম সুশিক্ষিত ও অভিজাত বংশ হিসাবে পরিচিত ছিল। কুতুবউদ্দিনের পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই ছিলেন বিজ্ঞ ও বিখ্যাত চিকিৎসক। কুতুবউদ্দিন প্রথমে তাঁদের নিকটেই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। মারাঘার মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি মারাঘায় গমন করেন। এই স্থানেই তিনি নাসিরউদ্দিনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর প্রিয়তম শিষ্যে পরিণত হন।

নানা দেশের পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে যাতে জ্ঞানবিজ্ঞানের

সমস্ত শাখায়ই বিশেষ পারদর্শী হতে পারেন, সেই জন্যেই তিনি শিক্ষা সমাপ্তির পর দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন এবং প্রায় সমস্ত মুসলিম জগৎ পরিভ্রমণ করেন। খোরাসান, দুই ইরাক, পারস্য, রোম (এশিয়া মাইনর) প্রভৃতি দেশের সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রই তাঁর ভ্রমণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা হোক এমনি ভাবে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি পারস্যের ইলখান আহম্মদ (১২৮১-১২৮৪) এবং আরগুণের (১২৮৪—১২৯৪) অধীনে কাজীর পদে নিযুক্ত হন। রাজপদ দেখে মনে হয় তিনি আইন শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবেও বেশ খ্যাত ছিলেন। ১২৮২-৮৩ খৃঃ অব্দে তাঁকে সিভাস এবং মালাতিয়ার কাজী পদে নিযুক্ত দেখা যায়। এই সময়ে মোগল দলপতিদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে; মুসলিম পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের সংস্পর্শে এসে তাঁরা ইসলামে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ইলখান আহম্মদ পূর্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁর এই পরিবর্তন মুসলিম জগতকে জানিয়ে দিয়ে মুসলিম জগতের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে তিনি কুতুবউদ্দিনকে মামলুক সুলতান আলমনসুর সইফ উদ্দিন কালাউনের (১২৭৯-১২৯০) নিকট দূত রূপে প্রেরণ করেন। কুতুবউদ্দিন এই দৌত্য কার্যের মধ্যেও বিজ্ঞানের কথা ভুলেন নাই। তিনি এখানে থাকতেই বহু গ্রন্থ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগ্রহের তালিকা দেখে মনে হয় তিনি মিসরে অনেকদিনই কাটিয়ে ছিলেন। মিসর থেকে ফিরে এসে তিনি তেব্রিজে বসবাস স্থাপন করেন। এইখানেই ১৩১২ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুতুবউদ্দিন বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। এখানে তাঁর কতকগুলি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গেল—(১) জ্যামিতি সম্বন্ধে তাঁর দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর একখানি হোল নাসিরউদ্দিন তুসীর ইউক্লিডের Elements এর ভাষ্যের অনুবাদ। কনস্তান্তিনোপলের লাইব্রেরীতে এই মূল অনুবাদ গ্রন্থখানি এখনও রক্ষিত আছে। কারুর কারুর মতে গ্রন্থখানি সত্যই কুতুবউদ্দিনের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি এখানা কুতুবউদ্দিনের লিখিত হয় তা হোলে পারসীতে তিনি যে দুই চারখানি গ্রন্থ লেখেন বলে জানা যায় এ তারই একখানা। তাঁর প্রায় সমস্ত গ্রন্থই আরবীতে লিখিত তবে মাত্র দু চারখানা পারসীতে লিখিত। অন্য জ্যামিতি গ্রন্থখানার নাম হোল "ফি হরকাতোল দাহরাজা ওয়া নিসবা বায়নাল মুসতাবি ওয়াল মুনহানি" (On the motion of rolling and the relation between the straight and the crooked). এ গ্রন্থখানিকে বৈজ্ঞানিকের বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ "নেহায়েতে"র পরিক্রমা হিসাবে সংযুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থখানি ঠিক কুতুবউদ্দিনের লিখিত কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দিয়েও তিনি যখন প্রকৃত গ্রন্থকার কে সে বিষয়ে নীরব রয়ে গেছেন তখন মনে হয় এ তাঁর নিজেরই প্রণীত। এই নীরবতা ছাড়াও এতে জ্যামিতি নিয়ে যে ভাবে আলোচনা হয়েছে তাতে স্পষ্টই মনে হয় এ তাঁরই প্রণীত। এতে অন্যতম Paradox চাপের চেয়ে সরল রেখাই ছোট কিনা—(whether

a straight line is really shorter than an arc) নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকের সব চেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা। মৌলিকতার দিক দিয়ে এই দুইটিতে তাঁর অবদানও হয়েছে তাই অভূতপূর্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম হোল "নিহায়েতোল ইদরাক ফি দিবাইয়াতোল আফলাক্"(Highest understanding of the knowledge of the spheres)। এতে শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেই যে বিস্তৃত বিবরণ ও তথ্যাদি রয়েছে তা নয় আনুসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত আনুসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে Geodesy, Meteorology, Mechanics এবং Optics এর নাম করা যেতে পারে। গ্রন্থখানি অবশ্য প্রধানত নাসিরউদ্দিনের তাজকিরাকে ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে তবে এতে সমস্ত বিষয়েই তাজকিরার চেয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া এমনিতেও বৈজ্ঞানিকের নিজের উদ্ভাবিত নানা নূতন তথ্য ও নূতন থিওরীও এতে সংযোজিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইবনোল হাইছাম এবং মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আলখারাকীর Cosmological মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনোল হাইছাম এবং নাসিরউদ্দিন গ্রহের কক্ষ সম্বন্ধীয় গোলীয়তল ট্যানজেণ্ট বলে ধরে নিয়েছিলেন (Conceived the spherical surfaces relative to the planetary

orbits as tangent) কুতুবউদ্দিনের মতে এদের ভিতরে কিছু স্থান অবশ্যই থাকবে।

পৃথিবী ঘুরছে কি স্থির রয়েছে এ সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হন নাই বলা চলে। পৃথিবীর স্থির থাকার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন এবং পৃথিবী স্থির ভাবে বিশ্বের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান রয়েছে এই মতকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। মনে হয় টলেমির প্রভাবকে তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন নাই। টলেমির আলমাজেষ্ট চতুর্দিক থেকেই এর পূর্বেই নানা ভাবে আক্রান্ত হয়। এর মতবাদ যে অনেক সময়েই বিজ্ঞানসম্মত নয় নানা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে সে বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগও করেন। কুতুবউদ্দিন এ সমস্তই অবগত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তবুও টলেমির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার মত মানসিক শক্তি সংগ্রহ করতে পারেন নাই বলেই মনে হয়।

অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের মত নিহায়েতের এক অংশও ভৌগলিক বিবরণে ভরপুর। সমুদ্র ও আবহাওয়ার বিবরণ এর অন্যতম বিশেষত্ব। আবহাওয়ার বিবরণ অনেকটা আলবেরুণীর অনুরূপ। বৈজ্ঞানিক ভূগোলে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন একটি ঘটনা থেকেই তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। ১২৮৯ খৃঃঅব্দে আরগুনের দরবার থেকে জেনোয়ীজ দূত Buscarello De Ghizolfi যখন ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য যাত্রা

করতে মনস্থ করেন তখন বৈজ্ঞানিক ম্যাপ এঁকে তাঁর সমস্ত পথের বিবরণ সবিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেন।

নিহায়েত ছাড়াও কুতুবউদ্দিনের আরও ছয়খানি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছয়খানির নাম হোল (৪) "ইখতিয়ারাতি মুজাফফরী"—নিহায়েতের কতক অংশের পারসী অনুবাদ। মুজাফফর নামক জনৈক ভদ্রলোকের জন্য লিখিত হয় বলে এর নাম হয় মুজাফফরী। (৫) "কিতাবুত তোহাফাস শাহিয়া ফিল হাইয়া" (The Royal present on astronomy)। নিহায়েতের মত এখানিও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যে ভরপুর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আলি ইবনে আলকুশজী (১৪৭৪-৭৫ খৃঃ অব্দে) এর একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। "কিতাব ফাআলতু ফালা তালুম ফিল হাইয়া" (Book I have composed but don't blame it on astronomy), (৭) "কিতাবুত তাবছিরা ফিল হাইয়া" (Treatise on Astronomy), (৮) "শারহোত্ তাজ কিরান নাসিরিয়া"—নাসিরউদ্দিনের তাজকিরা এবং মোহাম্মদ ইবনে আলহিমাজীর "বায়ান মাকাসিদোত তাজকিরার" ভাষ্য (৯) "খারিদাতোল আজায়েব" (The wonderful pearl), (১০) জাবির ইবনে আফলাহর "ইসলাহোল মাজিস্তির" ভাষ্য।

পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানা যায় না। তবে নিহায়েতের মধ্যেই এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। পদার্থবিদ্যায় তাঁর সব চেয়ে বড়

অবদান হোল রামধনুর উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ। তিনিই সর্বপ্রথম দেখিয়ে দেন যে, জলের মধ্যে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের জন্যই রামধনুর সৃষ্টি হয়।

বৈজ্ঞানিক মেকানিকস সম্বন্ধেও পদার্থবিদ্যার মতই নিহায়েতের মধ্যে আলোচনা করেছেন। মেকানিকসের সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের জন্যই তিনি পৃথিবীর ঘূর্ণনের মতবাদ ত্যাগ করেন বলা যেতে পারে। তাঁর মতে দুইটি প্রাকৃতিক গতি (natural motion) দেখতে পাওয়া যায়। একটি হোল Rectilinear অন্যটি হোল circular। যে সমস্ত বস্তুতে এই প্রাকৃতিক দুইটি গতিই বর্তমান সে সমস্ত বস্তুর অন্য কোন গতি হতে পারে না। Sublunar গতিও হোল Rectilinear. বিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্যকে অবহেলা করে এমনি ভাবে দার্শনিকতাকে আঁকড়ে ধরার জন্যেই কুতুবউদ্দিন যে বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন সে বলাই বাহুল্য। তাঁর মেকানিকসের মতবাদ তাঁর সমসাময়িক আলি ইবনে ওমর আলকাজবিনিরই অনুরূপ। আলকাজবিনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটে থাকলেও খুব সম্ভব নাসিরউদ্দিনের মারফত পরিচয় ঘটে।

চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁর ছয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হোল অবশ্য ইবনে সিনার কানুনের ভাষ্য। তিনি এই ভাষ্যের মাল মশলা সমস্তই মিসরে থাকতেই সংগ্রহ করেন। তাঁর অন্য চিকিৎসা বিদ্যার গ্রন্থগুলোর

নাম হোল (১১) "শারহ কুল্লিয়াতোল কানুন" (১২) "রিসালা ফি বায়ান আলহাজা ইলাততিব ওয়া আদাবোল আতিব্বা ওয়া ওয়াসায়াহোম" (১৩) "রিসালা ফিল বারাস" (১৪) ইবনে সিনার আরজুজা সম্বন্ধে ভাষ্য (১৫) চক্ষুরোগ সম্বন্ধে গ্রন্থ।

দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই। বৃদ্ধবয়সে ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিকও এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচয় দেন ধর্মশাস্ত্র ও সুফীতত্বের আলোচনায়। তিনি কোরাণ ও হাদিস শরীফের তিনখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এগুলির নাম হোল (১৫) "ফাতহোল মান্নান ফিত্‌তাফসিরোল কোরাণ" (১৬) "ফি মুসকিলাতোল কোরাণ" (১৭) জামাখশারির "কিতাবুল কাশশাফ আলহাকায়েকোল তানজিল" এর ভাষ্য। শুদ্ধ দর্শন সম্বন্ধেও তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানির নাম হোল (১৮) "শারহ হিকমাতোল ইশরাক"। এখানি ইয়াহিয়া আসসোহরাওয়ার্দির "কিতাবোল হিকমাতোল ইশরাকের" ভাষ্য।

তাঁর এই সর্ববিদ্যা বিশারদত্বের অন্যতম প্রমাণ হোল তাঁর প্রণীত বিশ্বকোষ। বিশ্বকোষখানির নাম হোল "তুররাতোততাজ লি ঘুরবাতোদ দিবাজ ফিল হিকমা" (Pearls of the crown, best introduction to wisdom)। আরবী পারসী উভয় ভাষাতেই গ্রন্থখানি বর্তমান।

আলজাচমিনিও এই সময়ের অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তাঁর

পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ওমর আলজাচমিনি। খারিজম প্রদেশের অন্তর্গত জাচমিন জেলায় তাঁর জন্ম হয়, সেই হিসাবেই তিনি জাচমিনি নামে পরিচিত হয়ে পড়েন। তাঁর জন্ম মৃত্যুর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। খুব সম্ভব ৭৪৩ হিজরীতে (১৩৪৪-৪৫ খৃঃ অব্দে) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তিনি কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন যে সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে এ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর একখানির নাম হোল "আলমুলাখস ফিল হাইয়া" (Compendium of Astronomy)। গ্রন্থখানি সে সময়ে খুবই সমাদর লাভ করে। কাজীজাদা রুমী, আলজুরজানি প্রভৃতি অনেকেই এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। রুডলফ্ এর একখানি জার্মান অনুবাদ করেন। অনুবাদখানি Zeitschr der D. Morgunt Ges; xvii 213 এ প্রকাশিত হয়। বার্লিন, গথা, লাইডেন, প্যারী ও অক্সফোর্ডে এর অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম হোল "কিয়াল কাওয়াকিব ওয়াদা আফলিয়া (The strong and weak influence of the stars)। প্যারীতে এর একখণ্ড পাণ্ডুলিপি এখনও বর্তমান রয়েছে।

অঙ্কশাস্ত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর কিছু প্রতিপত্তি ছিল বলে মনে হয়। 'কানুন' নামে তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মিউনিক, গথা

প্রভৃতি স্থানে এখনও এর পাণ্ডুলিপি বর্তমান রয়েছে। গ্রন্থখানি • ইবনে সিনার কানুনের কতকাংশ নিয়ে প্রণীত।

প্রাচ্যের অধঃপতনের ছোঁয়াচ পশ্চিমের মিসর ও স্পেনকেও পেয়ে বসে। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার প্রতিযোগিতাও একাদশ শতাব্দী থেকেই পরিলক্ষিত হয়। অনেক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর আবির্ভাব উভয় দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। পতনের যুগেও এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারে নিবে যায় নাই। তবে অন্তর্নিহিত দৌর্বল্যের জন্য এই সময়কার এই প্রতিযোগিতার ফল যে বিশেষ কিছুই হয় নাই সে অস্বীকার করা যায় না।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মৌলিক অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে মিসরীয় বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁর নাম হোল ইবনোল বান্না বা আলবান্না। ইবনোল বান্নার অর্থ হোল স্থপতির পুত্র। তাঁর পিতা ছিলেন গ্রাণাডার এক স্থপতি। পিতার আর্টকে অনুসরণ না করে পুত্র বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর পূর্ণ নাম হোল আবুল আব্বাস আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ওছমান আল আজাদি ইবনোল বান্না। তাঁর নামের সঙ্গে "আলমোরাক্কসী"ও যোগ দেখা যায় তাঁর প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে। এতে মনে হয় তিনি মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। ৬৫৪ হিজরী ৯ জিলহজ (৩০ শে ডিসেম্বর ১২৫৬ খৃঃ অব্দ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২১ হিজরী ৬ই রজব

(আগষ্ট ১৩২১ খৃঃ অব্দ) শনিবারে মরক্কোতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জন্মতারিখ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ দেখা যায়। কারুর কারুর মতে তাঁর জন্ম হয় ৬৩৯ হিজরীতে কারুর মতে ৬৪৯ হিজরীতে আবার কারুর মতে ৬৫৬ হিজরীতে। তবে অধিকাংশের মতে ৬৫৪ হিজরীতে। মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধেও এমনি মত বিরোধ দেখা যায়। কারুর কারুর মতে তাঁর মৃত্যু হয় ৭২৩ বা ৭২৪ হিজরীতে আবার কারুর কারুর মতে ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে।

প্রথম জীবনে তিনি নিজের জন্মস্থানেই ব্যাকরণ, হাদিস, ফেকাহ ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানকার অধ্যয়ন সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ফাস নগরে গমন করেন এবং সেখানে আলমারিগের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা, ইবনে হাজলার নিকট অঙ্ক,এবং মাখলুক আসসিজ্জিল মাসীর নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বজন বরেণ্য। কিছুদিনের জন্য তিনি সুফী আবদুর রহমান আলহাজিমীর শিষ্য হন এবং তাঁর নিকট ধর্মের আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষা লাভ করেন। যাঁরা মনে করেন ধর্মের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণা খাপ খায় না ইবনোল বান্নার জীবনী তাঁদের পক্ষে প্রকৃষ্ট ঔষধ। ধর্মের আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন অতি উন্নত স্তরের কিন্তু ধর্মের প্রতি এই অসাধারণ আসক্তি তাঁর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসার মধ্যে এতটুকু ত্রুটি ঢুকতে দেয় নাই। অধিকাংশ সময়েই তিনি রোজা রাখতেন এবং নির্জনে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁর জীবনী লেখকগণ সবাই তাঁর ধার্মিকতা ও মহান চরিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিজ্ঞানের তথা অঙ্কশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বিভাগেই তাঁর বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। বীজগণিত, পরিমিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। এর প্রত্যেকটিতেই তাঁর মৌলিক অবদান সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। তাঁর আলোচনার মধ্যে কতকগুলি অভিনবত্ব বিশেষ চিত্তাকর্ষক। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ কোন দিনই abacus ব্যবহার করেন নাই ; এর অবৈজ্ঞানিকত্ব তাঁদের মনকে একটুও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় নাই। আলবান্না কিন্তু মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের এই চিরপরিচিত প্রথার ব্যতিক্রম করেন। তিনি এমনি সংখ্যা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে abacus ও ব্যবহার করেছেন। ক্যাজোরীর মতে এর কারণ হোল ইউরোপীয় প্রভাব। তিনি বুগিয়া নামক আফ্রিকার এক বন্দরে বাস করতেন এবং এর ফলে ইউরোপীয়দের সঙ্গে বিশেষভাবে মেলা মেশার সুবিধা পান। এর জন্যেই তিনি abacus ব্যবহার শিক্ষা করেন ও নিজেও ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হন। প্রথম মাত্রা সমীকরণের সমাধানে Double False Position এর ব্যবহারও তাঁর অভিনবত্বের অন্যতম নিদর্শন। এর একটি হোল :—

$$\sqrt{(a^2+r)}=a+\frac{r}{2a} \qquad \text{যদি } r<a$$

$$=a+\frac{r}{2a+1} \qquad \text{যদি } r>a$$

Proportion বা সমতা বিষয়ক আলোচনায়ও তাঁর মৌলিকতা ও অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইবনোলবান্না সব সমেত কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কারুর কারুর মতে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা হোল ৫১, কারুর কারুর মতে ৭৪। তবে এক বিষয়ে সবাই একমত। সবারই মতে গ্রন্থগুলির প্রায় সবই অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানির নাম হোল "তালখিস ফি আমালোল হিসাব" (Summary of the operations of Calculations)। এখানি শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ে। অনেকের মতে এ গ্রন্থখানি মোহাম্মদ ইবনে আবতুল্লাহ আলহাসসারের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। যাই হোক গ্রন্থখানি শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের নানা বিষয়ের আলোচনায় ভরপুর। ভগ্নাংশের উন্নততর আলোচনা, পাশ্চাত্য প্রণালীতে ভারতীয় সংখ্যা ব্যবহার, বর্গ এবং ঘন এর সমষ্টি, নয়, আট এবং সাত বাদ দেওয়ার পদ্ধতি, Double false position এর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে এতে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিকদের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করে এর ভাষ্যের সংখ্যা থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। ইবনোল বান্নার অন্যতম ছাত্র ইবনে আলি ইবনে দাউদ, মিসরের অন্যতম বৈজ্ঞানিক ইবনোল মাজিদি, আলকালাসদি, আবুজাকারিয়া মোহাম্মদ আলইসবিলি প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এছাড়া কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির ভাষ্যও দেখতে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকের সমস্ত গ্রন্থগুলিকে জ্যামিতি, অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আস্তারলব, জ্যোতিষ ও ক্যালেণ্ডার—এই সাত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। জ্যামিতির মধ্যে ইউক্লিডের একখানি ভাষ্য এবং "রিসালা ফি ইলমোল মাসাহা" (A treatise on the measurment of surfaces) এই দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তালখিস ছাড়া "রাফোল হিজাব আল মাকালাত ফিল হিসাব" (Discourses on calculation), "তালবিহুল আলবাব" (Awakening of minds), "মুখতাসার কাফিলিল মুতাল্লিব" (A compendium which is a surety to the investigator), "জাওয়াতোল আসম" (A treatise on binomials), "মুনফাসালাত" (apotomes) এবং অনুপাত, উত্তরাধিকারস্ব সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। "মাকালাত ফিল হিসাব" আসলে সংখ্যা (integers), ভগ্নাংশ (fraction), মূল (root) এবং অনুপাত এই চার বিষয়ে চারখানি গ্রন্থের সমষ্টি। মুনফাসালাতে সখ্যাগঠনের আকার যেমন $a \pm \sqrt{b}$ বা $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বীজগণিত সম্বন্ধে তাঁর প্রধানত দুইখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। একখানির নাম হোল "কিতাবুল ওসুলোল মুকাদ্দামাত ফিল জাবর ওয়াল মুকাবিলা" (Principles of and introduction to Algebra). অন্যখানির নাম হোল "কিতাবু ফিল জাবর ওয়াল মুকাবিলা"। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর অনেকগুলির গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া

যায়। এগুলির মধ্যে "কিতাবু মিনহাজুত তালিব লি তাদিলোল কাওয়াকিব" (The way of those who wish to account for the movement of the stars),"কামুন লি তারহিলোস শামস্থল কামার ফিল মানাজিল ওয়া মারিফাত আওকাতোল লায়লোন নাহার" (Rule to determine the stations of Sun and Moon & know the times of night & day), কিবলার দিকনির্ণয়, নক্ষত্রের অস্তগমন (Heliacal settings of the stars), কিতাবুল ইশারা ফিত তাকবিমোল কাওয়াকিবোস সায়ারা (Books of Ease, tables of the wandering stars) গ্রন্থগুলিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইবনে খালছুনের মতে প্রথম গ্রন্থখানি ইবনে ইসহাকের টেবলের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

আস্তারলব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের ছুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। একখানি অস্তারলব সম্বন্ধে অন্যখানি হোল আলজারকালির সাফিহার ব্যবহার সম্বন্ধে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষে তখন বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও শুদ্ধ জ্যোতিষ সম্বন্ধেই তাঁর ছুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানির নাম হোল "মাদখাল আননজুম ওয়া তারাইয়াল হুরুফ (Introduction of stars and properties of letters), অন্যখানির নাম হোল "কিতাবু ফি আহকামুন নজুম" (On judicial astronomy) পঞ্জিকার ইংরেজী প্রতিশব্দ আলমানাকের সৃষ্টি হয় ইবনোল

বান্নার ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে গ্রন্থের নাম থেকেই। এগ্রন্থখানির নাম হোল "কিতাবুল মানাখ"।

অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে ইবনোল বান্না এই সময়ে কিরূপ সমাদর লাভ করেন তালখিসের সমাদর থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। দুই শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে এর প্রভাব অপ্রতিহত ভাবেই অক্ষুণ্ণ রয়ে যায়। ইবনে খালদুন তাঁর গ্রন্থে পঞ্চমুখ হয়ে ইবনোল বান্নার প্রশংসা করেছেন। এমনিতে ইবনে খালদুনকে আলবান্নার জ্ঞানপ্রশিষ্য বলা যেতে পারে। তাঁর শিক্ষক আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ছিলেন আলবান্নার শিষ্য।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে Aristide Marre ফরাসী ভাষায় তালখিসের অনুবাদ করেন। ইবনোল মাজিদির ভাষ্যের কতকাংশ মঁ উপেক ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আলকালাসদির ভাষ্যেরও কতকাংশ অনুদিত হয়েছে।

মুসলিম জগতের গৌরবময় যুগে অনেক মুসলিম নৃপতিই বিজ্ঞান আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নীরস বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাবান শ্রদ্ধা অনেক বাদশাহকেই বাদশাহী বিলাস ব্যসন ভুলিয়ে বিজ্ঞান সাধক সাজিয়ে তুলেছিল; এই পতনের যুগেও যে সে বিজ্ঞানপ্রীতি একেবারে নিঃশেষ হয় নাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল পঞ্চদশ শতাব্দীর মোগল সম্রাট উলুগবেগ। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবেই উলুগবেগের নাম করা যেতে পারে।

অনুন্নত অসভ্য জাতিকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে হোলে বিজ্ঞানের চর্চা যে একান্ত দরকার অর্ধ অসভ্য মোগল দিগবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে কথা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছিল। অন্য সভ্য দেশের সঙ্গে সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অন্তর্নিহিত দৌর্বল্যের পরিচয় পেয়ে তারা সজাগ হয়ে উঠে। বিজ্ঞান চর্চার দিকে তারাও মন দেয়। এই জ্ঞান স্পৃহার প্রথম ইতিহাসই নাসিরউদ্দিনের জীবনে প্রকটিত। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ জ্ঞান স্পৃহায় ভাটা পড়ে বলা যেতে পারে তবে এর রেশ একবারে থেমে যায় নাই। তাইমুরের সঙ্গে সঙ্গে এ আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠে।

জগতের ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর বিপ্লব উত্থাপনকারী হিসাবেই তাইমুর পরিচিত। তাঁর অসীম সাহস ও অমিত শক্তির সঙ্গে নিষ্ঠুর বর্বরতা সমস্ত জগৎকে ভয় চকিত করে তুলেছিল কিন্তু এই কঠোর আবরণের নীচেই যে জ্ঞান পিপাসার আকুলি ব্যাকুলি লুক্কায়িত ছিল সে বাইরের জগতে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় নাই। তার সন্ধান পায় তাঁর দেশবাসীই শুধু। বিজ্ঞান ও কাব্যের প্রতি তাইমুরের ছিল এক অদম্য আকর্ষণ। তাঁর রাজধানী ছিল কবি, আর্টিষ্ট ও বৈজ্ঞানিকদের মিলন স্থল। তাঁদের সাহচর্য তাইমুরের নিকট যুদ্ধের হিংসাবৃত্তির চেয়ে কম উপাদেয় ছিল না। এই সাহচর্যের ফলেই হোক কি নিজের অন্তর্নিহিত সৌকুমার্যের জন্যই হোক তিনি নিজেও কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেগুলি খুব উঁচুদরের কিছু না হোলেও বিশেষ উপেক্ষণীয়

ও বলা চলে না। সমরকন্দকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল করে গড়ে তোলবার একটা আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর মনে সব সময়েই জাগরূক ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় সমরকন্দের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে। পতির চেয়ে পত্নীও কম যান নাই। তাইমুরের জ্ঞান পিপাসা তাঁর সহধর্মিনীতেও সংক্রমিত হয়। দেশবাসীর উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে তিনিও উদ্বুদ্ধ হন। তারই ফল হোল বিবিখানম বিশ্ববিদ্যালয়। স্থপতির দিক দিয়ে বিবিখানম বিশ্ববিদ্যালয় আজও বিশ্বের বিস্ময়। যা হোক এই জ্ঞান স্পৃহা প্রতিভার আবির্ভাবে অলঙ্কৃত হয়েছিল কিনা জানা যায় না অন্তত উলুগবেগের পূর্ব পর্যন্ত তেমন কোন প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। মধ্য এশিয়ায় মোগলের বিজ্ঞানপ্রীতির প্রথম অভ্যুদয় নাসিরউদ্দিনের নামের সঙ্গে বিজড়িত। অনুর্বর মধ্যবর্তী কিছুদিনের পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে উলুগবেগের সঙ্গে হয় এর পরিসমাপ্তি।

তাইমুরের জ্ঞান পিপাসা বংশানুক্রমেই উলুগবেগের মধ্যেও সংক্রমিত হয় বলা যেতে পারে। তাইমুরের পুত্র উলুগবেগের পিতা শাহরুখ মির্জা নিজে বৈজ্ঞানিক না হোলেও বিজ্ঞানের প্রতি ছিলেন অতি উৎসাহী। তাঁর অর্ধশতাব্দী কাল রাজত্ব জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জন্য সুবিদিত। সাধারণত রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন রাজধানীর সুনাম ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। শাহরুখ মির্জার আমলের পূর্বতন রাজধানী সমরকন্দ জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় এত উন্নত হয়েছিল যে রাজধানী হিরাতে স্থানান্তরিত

হওয়ার পরও এর গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উলুগবেগ তার্কিস্তানও ট্রানসোক্সিয়ানার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর এ আবার নবভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। যা হোক শাহরুখ মির্জার বিজ্ঞানপ্রীতি মূর্ত হয়ে উঠে তাঁর পুত্র উলুগবেগের বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে। শুধু জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় উৎসাহ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজে যথারীতি বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে স্বীয় মৌলিক প্রতিভার ছাপ রেখে রাজনৈতিক ইতিহাসের ন্যায় বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর লোকের জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান সখের অভিনয়ে পরিণত হয় কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদানকারী মুসলিম বাদশাহদের উপর এ দোষারোপ করবার উপায় নেই। সর্বান্তকরণে জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হওয়াই তাঁদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন উলুগবেগ।

১৩৯৪ খৃঃ অব্দে ২২শে মার্চ সুলতানিয়াতে এই অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন মনীষীর জন্ম হয়। তাঁর জন্ম তাইমুরের জিঘাংসা বৃত্তির মধ্যেও পরিবর্তন আনয়ন করে। তাইমুর এই সময় মারদান দুর্গ অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন। মারদান দুর্গের অধিবাসীরা আত্ম-সমর্পন করেছে। রক্ত পিপাসু তরবারীর নীচে কতক্ষণে তাদের জীবনলীলা শেষ হবে হয়ত সেই কথাই তারা চিন্তা করছে। এই সময়ে উলুগবেগের জন্ম সংবাদ নিয়ে দূত এসে তাইমুরের নিকট উপস্থিত হয়। তাইমুর খুসী হয়ে মারদান অধিবাসীদের মার্জনা করেন।

সম্রাটের পুত্র, সে হিসাবে বিলাস ব্যসনেই যে উলুগবেগের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই কিন্তু এই বিলাস ব্যসন তাঁর জ্ঞানস্পৃহায় এতটুকু বাধা জন্মায় নাই। উলুগবেগ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। আর্টের প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। সমরকন্দকে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তাইমুরের অসফল স্বপ্ন তিনি সফল করে তোলেন। তাঁর আর্টজ্ঞানের পরিচয় হিসাবেই যেন সমরকন্দ গড়ে উঠে। তাঁরই উৎসাহে অতি উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট বহু খানকা, অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট মুকাততা (উলুগবেগের মস্‌জিদ), রঞ্জিত বহুমূল্য কাষ্টখণ্ড ও প্রস্তরে সুসজ্জিত শাহজিন্দের মস্‌জিদ ও বহু মাদ্রাসা নির্মিত হয়। এই সবগুলিই তাঁর কলা শিল্পের জ্ঞান বিঘোষিত করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষনের জন্য নির্মিত মানমন্দিরেও তাঁর আর্টের জ্ঞান সুপরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। শুধু এই মানমন্দিরের কারুকার্য দেখবার জন্যেই গওহার সাদ সমরকন্দ পরিভ্রমণ করেন। পিতার জীবদ্দশায় যখন উলুগবেগ তুর্কীস্থানের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন তখনই এই মানমন্দিরটি নির্মিত হয়। ৮২৩ হিজরীতে (১৪২০ খৃঃ অঃ) এর নির্মান কার্য সুরু হয়। কুহিকের অপর পারে পর্যবেক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধার মত জায়গায়ই এটি স্থাপিত হয়। এখন আর এর কোন চিহ্নই বর্তমান নাই তখন কিন্তু এ বিশ্বের বিস্ময় হিসাবেই শ্রদ্ধা পেত।

কিশোর বয়সেই উলুগবেগ সমস্ত কোরাণ শরীফ মুখস্ত করে হাফিজ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কোরাণ শরীফ অধ্যয়ন করবার বিভিন্ন সাতটি পদ্ধতিও আয়ত্ত করেন এবং সাতভাবেই অধ্যয়ন করতে পারতেন। এমনিতে বৈজ্ঞানিক হোলেও কাব্যও তাঁকে দোলা না দিয়ে ছাড়ে নাই। নিজে কবি না হোলেও কাব্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ খুব কম ছিল না। বিখ্যাত কবি খাজা ইসমত বোখারীকে তিনি রাজকবি হিসাবে নিযুক্ত করেন। এছাড়া বারান্দাক্, রুস্তম খুরইয়ানী, তাহির আবিওয়ার্দি প্রভৃতিকেও তিনি নানা ভাবে উৎসাহিত করেন। ইতিহাসে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত "উলসই আরবাই চেঙ্গিস" (The History of the four sons of Cingis) গ্রন্থে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এখানি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

এ সমস্তকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রই তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে বলা চলে। এতেই তিনি নিজেকে সর্বান্তকরনে নিয়োজিত করেন। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতিতে তাঁর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তিনিও সমরকন্দের মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজের ও সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণ ফল লিপিবদ্ধ করে একটি টেবল প্রস্তুত করেন। এই টেবল প্রণয়নের মূলেও রয়েছে টলেমির ভ্রম প্রমাদ।

উলুগবেগ ও তাঁর সহকর্মীদের পর্যবেক্ষন ফলের সঙ্গে টলেমির নির্ধারিত পরিমানের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে উলুগবেগ উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করে সহকর্মীদের সঙ্গে একটি টেবল প্রণয়ন করতে উদ্বুদ্ধ হন। এই টেবলটির নাম হোল "জিজ-ই-জাদিদই-সুলতানি"। টেবলটির মুখবন্ধে বৈজ্ঞানিক এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। জটিল ও দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারনাই এই উপক্রমনিকার বিশেষত্ব। এতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে (১) বিভিন্ন গণনা ও বর্ষ (Diverse computation and eras), (২) সময় জ্ঞান (The knowledge of time, (৩) নক্ষত্রের গতিপথ (The course of the stars), (৪) স্থির নক্ষত্রের অবস্থান (The position of the fixed stars) প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এই সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান কিরূপ উন্নত হয়েছিল এই টেবলই তার প্রকৃষ্ট প্রমান। টেবলটি প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্বত্রই বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। Ulugh Beg's Table নামে এ এখনও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এতে একদিকে যেমন পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের যত্নে সঞ্চিত নানা পর্যবেক্ষন ফল সন্নিবেশিত রয়েছে অন্যদিকে রয়েছে তেমনি উলুগবেগ ও তাঁর সহকর্মীদের পর্যবেক্ষিত নানা নব নব তথ্যাদি। এ যে বৈজ্ঞানিকদের নিকট অপূর্ব নৈবেদ্য হিসাবেই সমাদৃত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। এই টেবল প্রণয়ন করতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক উলুগবেগকে

সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সালাহউদ্দিন মুসা, মোল্লা আলাউদ্দিন আলকুশজী, গিয়াছউদ্দিন জামশিদ, মঈনউদ্দিন কাশানী, কাজীজাদা রুমী নামে পরিচিত হাসান সেলবি সমধিক প্রসিদ্ধ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক জন গ্রীভস টেবলটির প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে হাইড এর একখানি লাটিন অনুবাদ করেন—১৭৬৭ খৃঃ অব্দে শার্প (Sharpe) এই অনুবাদের অন্য এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৪৭-১৮৫৩ খৃঃ অব্দে সেডিলো এর উপক্রমনিকার অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং E. B. knobel এর নক্ষত্রের তালিকা প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয়পুর রাজ্যে মহারাজ জয়সিংহের উৎসাহে জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার এক নূতন প্রবাহ বয়ে যায় বলা চলে। মহারাজ জয়সিংহ উলুগবেগ প্রণীত নক্ষত্রতালিকার অনুবাদ করেন এবং সেগুলো সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণাও করেন।

মূল টেবলটি কি ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয় সে নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। আরবী, পারসী, তুর্কী এই তিন ভাষাই টেবলটির মূল ভাষা বলে দাবী উপস্থিত করে, তবে এখন পারসী ভাষাতে লিখিত টেবলটিরই শুধু সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের মতে উলুগবেগ টেবলে উল্লিখিত সমস্ত নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ কাজ করেন নাই। অনেকগুলির দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা টলেমির তালিকা থেকেই সংগৃহীত। এ সম্বন্ধেও অবশ্য বিশেষ-

মতভেদ দেখা যায়। শুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ হোলেও বৈজ্ঞানিক এতে জ্যোতিষ নিয়েও অনেক আলোচনা করেছেন। উলুগবেগের জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিভা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর পরেও প্রাচ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ হোলেও সেডিলোর মতে তাঁর সঙ্গেই প্রাচ্যের সত্যিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান শেষ হয়ে গেছে (with him the peirod of Astronomical work in the East finishes)।

এই টেবল প্রণয়নেই উলুগবেগের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকীয় বিলাস ব্যসন, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও স্থিরচিত্তে নিবিষ্টমনে দূর গ্রহনক্ষত্রের গতি বিধি পরীক্ষার জন্য নানারূপ যন্ত্রপাতি নিয়ে মানমন্দিরে যিনি রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারেন, পার্থিব কোন সমৃদ্ধির আশায় নয়—নিছক ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করতে তাঁর কথা মনে করলে মাথা আপনিই নত হয়ে আসে। পৃথিবীর ইতিহাসে নৃপতি রাজনীতি ছেড়ে বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন এক মুসলিম রাজত্ব ছাড়া অন্য কোথাও বোধ হয় এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। বিদ্যোৎসাহী হিসাবে অনেকেই অমর হয়ে রয়েছেন কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। অর্থ ও মৌখিক উৎসাহ জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় প্রেরণা যোগালেও সে প্রানবন্ত হয়ে উঠে তখনই যখন তার সঙ্গে থাকে প্রাণের যোগ। রাজকীয় অনুগ্রহ লাভের সঙ্গে যদি রাজার সঙ্গে সমান মর্যাদালাভের আশাও থাকে তা হোলে সে

সাধনায় কতখানি আগ্রহ জন্মে সে সহজেই অনুমেয়। উলুগবেগের বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদানও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তেমনি অনুপ্রেরণা যোগায় কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন নানা কারণেই প্রতিভার অভাব হয়ে পড়েছিল। যে ধংসের চাপ ধসে পড়ে তাকে আর কোন ভাবেই ঠেকান যায় না। তাই উলুগবেগের উৎসাহ, আদর্শ কোন কিছুই মুসলিমদের মধ্যে সত্যিকার কোন প্রতিভা জাগিয়ে তুলতে পারে নাই।

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানেই যে উলুগবেগের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা নয় জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতিও তাঁর অসামান্য দানে অলঙ্কৃত হয়ে রয়েছে। ত্রিকোণমিতির সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট প্রভৃতির আবিষ্কার এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার এর অনেক পূর্বেই বিজ্ঞানজগতে সুরু হয়েছিল মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভায় কিন্তু সাধারণভাবে এগুলোর তালিকা প্রণয়ন বোধ হয় কেউই করেন নাই। প্রায় সবই ছিল প্রক্ষিপ্তভাবে। উলুগবেগই সবগুলো সংগ্রহ করে এক তালিকাভুক্ত করেন সর্বসাধারণ বৈজ্ঞানিকদের সুবিধার জন্যে। এতে যে বিজ্ঞানের পথ কি ভাবে সুগম হয়ে উঠেছিল সে বলাই বাহুল্য। এই তালিকার মধ্যে উলুগবেগের নিজস্ব মৌলিকদানেরও অভাব নাই।

বিজ্ঞানে মনোনিবেশের জন্যই হয়ত তিনি রাজনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম প্রথম তেমন সফলতা লাভ করতে পারেন নাই। রাজনীতির কলুষিত আবহাওয়া, কুটিল চক্রজাল হয়ত তাঁকে তেমন উদ্বুদ্ধও করতে পারেন নাই—সেইজন্যে প্রথম প্রথম

তিনি এদিকে নিষ্ক্রিয় তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। এমনি নিষ্ক্রিয়ভাব অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই তিনি শীঘ্রই রাজনীতিতে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। ১৪৪৯ খৃঃ অব্দে ২৭ শে অক্টোবর ৫৬ বৎসর বয়সে, মোগলবংশের চির কলঙ্কের নিদর্শন হিসাবে উলুগবেগ তাঁর পুত্র আবদুল লতিফের প্ররোচনায় নিহত হন। নৃপতির মৃত্যুতে রাজ্যে হয়ত কিছু দিনের জন্য শোকের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতে যে শোকের ছায়া পড়েছিল তার অপনোদন হয় নাই অনেকদিন পর্যন্ত। মুসলিম বিজ্ঞান জগতে এ মৃত্যুতে যে বজ্রাঘাত হয়েছিল, তার অগ্নিদাহের জায়গায় আর কোন নবাঙ্কুশই গজায় নাই।

উলুগবেগের সহকারী হিসাবে কাজ করলেও নিজের স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভায় এই সময়কার বিজ্ঞান জগতে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আলকাশী। আলকাশীর পূর্ণ নাম হোল জামসিদ ইবনে মাসউদ ইবনে মোহাম্মদ গিয়াছউদ্দিন আলকাশী। আলিকুশী নামেও তিনি অনেক সময় পরিচিত। যতদূর জানা যায় আলকাশী, উলুগবেগের সহকারী হিসাবেই তাঁর মানমন্দিরে পর্যবেক্ষন কাজ সুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজ প্রতিভায় মানমন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনিই উলুগবেগের মানমন্দিরের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ। সম্রাটের টেবল প্রণয়নে সাহায্য করাই বোধ হয় তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তবে তাঁর প্রতিভা এই সহকারীর

কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে নাই। তিনি নিজেও স্বাধীন ভাবে অঙ্ক ও জ্যামিতিতে গবেষণা করেন। এই দুই বিষয়েই তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই। তাঁর অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে দশমিক ভগ্নাংশের সুষ্ঠু ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক ভগ্নাংশের মূল্য বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া অঙ্কশাস্ত্র পূর্বেকার কোটরগত অন্ধকার নিলয় ছেড়ে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় এসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু আলকাশীর পূর্বে অন্য কেউ দশমিক ভগ্নাংশ অঙ্কশাস্ত্রে ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর "আররিসালী আলমোহতিজি" (Treatise on the circumference) গ্রন্থে সর্বপ্রথম দশমিক ভগ্নাংশে সন্ধান পাওয়া যায় π এর মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে। তিনি ষোড়শ সংখ্যা পর্যন্ত এর মূল্য নির্ধারণ করেছেন: তাঁর নির্ণীত মূল্য হোল 3·1415926535898732.

আলকারখির মত আলকাশীও গুণনের এক সহজ নিয়ম প্রচলন করেন বীজগণিতের সাহায্য নিয়ে। অধুনা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একে লেখা যাবে :—

$$ab=(a+b-10)10-(a-10)(10-b)$$

যদি $a>10 b<10$

তিনি Summation of power series বা একই শক্তির ক্রমিক সংখ্যা রাশির যোগফল নির্ণয়ে আলকারখির পন্থাকে আরও উন্নত করে তোলেন।

বৈজ্ঞানিক সব সমেত কতগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় নাই। তবে এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচখানার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। (১) "জিজ আলখাকানী" (The Khakani Tables)—একে নাসিরউদ্দিনের টেবলের পরিপূরক বলা যেতে পারে। কনস্তান্তিনোপলের আয়াসোফিয়াতে এর একখানি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে।

আলকাশী

(২) "মিফতাহুল হিসাব" (Key to Arithmetics), বার্লিন, লাইডেন, ইণ্ডিয়া অফিস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতিতে এর পাণ্ডুলিপি বর্তমান। (৩) "আর রিসালা আলকামালিয়া সাল্লাম আসসামা" (The Ladder of the Heaven)—গ্রহ নক্ষত্রের পরিমাপ ও দূরত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। অক্সফোর্ড, লাইডেন, ও ইণ্ডিয়া অফিসে পাণ্ডুলিপি বর্তমান। (৪) "রিসালা ফি ইসতিখিরাজ জায়েব দারাজা ওয়াহিদা (An essay on the calculation of the sine of a degree). কায়রোতে এর একখানি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে। এতে তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের এক অভিনব সমাধান দেখতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রচলিত সমাধান পন্থা ছাড়া একটি অভিনব আনুমানিক প্রথায় (Process of approximation) সমীকরণের সমাধান করেছেন। এই সমাধান $x = \sin 1^\circ$ এর সমাধানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বলা চলে। সমাধান পদ্ধতিটি এখানে উধৃত করা গেল। সমীকরণটি হোল $x^3 + Q = Px$ ধরণের

. $x^3+Q=Px$ বা $x=(Q+x^3)\div P$

যদি $Q\div P=a+R\div P$ হয় তা হোলে 'a' হবে প্রথম approximate মূল্য। এ অনুসারে $Q=aP+R$

অতএব $x=a+(R+a^3)\div P=a+b+s\div p$.

তা হোলে $(a+b)$ দ্বিতীয় approximate মূল্য। এ অনুসারে

$R=bP+s-a^3$ এবং $Q=(a+b)\ P+s-a^3$

অতএব $x=a+b+[(s-a^3)+(a+b)^3]\div P=a+b+c+T\div P$

তা হোলে $a+b+c$ হবে তৃতীয় approximate মূল্য।

এই ভাবে এই সমাধান করা হয়েছে। সাধারণ ভাবে এর আঙ্কিক গণনা অনেক দূর প্রসারী। যদিও এটি প্রধানত $x=\sin 1^\circ$ সমাধানের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছিল তবুও এতে অন্যান্য সমস্যাও সুন্দর ভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

(৫) "আররিসালি আলমোহতিজি" (Treatise on the circumference)। বৈজ্ঞানিক তাঁর পুস্তকগুলি আরবীতে না লিখে মাতৃভাষা পারসীতেই লিপিবদ্ধ করেন। উলুগবেগের মৃত্যুর তের বৎসর পূর্বে ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

আলী ইবনে মোহাম্মদ আলকুশজী উলুগবেগের মানমন্দিরের অন্যতম বৈজ্ঞানিক। আলকুশজী অর্থ বাজপক্ষী বা শিকারী পক্ষী পালনকারী। বৈজ্ঞানিকের পিতা ছিলেন বাজপক্ষী পালক। এ থেকেই তাঁর নাম হয় আলকুশজী। বৈজ্ঞানিকও পিতার

উপাধিতেই ভূষিত হন। সম্রাটের অতি নগণ্য কর্মচারীর পুত্র, সম্রাটের সঙ্গে সমান আসনে বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন—মুসলিম জগতের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোথাও বোধ হয় এ সম্ভবপর হয় নাই।

আলকুশজী সমরকন্দে শিক্ষা লাভ করেন এবং উলুগবেগের মানমন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গুণ গরিমার কথা শুনে কেরমান নৃপতি আবু সাইদ গুরগাঁও তাঁকে কেরমানে আমন্ত্রণ করে পাঠান এবং উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। কেরমানে অবস্থান কালেই তিনি "তাজারিদোল কালাম" নামে নাসিরউদ্দিনের গ্রন্থের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কিছুদিন পরে আবার তিনি সমরকন্দে ফিরে যান এবং উলুগবেগের টেবলের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন। পুনর্বার আককুনলুর নৃপতি হাসানের অনুরোধে তিনি তেব্রিজে গমন করেন। হাসান তাঁকে একটি শান্তি প্রস্তাব দিয়ে দূত হিসাবে দ্বিতীয় সুলতান মোহাম্মদের নিকট প্রেরণ করেন। রাজনৈতিক কাজ নিয়ে গেলেও সুলতান মোহাম্মদ তাঁকে শুধু রাজনীতির কাজ দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি ইতিপূর্বেই সুলতানকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বৈজ্ঞানিককে রাজনীতি ত্যাগ করে বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হতে অনুরোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কনস্তান্তিনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার নিতে অনুরোধ জানান।

আলকুশজী

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানীমন নৃপতির এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে নাই। তিনি দৌত্য কার্য শেষ হবার পর পুনরায় কনস্তান্তিনোপলে ফিরে আসেন এবং আয়াসোফিয়ার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থগুলি আরবী পারসী উভয় ভাষাতেই লিখিত। ১৪৭৪ খৃঃ অব্দে আলকুশজী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুসলিম জগতের বিজ্ঞান চর্চার শেষ অঙ্কে মধ্যপ্রাচীর উলুগবেগ ও তাঁর সহকারী বৈজ্ঞানিকদের মত মিসরেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায়। কার্যকলাপের বিস্তার এবং হয়ত বা প্রতিভার দিক দিয়েও তাঁরা উলুগবেগ ও তাঁর সহকারীদের সমকক্ষ না হোলেও, বিজ্ঞানে তথা অঙ্কশাস্ত্রে তাঁদের দান খুব উপেক্ষণীয় নয়। এদের একজন হোলেন ইবনোল হাইম—অন্যব্যক্তি হোলেন ইবনোল মাজিদি। এঁরা দুইজনেই পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক।

ইবনোল হাইমের পূর্ণ নাম হোল আহম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ইমাদ আবুল আব্বাস শাহাবুদ্দীন। কায়রোতে ১৩৫২ খৃঃ অব্দে (কারুর কারুর মতে ১৩৫৫ খৃঃ অব্দে) এই বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; তাঁর কার্যাবলীর পরিচয়ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইবনোল হাইম

অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যে দুই একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় তিনি শুদ্ধ

অঙ্ক নিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। শুদ্ধ অঙ্ক সম্বন্ধেই তাঁর মৌলিক অবদানের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের কি অঙ্কশাস্ত্রের অন্য কোন বিভাগে তাঁর কোন দান আছে কিনা সে এখনও নিশ্চিন্ত ভাবে জানা যায় নাই। তাঁর মৃত্যু স্থান দেখে মনে হয় তাঁর সমগ্র জীবন মিসরে অতিবাহিত হতে পারে নাই। বোধ হয় শেষ জীবনে তিনি জেরুজালেমে গমন করেন। ১৪১২ খৃঃ অব্দে এইস্থানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইবনোল মাজিদির পূর্ণ নাম হোল আবুল আব্বাস আহম্মদ ইবনে রাজিব ইবনে তিবোগ শাহাবুদ্দিন। ১৩৬৯ খৃঃ অব্দে মিসরেই বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়। যতদূর জানা যায় তাঁর বিজ্ঞান সাধনা মিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং মিসরেই তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। ইবনোল হাইমের মত তাঁর অন্যত্র যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটে নাই। সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান সাধনায় ব্যয়িত হোলেও তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে অন্য কাউকেই তিনি সাধনার উত্তরাধিকারী করে যেতে পারেন নাই। ইবনোল মাজিদির পরে মিসরের ইতিহাসে অন্য কোন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

অঙ্কশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বিভাগেই ইবনোল মাজিদির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি অঙ্ক, পঞ্জিকা, নানা প্রকার টেবল প্রণয়ন—এ সমস্ততেই

তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ সবের মধ্যে

ইবনোল বাজিদি

ত্রিকোণমিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানই অবশ্য মৌলিক অবদানে সমুজ্জল হয়ে রয়েছে।

স্পেনের মুরদের দুর্ভাগ্যই সভ্যতার ইতিহাসে মুসলিম জগতের শেষ অঙ্ক রচনা করবার কারণ বলা যেতে পারে। মুরদের আত্মকলহ যখন মুসলিম রাজত্বের ধ্বংসের সোপান তৈরী করছিল, ইউরোপ তখন ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। যে ধর্মোন্মাদনা এতদিন ইউরোপকে অজ্ঞান বিভীষিকার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল মুরদের পতনের পর তারও পতন আরম্ভ হয়, ইউরোপের রিনাসাঁর সুরু হয়। ধর্মযাজকদের নৃশংস ব্যবহারও জ্ঞানবিজ্ঞানকে আর আটকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় নাই—বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণ দিয়েও বিজ্ঞানের দীপ শিখা জ্বালিয়ে তোলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর স্পেনের অমর কীর্তিমান বৈজ্ঞানিক হোলেন আলকালাসাদি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলকালাসাদি অন্যতম উচ্চ স্থান অধিকার করে রয়েছেন বিজ্ঞানের বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক অবদানে। তাঁকে বলা চলে স্পেনের সর্বশেষ মুসলিম বৈজ্ঞানিক। স্পেনের মুসলিম বিজ্ঞানচর্চাকে একটানা অব্যাহত গতির দ্যোতনা বলা চলে। এর প্রথম ভাগের ইতিহাস যেমন মৌলিকতায় ভরপুর এর শেষ অধ্যায়ও তেমনি। সেখানেও মৌলিকতার ব্যতিক্রম হয় নাই। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে এক আলকালাসাদি ব্যতীত

অন্য কোন প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের নাম করা যাবে না, তবুও স্পেনের এই শতাব্দীর বিজ্ঞানের ইতিহাস অন্য শতাব্দীর চেয়ে কিছুমাত্রও ম্লান নয়, বরং মৌলিকতার দিক থেকে চিরভাস্বর ও সমুজ্জ্বলই রয়েছে।

আলকালাসাদি

আলকালাসাদির পূর্ণ নাম হোল আবুল হাসান আলি ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলি আলকোরেশী আলবস্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সতেজ মধুর চরিত্রের জন্য তিনি আলকালাসাদি নামে সর্বসাধারণে পরিচিত ছিলেন। আলকালাসাদি অর্থ upright. গ্রানাডার নিকটবর্তী বাজায় তাঁর জন্ম হয় এবং ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে স্যুটারের (Suter) মতে তিউনিসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় হোল তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী। তিনি অঙ্ক বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। তবে এগুলির মধ্যে "Raising of the veil of the Science of gubar" ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে Theory of Numbers এবং Ascending Continued Fractions সম্বন্ধে তাঁর অবদানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। Theory of Numbers নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামালউদ্দিন ইবনে ইউনুস। তাঁর পরে আলকালাসাদির পূর্ব পর্যন্ত অন্য যাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা সাধারণত কতকগুলি বিশেষ ধরণের সমস্যার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলেন। ফলে কামাল

উদ্দিনের কাজের উপর এর আর অন্য কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই। আলকালাসাদি একে পুনর্জীবিত করে তোলেন। Continued Fractions এর বেলায়ও সেই কথাই বলা চলে। $\sqrt{a^2+b}$ এর বর্গমূল বের করা নিয়েই এই Continued Fractions এর আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর সমাধানের জন্য তিনি এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তাঁর সমাধান পন্থাটি বর্তমান প্রণালীতে দাঁড়াবে :—

$$(4a^3+3ab)/(4a^2+b)=(a+b)/\ (2a+b/2a)....$$

এই প্রসঙ্গে প্রথম মাত্রার সমীকরণের সমাধানের অন্যতম approximate উপায় "The method of scale"এর উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ প্রথম মাত্রা সমীকরণের সমাধানের চারিটি পন্থা নির্ধারণ করেন; "The method of scale" এর মধ্যে অন্যতম। Fink এর মতে এর প্রথম আবিষ্কার হয় ভারতবর্ষে এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নিকট থেকেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয় অবগত হন। Fink অবশ্য কোন বিশেষ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করেন নাই। যা হোক মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইবনোল বান্না এবং আলকালাসাদি এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। লাটিনে এই পন্থাটি Regula Falsoram এবং Regula Falsi নামে অনুদিত হয়েছে। এখানে একটি উদাহরণ উধৃত করা গেল :—

সমীকরণটি যেন $ax+b=o$

z_1 এবং z_2 যেন যে কোন ছুইটি সংখ্যা

যদি $az_1+b=y_1$ এবং $az_2+b=y_2$ হয় তা হোলে

$$x=\frac{z_2y_1-z_1y_2}{y_1-y_2}$$

ইবনোল বান্না নিম্নের চিত্রের সাহায্যে এর সমাধান করেছেন
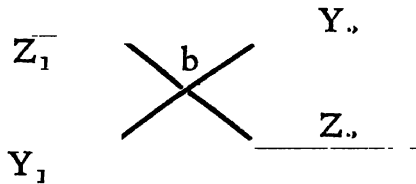
y যদি negative হয় তা হোলে এর জ্যামিতিক সমাধান একজোড়া স্কেলের আকার ধারণ করবে
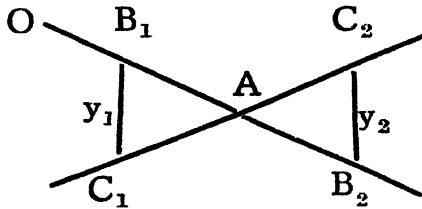
$OB_1=z_1$, $OB_2=z_2$, $B_1C_1=y_1$
$B_2C_2=y_2$ $OA=x$

এ থেকে অতি সহজেই $\frac{x-z_1}{x-z_2}=\frac{y_1}{y_2}$ পাওয়া যাবে অর্থাৎ

এতে উপস্থাপনের জন্য যে ভুল হবে প্রাপ্তফলেও সেই ভুলই হবে।

বর্তমানে বীজগণিতে যে সমস্ত চিহ্নাদি ব্যবহৃত হয় পূর্বে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রথম প্রথম শুধু বাক্য বিন্যাসের উপর নির্ভর করেই এর কাজ হত। এতে এক দিক দিয়ে সুবিধে হোলেও সংক্ষেপ করবার জন্যেই যার আমদানী সে সংক্ষেপ না হয়ে আরও বেড়েই চলছিল। অনেকের চোখেই এই অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে, তাই কেউ কেউ চিহ্নাদিও প্রবর্তন করেন কিন্তু কার্যত উন্নতি বিশেষ কিছুই হয় নাই। প্রধানত বৈজ্ঞানিকদের পরস্পর সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ আলোচনার অভাবে এগুলি সর্ববাদীসম্মত হয়ে উঠতে পারে নাই দ্বিতীয়ত মুদ্রন অভাবেএর প্রচারও বাধা পায়; ফলে এ বৈজ্ঞানিকের নিজস্ব পুথির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে রয়ে যায়। এমনি একক প্রচেষ্টার ফলেই অবশ্য চিহ্নাদি আস্তে আস্তে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে বলা যেতে পারে। বীজগণিতের আলোচনার ধারাকে Nesselman তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন (১) প্রথম শ্রেণী Rhetorical এতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই—সবই বাক্যে লিখিত হয়েছে (২) দ্বিতীয় শ্রেণী হোল Syncopated—এতে প্রথম শ্রেণীর মত সমস্তই বাক্যে লিখিত হোলেও, একই নিয়ম বা কাজ বারবার ব্যবহারের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত শব্দ (abbreviation) ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) তৃতীয় শ্রেণী হোল symbolic—এতে সমস্ত কিছুই চিহ্নাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচ্যের মুসলিম বীজগণিত প্রধানত

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পাশ্চাত্যের মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ এদিকে অনেক এগিয়ে গেছেন বলা যেতে পারে। আলকালাসাদি এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

যতদূর জানা যায় ইবনোল বান্নাও এ বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হন। বস্তুত ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই এমনি চিহ্নাদি ব্যবহৃত হতে থাকে। আলহাসসারের "Continued Fraction" এর আলোচনাতে এমনি চিহ্নাদির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইবনে খালদুনের মতে ইবনোল বান্না তাঁর পূর্ববর্তী অন্য দুই বৈজ্ঞানিক ইবনোল মুনিম এবং আলাহদাবের প্রভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি প্রমাণের জন্য চিহ্নাদি ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে পূর্বেকার গ্রন্থগুলির আলোচনা করেছেন এবং চিহ্নাদি কি ভাবে যুক্তি ও কারণ দর্শান ও দৃশ্য হিসাবেও কার্যকরী সেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর মতে এই চিহ্নাদি ব্যবহারের মধ্যে Theorem of Calculationএর ব্যাখ্যার সার এবং রহস্য নিহিত রয়েছে।" ইবনে খালদুনের এই মতবাদ থেকেই স্পষ্টই মনে হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ চিহ্নাদি ব্যবহার করে আসছিলেন। জিরার্ড দ্বাদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত গ্রন্থাদি আরবী থেকে লাটিনে অনুবাদ করেন তাতেও এই চিহ্নাদির ব্যবহার দেখা যায়।

বর্গমূল ইত্যাদি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে Radical sign ব্যবহার আলকালাসাদির অন্যতম অবদান বলা যেতে পারে। Square

root এর নির্দেশের জন্য তিনি অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত পূর্ণ "জিদর" শব্দ ব্যবহার না করে, শব্দটির প্রথম অক্ষর ج ব্যবহার করেছেন। যে সংখ্যার বর্গমূল বের করতে হবে এটি তার উপরে লিখিত হত, এবং দুইটির মধ্যে একটি লাইন টেনে দেওয়া হত। এই একই অক্ষর খুব সম্ভব "জাহালা" (unknown) শব্দের প্রথম অক্ষর হিসাবে Proportion এর অনির্দিষ্ট সংখ্যার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে শুধু সংখ্যাগুলির মধ্যে ∴ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। তবে বীজগণিতের অংশে তিনি Unknown quantity র জন্য ش ব্যবহার করেছেন কিন্তু Proportion অঙ্কের বেলায় ج ই ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া তিনি x^2 এর নির্দেশক হিসাবে ص এবং x^3 এর নির্দেশক হিসাবে ک ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক সাংকেতিক অক্ষরটি সহগ সংখ্যার (co-efficient) উপর লিখিত হত। যোগের চিহ্ন হিসাবে আলকালাসাদি কোন চিহ্ন ব্যবহার না করে শুধু সংখ্যাগুলি পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছেন। তবে বিয়োগ এবং 'সমান' এর চিহ্ন হিসাবে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বাখসালী যোগ এর জন্য "জ্য" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বীজগণিতে এমনি নূতন চিহ্নাদি প্রবর্তন ছাড়া শুদ্ধ অঙ্কেও তিনি কতকগুলি অভিনব পন্থা প্রবর্তন করেন। যোগ, বিয়োগ, গুণনে তাঁর নব পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এতে ফলগুলি সংখ্যার উপরে লিখিত হত

যেমন :—

193+45=238 এ প্রথায় লিখিত হবে

238

193
45

238−193=45

45

238
193

7×143=1001

1001

21
28
7

143
777

ভাগের বেলায় কিন্তু উপরে না লিখে নীচে লেখা হত

1001÷7=143

32
1001

777
143

পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মুসলিম বিজ্ঞান ইতিহাসের শেষ অধ্যায় রচিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে নাম করা যেতে পারে

এমন মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা অতীব নগণ্য। তবে অঙ্কশাস্ত্রে উৎসাহ অনেকেই দেখিয়েছেন। এই উৎসাহীদের একজন হোলেন সম্রাট আকবরের বিদ্বৎসভার সভ্য ফৈজী। কিন্তু তাঁদের বিজ্ঞানে কৃতিত্ব শুধু অনুবাদেই নিবদ্ধ। এই সময়কার মাত্র দুইজন বৈজ্ঞানিকের কার্যকলাপের মধ্যে বিজ্ঞান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের একজনের নাম হোল মোহাম্মদ ইবনে মারুফ ইবনে আহম্মদ, এবং অন্যজনের নাম হোল বাহাউদ্দিন।

মোহাম্মদ ইবনে মারুফ কনস্তান্তিনোপলের অধিবাসী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্যান্য মুসলিম রাজ্য নিস্তেজ হয়ে পড়লেও তুর্কী এই সময়ে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। সাধারণভাবে পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকেই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে বলা চলে তবে তুরস্ক ও ভারতবর্ষে এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়। কিন্তু দুইয়ের উন্নতির মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বকালে অন্যদিক দিয়ে বিশেষ উন্নতি হোলেও বিজ্ঞানের তেমন কোন চর্চাই এখানে হয় নাই, তুরস্কে কিন্তু অন্যান্যগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানও খাপ খাইয়ে গেছে। এর কারণ বোধ হয় পারিপার্শিক অবস্থা—আরব, পারস্য, মিসর ও স্পেনের মুসলিম রাজ্যের বিজ্ঞান চর্চার ঢেউ তুরস্ককেও দোলা না দিয়ে ছাড়ে নাই। পার্শের উন্নত রাজ্যের অবস্থা, তার কার্যকলাপ যে মধ্যেকার একটা রাজ্যকেও অনুপ্রাণিত করবে এ বিশেষ আশ্চর্যের

কিছুই নয়। ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যে যদি ধর্মের দোহাই দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাকে এতদিন গলা টিপে না রাখা হত, পারিপার্শিক উন্নত রাজ্যের প্রভাব যে তাদের মধ্যে বিশেষভাবেই কার্যকরী হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু ধর্মের উন্মাদনা এ সম্ভবপর হতে দেয় নাই, সে হিসাবে সমগ্রভাবে বিজ্ঞানচর্চা যে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে সে মনে করা অন্যায় হবে না। ষোড়শ শতাব্দীতে কনস্তান্তিনোপল ধীরে ধীরে পূর্বেকার বাগদাদের অনুকরণ করতে থাকে। এর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি রাশিয়ান ঐতিহাসিক Bartold এর বর্ণনাতেই পাওয়া যাবে। এখানে কিছু উধৃত করা গেল "It would be absurd to maintain that the Islamic world after the xvth century was plunged into barbarism and did not create any more products of cultural value. Turkey of the xvi—xviith centuries was famous not because of her military powers only. Constantinople became for the Mussalman world one of the most important cultural centres and for the number of Persian manuscripts preserved in its libraries it stands next only to St. Petersburg and London. Cultural work of the time was not limited to the study of the monuments of the past."

তুরস্কের এই কূর্মপন্থী উন্নতির প্রারম্ভে মোহাম্মদ ইবনে মারুফের অভ্যুদয়। তাঁর পূর্ণ নাম হোল মোহাম্মদ ইবনে মারুফ ইবনে আহম্মদ তাকিউদ্দিন। খুব সম্ভব ১৫২৫ খৃঃ অব্দে তাঁর জন্ম হয়।

নব্য তুরস্কের এই নব অভ্যুত্থানের সময় বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপ্রেরণা যোগান আলমারুফ তাঁর মৌলিক অবদানে।

আলমারুফ

অঙ্কশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বিভাগেই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তবে বীজগণিত, অঙ্ক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক সমুজ্জল। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে এই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়।

মধ্য প্রাচীর বিজ্ঞান আলোচনার শেষ রশ্মি হোল পারস্যের বৈজ্ঞানিক বাহাউদ্দিন। তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে মৌলিক

বাহাউদ্দিন

প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা দেখে মনে হয় তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সুলেখকও ছিলেন। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যাই অবশ্য সিংহভাগ অধিকার করেছে।

বাহাউদ্দিনের পূর্ণ নাম হোল বাহাউদ্দিন আলআমুলি মোহাম্মদ ইবনে হোসায়েন। "আলআমুলি" শব্দ থেকে মনে হয় কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্তী আলআমুল নগরী তাঁর জন্মস্থান। নিজামউদ্দিনের প্রণীত জীবনীতে কিন্তু বালবাক তাঁর জন্মস্থান বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে বাহাউদ্দিনের জন্ম হয় এবং ১৬২২ খৃঃ অব্দে ইস্পাহানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাহাউদ্দিনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে "খোলাসাতুল হিসাব" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতাতেই এর এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এতে মৌলিকতার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। "খোলাসাতুল হিসাব" ছাড়া অন্য যে গ্রন্থখানির সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম হোল "বহরুল হিসাব"। প্রাপ্ত গ্রন্থখানি অসমাপ্ত। বৈজ্ঞানিক সমাপ্ত করে যেতে পারলে এ যে অন্যতম উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক অবদান পূর্ণ গ্রন্থে পর্যবসিত হত তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই অসমাপ্ত কার্য থেকেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানি সমাপ্ত করার পূর্বেই বৈজ্ঞানিকের লোকান্তর ঘটে, বিজ্ঞান জগৎও তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বের সময় বিজ্ঞান আলোচনা চললেও মৌলিকতার দিক দিয়ে এ বোধ হয় বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। নৃপতির উৎসাহে বা স্বাধীনভাবে অনেকেই বিজ্ঞান আলোচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের আলোচনা অনেকটা পূর্বেকার চর্বিত চর্বণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। তাঁদের কাজের মধ্যে বিশেষ মৌলিক কোন কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই সময়কার একটা বিশেষত্ব অতি সহজেই চোখে ধরা পড়ে—সে হোল মুসলিম বাদশাহদের বিদ্যোৎসাহিতা।

বিদ্যোৎসাহী হিসাবে কোন বাদশাহই কম যান নাই। সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুরাগের জন্য অনেকেই বিখ্যাত।

বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আরঙ্গজেব, মোহাম্মদশাহ প্রায় সবার জীবনেই জ্ঞান সাধনা ও বিদ্যোৎসাহ অনেকটা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে বলা চলে। তবে হুমায়ুন ও শাহজাহান ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞান চর্চায় তেমন মনোযোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। বাবর ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর আত্মজীবনী এখনও সাহিত্য জগতে অমর হয়ে রয়েছে। তিনি যখনই রাজকার্য থেকে অবসর পেতেন তখনই সাহিত্য সাধনায় মন দিতেন। রাজকীয় লাইব্রেরী ছাড়া তাঁর নিজস্ব একটি লাইব্রেরী ছিল। শেরশাহ ছিলেন সাহিত্য ও দর্শনে অনুরক্ত। সম্রাট আকবর অশিক্ষিত হোলেও বিদ্যোৎসাহিতায় বোধ হয় সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁরই উৎসাহে তাঁর সভাসদ ফৈজী ভাস্করের লীলাবতীর অনুবাদ করেন। "জিজ-ই-উলুগবেগ" ও তাঁর উৎসাহে এই সময়ে আরবী থেকে সংস্কৃতে অনুদিত হয়। "আইন-ই-আকবরীর" পঁচিশ আইনে দেখা যায় তখনকার বিদ্যার্থীদের অঙ্ক, আঙ্কিক চিহ্ন, কৃষিবিদ্যা, পরিমিতি, জ্যামিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান, Physiognomy, গার্হস্থ্যবিদ্যা, রাজ্যশাসন আইন, চিকিৎসা, ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস এবং তাবিইই, রিয়াজিই ও ইলাহি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। [ইলাহি বিজ্ঞান,—ধর্মশাস্ত্র ও তদানুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়, রিয়াজি বিজ্ঞান—অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গান এবং মেকানিকস, তাবিই বিজ্ঞান—পদার্থ বিজ্ঞান ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।] এ শিক্ষা কোন স্তরের সে বলা মুস্কিল।

তবে মনে হয় এতে গবেষণা প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলবার মত বোধ হয় তেমন কিছু ছিল না।

জাহাঙ্গীরের বিদ্যোৎসাহিতাও কোন অংশে কম নয়। সৎগ্রন্থ সংগ্রহ ও পাঠের প্রতি তাঁর ছিল অতি বিরাট অনুরাগ। তিনি কোন কোন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য তিন হাজার মোহর বা প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত ব্যয় করেছেন। এই বিংশ শতাব্দীর অতি সুসভ্য জগতেও শুধু মাত্র একখানি গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য এমনি ব্যয় কুত্রাপি দেখা যায় না। আরঙ্গজেবের কার্যকলাপের মত বিদ্যোৎসাহিতাও তাঁর পূর্বপুরুষদের গতানুগতিক পথ ধরে চলে নাই। তিনি তাঁর নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর এ ব্যবস্থা যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়েছিল বার্ণিয়ারের অকুণ্ঠিত স্বীকারোক্তিতেই সে সুস্পষ্ট বোঝা যায় কিন্তু শুদ্ধ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ বোধ হয় তেমন সাহায্য করে নাই। সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষভাবে উৎসাহ দেখিয়েছেন হুমায়ুন ও শাহজাহান। হুমায়ুনের উৎসাহ শুধু পৃষ্ঠপোষকতাতেই ক্ষান্ত হয় নাই তিনি নিজেই বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায় সাধারণ বৈজ্ঞানিকের মতই যোগদান করেন।

শের শাহের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি যখন ইরাক এবং পারস্যের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখনও তাঁর বিজ্ঞান

অনুরাগ একটুও কমে নাই। ইলিয়াস আদবেলী এবং আবুল কাসিম গিরজানীর নিকট তখন তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করছিলেন। কুতুবউদ্দিন শিরাজীর বিশ্বকোষ "তুররাতোত তাজ" এই সময়ে তাঁর বিশেষ পাঠ্য ছিল বলে "আকবর নামা" এবং "মাআাসরোর রাহিমিতে" উল্লেখ দেখা যায়। "আকবর নামায়" এই সময়কার অন্য একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হুমায়ুন তাঁর ভ্রাম্যমান অবস্থায় তেব্রিজে উপনীত হন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর ভৃত্য পিক মোহাম্মদ আখতাবেগকে একটা "কোরা" (গ্লোব) আনয়ন করতে আদেশ দেন। পারসীতে 'কোরার' অন্য অর্থ ঘোড়া। বুদ্ধিমান ভৃত্য কতকগুলি ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির করে।

হুমায়ুনের জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনুরাগের উল্লেখ তৎকালীন প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। মোল্লা বাদায়ুনী "মুনতাখাবাত তাওয়ারিখে" বাদশাহের জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে হুমায়ুন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ইলিয়াস আর্দবেলীর নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্বান ছিলেন। ফিরিস্তার মতে তিনি ছিলেন অঙ্ক শাস্ত্রে অতীব পারদর্শী। সব সময়েই তিনি পণ্ডিত এবং বিদ্বানগণের সংস্পর্শে থাকতেন এবং তাঁদের সঙ্গে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। "মিরাতুল মামালিকে"ও হুমায়ুনের জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রীতির উল্লেখ দেখতে

পাওয়া যায়। বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগকে নিজ দরবারে পাবার জন্য তাঁর কিরূপ আগ্রহ ছিল সে সম্বন্ধে গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তাঁর রাজত্বকালে তুর্কী নৌ সেনাপতি কবি বৈজ্ঞানিক সাইয়দ আলি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সুলতান সোলায়মান খান গুজরাট থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করবার জন্য এই সেনাপতিকে নৌবহর দিয়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন নাই। পরাজিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষ, পারস্য, ইরাকের পথে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করেন। হুমায়ুন তাঁর বৈজ্ঞানিক খ্যাতিতে পূর্ব থেকেই মুগ্ধ ছিলেন তাই তিনি সেনাপতিকে একটি উপযুক্ত পদ নিয়ে ভারতেই থাকতে অনুরোধ করেন কিন্তু সাইয়দ আলি রাজী হন নাই। এমনিতে অন্য কোন উপায় না পেয়ে বাদশাহ এক চাতুরী অবলম্বন করেন। বৈজ্ঞানিককে জানিয়ে দেন যে বৃষ্টির জন্য তাঁর যাবার পথ একেবারে বন্ধ তাই তাঁকে অন্তত তিন মাস দিল্লীতে থাকতেই হবে। তবে এই তিন মাস সময় তিনি এমনি না কাটিয়ে দিয়ে সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে যেন গণনা ও গবেষণা করেন। সাইয়দ আলি অন্যান্য জ্যোতির্বিদদের সঙ্গে কাজ করা সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হুমায়ুনের মৃত্যু পর্যন্ত ভারতে থেকে যেতে বাধ্য হন।

হুমায়ুনের রাজকার্যও ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী। দরবারের সমস্ত কাজ জ্যোতিষী মতানুসারে সময় বিভাগ করে পরিচালিত হত। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর দরবারের

পটমণ্ডপগুলিও এমনভাবে তৈরী করিয়েছিলেন যে গ্রীক বিজ্ঞানের নয়টি আকাশ এবং বিভিন্ন নক্ষত্রগুলি তাতে সুন্দর ভাবে প্রকটিত হত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এই অসাধারণ প্রীতি এমনি নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি একটি "বিসাতি-ই-নিশাত" (Carpet of mirth) তৈরী করান। এতে সমস্ত celestial circles এবং spherical elements সুন্দরভাবে প্রকটিত হত। প্রথমটি ছিল সম্পূর্ণ সাদা নিষ্কলঙ্ক আকাশের প্রতীক, দ্বিতীয়টি নীল, তৃতীয়টি শনির প্রতীক হিসাবে কাল, চতুর্থটি বৃহস্পতির প্রতীক হিসাবে চন্দন রংএর, পঞ্চমটি মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে লাল রংএর, ষষ্ঠটি সূর্যের প্রতীক হিসাবে স্বর্ণবর্ণের, সপ্তমটি শুক্রের প্রতীক হিসাবে সবুজ বর্ণের, অষ্টমটি বুধের প্রতীক হিসাবে ঈষৎ নীল এবং নবমটি চন্দ্রের মত সাদা। নবম বৃত্তের পরে ছিল চারিটি মৌলিক পদার্থের বৃত্ত, তা ছাড়া Terrestrial গ্লোবে সাতটি দেশের ম্যাপও দেওয়া ছিল। শুধু এই নয় প্রত্যেক দিন দরবার গৃহের রংও বদলান হত। জ্যোতির্বিদদের গণনানুযায়ী যে দিন যে নক্ষত্র উদিত হত, সেই দিন সেই অনুযায়ী দরবার গৃহের রং করা হত। এ ছাড়া তিনি বারটি রাশি প্রকটিত করে একটি পটমণ্ডপও তৈরী করান।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে চর্চার জন্য তিনি কয়েক জায়গায় কয়েকটি মানমন্দির তৈরী করবার মনস্থ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি যন্ত্রপাতিও তৈরী করান। এ সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে আস্তারলব অন্যতম। হুমায়ুনের অঙ্কশাস্ত্রও জ্যোতির্বিজ্ঞানের

যন্ত্রপাতির প্রতি এই অসাধারণ প্রীতিকে উপলক্ষ করে তাঁর বন্ধু সেনাপতি বাইরামখান খানান একটি কাসিদা তৈরী করেন। এতে আস্তারলব সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। হুমায়ুন অনেক সময় অন্যান্য বিদ্যার্থীকেও জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই প্রসঙ্গে সিন্ধের সুফীহুনের জায়গীরদার মোল্লা নুরউ'দ্দিন তুরখান সুফীদিনির নাম করা যেতে পারে। নুরউদ্দিনও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং হুমায়ুনের প্রিয় শিষ্য ও বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যু দুর্ঘটনাও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রীতির সঙ্গে বিজড়িত। তিনি নামাজের আজান শুনে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামবার কালে পা পিছলিয়ে পড়ে মারা যান—এ ঐতিহাসিক সত্য। তবে "আকবর নামা" এবং "মাআসিরির রাহিমির" বর্ণনা মতে এর পিছনে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ অনুরাগ। শেরশাহ দিল্লীতে একটি সুউচ্চ তিনতলা বাড়ী তৈরী করেন। সর্বোচ্চটিতে একটি উচ্চ বুরূজ ছিল। হুমায়ুন এটিকে লাইব্রেরী ও মানমন্দিরে পরিণত করেন। এই দুর্ঘটনার রাত্রিতে শুক্রগ্রহ পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হবে বলে বাদশাহ ও তাঁর জ্যোতির্বিদদের ধারণা ছিল। বাদশাহ সন্ধ্যার পূর্ব থেকেই জ্যোতির্বিদদের সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। যখন এমনি আলোচনায় মন তাঁর ভরপুর, তখনই আসে নামাজের আহ্বান। ধার্মিক বাদশাহ নামাজের আহ্বানে সাড়া দিতে যেয়ে, জ্যোতির্বিজ্ঞান চিন্তায় অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি

দিয়ে নামতে পদস্খলনে আহত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নামাজ দুইই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যতদূর জানা যায় হুমায়ুনের সময় থেকেই ভারতে আস্তারলব প্রণয়ন প্রবর্তিত হয়। পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি নিজে এক নব ধরণের আস্তারলব আবিষ্কার করেন। এটি "আস্তারলবী হুমায়ুনী" বা হুমায়ুনের আস্তারলব নামে পরিচিত হয়ে পড়ে।

হুমায়ুনের অনুপ্রেরণায় এই সময়ে যন্ত্রকুশলীদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি নির্মানে উৎসাহের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। এই সময়কার এমনি দুইজন যন্ত্রকুশলীর সন্ধান পাওয়া যায়। একজনের নাম হোল মওলানা মকসুদ হিরারী অন্যজন হোলেন শেখ আল্লাহদাদ। আইন-ই-আকবরী অনুসারে মকসুদ হিরারী ছিলেন হুমায়ুনের শিষ্য বা ভক্ত এবং তিনি এমন সুন্দর আস্তারলব ও গ্লোব তৈরী করতেন যে অতি নিপুন বৈজ্ঞানিকও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারতেন না। তিনি খুব সম্ভব সম্রাটের বেতনভোগী বা অন্য ভাবে অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন।

শেখ আল্লাহদাদ হুমায়ুনের দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিনা ঠিক জানা যায় না তবে তিনিই বোধ হয় সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রকুশলী। তিনি যে নিজেই শুধু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তা নয় তাঁর অধস্তন চার পুরুষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের এই শাখায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত। শেখ আল্লাহদাদ, তাঁর পুত্র মোহাম্মদ ইসা, পৌত্র মোহাম্মদ বাইরাম এবং প্রপৌত্র

জিয়াউদ্দিন সবাই ছিলেন যন্ত্রকুশলী। এঁদের যন্ত্রকুশলী প্রতিভা জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির দিকেই বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সবাই আস্তারলব প্রণয়নে অতীব দক্ষ ছিলেন। এই আস্তারলবগুলি "হুমায়ুনী আস্তারলব" অনুযায়ী নির্মিত হয়। এই বংশের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রণীত কতকগুলি আস্তারলব ও গ্লোবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানে সেগুলির পরিচয় দেওয়া গেল। (১) নাদওয়া লাইব্রেরীতে একটি আস্তারলব রক্ষিত আছে। এর পৃষ্ঠের বর্ণনা নিম্নরূপ—জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে কাইয়ুম মোহাম্মদ ইবনে মোল্লা ইসা ইবনে শেখ আল্লাহদাদ হুমায়ুনী আস্তারলবী লাহোরী কর্তৃক ১০৫৯ হিজরীতে নির্মিত। (২) নওয়াব সার সালার জঙ্গ বাহাদুরের লাইব্রেরীতে শেখ আল্লাহদাদের একটি আস্তারলব রক্ষিত আছে। এটির পৃষ্ঠের বর্ণনা হোল—ওস্তাদ আল্লাহদাদ আস্তারলবী লাহোরী কর্তৃক ৯৭৫ হিজরীতে নির্মিত। (৩) কলিকাতায় কাজী ওবায়েদুল বারীর নিকট কাইয়ুম মোহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত একটি আস্তারলব রক্ষিত আছে। এটি ১০৩৪ হিজরীতে নির্মিত হয়, এর পৃষ্ঠের বর্ণনা—কাইয়ুম মোহাম্মদ ইবনে আল্লাহদাদ আস্তারলবী হুমায়ুনী কর্তৃক ১০৩৪ হিজরীতে নির্মিত (৪) বাঁকীপুর ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্লোব রক্ষিত আছে। এর পৃষ্ঠের বর্ণনা থেকে জানা যায় এটি কাইয়ুম মোহাম্মদ ইবনে ইসা ইবনে আল্লাহদাদ আস্তারলবী লাহোরী হুমায়ুনী কর্তৃক ১০৪৭ হিজরীতে নির্মিত। গ্লোবটি বিশুদ্ধ কাঁসার তৈরী।

এতে প্রতীক হিসাবে নক্ষত্রের স্থানে রৌপ্য পেরেক দেওয়া রয়েছে এবং সমস্ত রাশিগুলিও (Zodiac sign) দেখান হয়েছে। (৫) পাটনার মৌলবী ইউসুফ সাহেবের নিকট একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্লোব রক্ষিত আছে। এটিও শুদ্ধ কাঁসার তৈরী এবং এতেও নক্ষত্রের প্রতীক হিসাবে রৌপ্য পেরেক ব্যবহৃত হয়েছে। এর ওজন প্রায় সোয়া পাউণ্ড। এর পৃষ্ঠদেশের বর্ণনা থেকে জানা যায় এটি জিয়াউদ্দিন কর্তৃক ১০৫৯ হিজরীতে নির্মিত। খুব সম্ভব এইটিই জিয়াউদ্দিনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্লোব। (৬) নওয়াব সর্দার ইয়ারজঙ্গ মওলানা হবিবর রহমান খান শেরওয়ানীর লাইব্রেরীতে জিয়াউদ্দিনের একটি আস্তারলব রক্ষিত আছে। এটি ১০৬৪ হিজরীতে নির্মিত হয়। (৭) ১০৬৪ হিজরীতে জিয়াউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত একটি গ্লোব রামপুরের জনৈক ডাক্তারের নিকট পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে এটি আলিগড় তিব্বিয়া কলেজে রক্ষিত আছে। (৮) বার্লিন মিউজিয়ামে জিয়াউদ্দিনের একটি আস্তারলব রক্ষিত আছে ; এটি ১০৭২ হিজরীতে নির্মিত। এ ছাড়া জিয়াউদ্দিনের আরও চারটি আস্তারলবের সন্ধান পাওয়া যায়। এ চারটিই ১০৭৪ হিজরীতে নির্মিত হয়। এর একটি আছে (৯) আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক মওলানা আবুবকরের নিকট। দ্বিতীয়টি রয়েছে (১০) রামপুর অফিসিয়াল লাইব্রেরীতে (১১) তৃতীয়টি ১৯৩১ খৃঃ অব্দে লণ্ডনে Persian Art Exhibitionএ প্রদর্শিত হয় (১২) চতুর্থটি রয়েছে বাঁকীপুর

লাইব্রেরীতে। এ ছাড়া এই বংশের আরও ছুইটি আস্তারলবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এ ছুটি রয়েছে চিকাগো Alder Planetarium & Astronomical Museum এর ডিরেক্টর Dr. Philip Foxএর নিকট। ছুইটিই কাঁসার তৈরী। একটির ব্যাসার্ধ হোল ১২ সেন্টিমিটার আর একটির হোল ১১·০৭ সেন্টিমিটার। প্রথমটি ইসা কর্তৃক ১০১৩ হিজরীতে নির্মিত হয় দ্বিতীয়টি জিয়াউদ্দিন কর্তৃক ১০৫৭ হিজরীতে নির্মিত। গানথার (Gunther) তাঁর Astrolobes of the World (Oxford, 1932) গ্রন্থে এই বংশের আরও কয়েকটি আস্তারলবের সন্ধান দিয়েছেন।

শাহজাহানের সময়ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ ভাটা পড়ে নাই বলে মনে হয়। তিনি নিজে হুমায়ুনের মত এতে যোগ দিয়েছিলেন কি না জানা যায় না তবে এতে যে তাঁর পুরা মাত্রায় উৎসাহ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিনি নিজেই উৎসাহী হয়ে কিম্বা বৈজ্ঞানিকদের অনুপ্রেরণায় মারাঘার মানমন্দির ও তার পরিচালনা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করবার জন্যে মোল্লা মোহাম্মদকে মারাঘায় প্রেরণ করেন। মোল্লা মোহাম্মদ অসাধারণ ক্লেশ স্বীকার করে মারাঘায় গমন করেন এবং সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে এসে সেই অনুযায়ী একটি পরিকল্পনাও উত্থাপিত করেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজই হয় নাই। মানমন্দির নির্মানের জন্য যে অর্থ নির্ধারিত ছিল তাজমহল নির্মাণেই

তা ব্যয়িত হয়। ফলে বিজ্ঞান চর্চার আর বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

শাহজাহানের সাক্ষাৎ অনুগ্রহভাজন গণিতবিদ হিসাবে মোল্লা ফরিদ ইবরাহমের নাম করা যেতে পারে। ফরিদ ছিলেন রাজজ্যোতিষী। তিনি "জিজ-ই-শাহজাহানী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময়কার অন্যতম গণিতবিদ হোলেন আহম্মদ। আহম্মদ কিন্তু তৎকালে গণিতবিদ হিসাবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, তাজমহলের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই বেশী পরিচিত ছিলেন। এই ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানই হয়ত তাঁকে গণিতের দিকেও আকৃষ্ট করে। তাই তাজমহলের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্টের কাজের মধ্যেও তিনি গণিতের প্রতি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত করতেন। তাঁর পুত্র লুৎফ উল্লাহর গ্রন্থে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। মোল্লা ফরিদ ইবরাহমও তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নে আহম্মদের অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১০৫৯ হিজরীতে আহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শেখ আল্লাহদাদের মত আহম্মদের পুত্র পৌত্রাদিও পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন বিজ্ঞান আলোচনায়। বংশ পরম্পরায় এমনি একই বিষয়ে মনোনিবেশ বিশেষ বিস্ময়কর। আল্লাহদাদের বংশধরেরা আস্তারলব নির্মানে সিদ্ধহস্ত হন—পুরুষানুক্রমে তাঁরা অস্তারলব নির্মানের দিকে মনোনিবেশ করেন আহম্মদের পুত্র ও বংশধরেরাও তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত

আলোচনায় লিপ্ত হন। আহম্মদের তিনপুত্র—তাঁদের নাম যথাক্রমে আতাউল্লাহ রুশদী, লুৎফউল্লাহ এবং নুরউল্লাহ। বনিমুসা ভ্রাতৃত্রয়ের মত এই তিন ভ্রাতাও ইঞ্জিনিয়ারিং ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তিন ভ্রাতাই পেশায় ছিলেন পিতার মত ইঞ্জিনিয়ার।

আতাউল্লাহ শাহজাহানের দরবারের সভ্য ছিলেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি আলমগীরের সময়েও রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আলমগীরের পত্নী দিলরাস বাণু বেগম রাবিয়া দুররাণীর মৃত্যুর পর আতাউল্লাহ আরঙ্গাবাদে তাঁর সমাধি সৌধ নির্মান করেন। এটি তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত হয়। অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর দুইখান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানির নাম "পাঞ্জগিণত" (On Algebra) অন্যখানির নাম হোল "খুলাসাহীরাজ" (A summary of Arithmetic)। প্রথম গ্রন্থখানির দুইখান পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এর একখানা রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অন্যখানা হায়দারাবাদের সাইইদিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। গ্রন্থখানি ভাস্করাচার্যের লীলাবতীর পারসী অনুবাদ। ভূমিকা থেকে জানা যায় গ্রন্থখানি শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রণীত হয়। ভূমিকা এখানে উধৃত করা গেল "১০৪৬ হিজরী—শাহজাহানের রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে আহম্মদ নাদিরের পুত্র আতাউল্লাহ রুশদী কর্তৃক বীজগণিত গ্রন্থখানি রচিত। এখানি আসলে ভাস্করাচার্যের লীলাবতীর

পারসী অনুবাদ। অঙ্ক সম্বন্ধে এ একখানি সুন্দর পুস্তক। সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ উদাহরণ ও অন্যান্য যে সমস্ত গোপনতথ্য হিন্দী পুস্তকে রয়েছে সমস্তই পারসীতে অনুবাদ করা হয়েছে অন্যান্য আরবী ও পারসী পুস্তকে এমন পাওয়া যায় নাই। আমি খোদার নিকট আবুল মোজাফফর শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ কিরান-ই-সানি শাহজাহান বাদশাহ গাজীর জন্য প্রার্থনা করে এর ভূমিকা সুরু করছি।"

অন্য গ্রন্থখানি কাব্যে লিখিত এবং দারাহ শিকোহকে উৎসর্গীত। এই উৎসর্গ থেকে মনে হয় এ বংশ দারাহ শিকোহর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এর ভূমিকাতে খোদা, তাঁর রসুল, শাহজাহান ও দারা শিকোহর প্রশংসা রয়েছে। এখানিও খুব সম্ভব শাহজাহানের রাজত্বকালেই লিখিত হয়।

লুৎফউল্লাহও ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার খ্যাতির জন্য তিনি সাধারণত মোহান্দিস নামে পরিচিত ছিলেন। এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাঁরও অনেকগুলি অঙ্কশাস্ত্রীয় গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত হোল "খুলাসাতোল হিসাব"। এখানি বাহাউদ্দিন আমালির অঙ্কশাস্ত্রীয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ভাষ্য। এর ভূমিকাতেই গ্রন্থকার গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়েছেন "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতালার। লাহোরের স্থপতি (মাইমার) ওস্তাদ আহম্মদের পুত্র, মোহান্দিস (Engineer) নামে

অভিহিত বিনীত লুৎফউল্লাহ অঙ্ক, বিজ্ঞান ও সংখ্যার আকার সম্বন্ধে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। খোদা তার কাজকে দোয়া করুন। গ্রন্থখানি শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ বিন হাসান আমালির অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য। এখানির নাম রাখা হোল "খুলাসায়ে মুনতাস্‌হিব" বা আমালির মুনতাসহিবের খুলাসা। নামটি অবশ্য আরবী বর্ণমালার সংখ্যাক্রমিক হিসাবে গ্রন্থ প্রণয়নের তারিখও প্রকাশ করবে—তারিখ হোল ১০৯২ হিজরী"।

লুৎফউল্লাহর অন্য গ্রন্থখানার নাম হোল "রিসালাই খাওয়াসি আদাদ" বা "আরিসমাতিকি"। এখানি ইবনে সিনার গ্রন্থের অনুকরণে প্রণীত। এর দুইখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একখানি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অন্যখানি হায়দারাবাদের সাইইদিয়া লাইব্রেরীতে। এছাড়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবদুর রহমান সুফীর "সুয়ারী সুফীর"ও তিনি পারসী অনুবাদ করেন। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় তিনি তাঁর পিতা আহম্মদের উপদেশ অনুসারেই এই অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন। গ্রন্থখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে। এতে গ্রহ নক্ষত্রাদি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করে দেখান হয়েছে।

অঙ্কশাস্ত্রের গ্রন্থ ছাড়া লুৎফউল্লাহর আরও দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। একখানি হোল পারসী কবিদের জীবনী সংগ্রহ "তাজকিরাই দৌলতশাহী সমরকন্দীর" সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গ্রন্থখানি কাব্যে লিখিত—নাম হোল "আসমানি সুখান"। অন্য

গ্রন্থখানির নাম হোল "সিহরী হালাল" (Lawful Magic)। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব হোল—এ বিন্দুওয়ালা অক্ষর বর্জিত। গ্রন্থকার ভাষার উপর অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তির নিদর্শন হিসাবেই যে এরূপ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এখানি ১০৭০ হিজরী (১৬৬০ খৃঃ অব্দ) মোহাররম মাসে প্রণীত হয়।

লুৎফউল্লাহ কবি এবং Calligrapher হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থখানির নাম হোল "দিওয়ান"। লুৎফউল্লাহর গ্রন্থাদি থেকে মনে হয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুরউল্লাহও অন্য দুই ভ্রাতার মত বিদ্বান ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তবে এ পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

লুৎফউল্লাহ পুত্রেরাও পিতা ও পিতৃব্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর এক পুত্রের নাম মওলানা ইমামউদ্দিন। তিনি সাধারণত "ইমামুর রিয়াজি" (Leader in Mathematics) নামে অভিহিত হতেন। তিনি একাধারে কবি ও বৈজ্ঞানিক। তাঁর উপদেশ অনুসারে তাঁর এক ছাত্র আলমাজেষ্টের একখানি ভাষ্য রচনা করেন।

লুৎফউল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র আবুল খয়ের মির্জা খয়েরউল্লাহ পিতার মতই অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জন্য পিতার মত মোহান্দিস নামে অভিহিত হতেন। তাঁর কার্যাবলী থেকে মনে হয় মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালের প্রথম ভাগেই তিনি বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বৃন্দাবন খুসগো প্রণীত "সফিনাহি

খুসগো" গ্রন্থে ইমামউদ্দিন রিয়াজির প্রসঙ্গে খয়েরউল্লাহর কথাও উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে খয়েরউল্লাহ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতিতে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী এবং সেইজন্যে অম্বরের (বর্তমান জয়পুর) অধিপতি রাজাধিরাজ জয়সিংহ সাওয়াই তাঁর মানমন্দির নির্মান করতে খয়েরউল্লাহর পরামর্শ নেন।

আবুল খয়ের খয়ের উল্লাহ নাসিরউদ্দিন তুসীর "তাহরিরে উকলিদাস" গ্রন্থখানি আরবী থেকে পারসীতে অনুবাদ করেন। অনুদিত গ্রন্থখানির নাম হোল "তাকরিরোত তাহরির"। তুসীর অন্য গ্রন্থ "তাহরিরে মাজিস্তির"ও তিনি "তাকরিবোত তাহরির" নামে অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তুসীর আস্তারলব সম্বন্ধে একখানি ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর পিতৃব্য আতাউল্লাহ রুশদীর পাঞ্জগণতেরও একখানি ভাষ্য লেখেন। কাব্যের প্রতিও তাঁর বেশ অনুরাগ ছিল বলে মনে হয়। তিনি পূর্বেকার পারসী কবিদের কাব্য নিয়ে "সিকান্দারনামা" নামে একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

আবুল খয়ের খয়ের উল্লাহ

খয়েরউল্লাহর এক পুত্র মোহাম্মদ আলিও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনিও রিয়াজ (Mathematician) নামে অভিহিত হতেন। মোহাম্মদ আলি পিতার অসমাপ্ত কার্য "তাকরিরোত তাহরির" পুন সম্পাদন করেন এবং একটি ভূমিকা সংযোগ করে দেন। এই ভূমিকা থেকে মনে হয় তিনি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে থাকবেন।

মোগল বংশের শেষ সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়েই জয়পুর অধিপতি তৎকালে আগ্রা ও মালবের সুবেদার জয়সিংহ শাহজাহানের সময়কার পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে দিল্লী, বেনারস, মথুরা, উজ্জয়ন ও জয়পুর এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটি মানমন্দির তৈরী করান। তাঁরই উৎসাহে "জিজ-ই-মোহাম্মদশাহী" নামক একখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থও ঐ সময় লিখিত ও প্রকাশিত হয়। জয়সিংহ জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছিলেন অতীব অনুরাগী। মোহাম্মদশাহ তাঁর অনুরাগকে আরও উৎসাহ দেন। তাঁরই আদেশে জয়সিংহের তত্বাবধানে দিল্লীর মানমন্দির তৈরী হয়। খুব সম্ভব নাজমউদ্দিন এই মানমন্দিরটি তৈরী করেন।

এর পরে মুসলিম জগতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব পর্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায় কোন মুসলিম বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এ পর্যন্ত যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় এখনও আসে নাই।

বিজ্ঞানজগতের মুসলিম গৌরবসূর্য পঞ্চদশ শতাব্দীতেই অস্ত যায় অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার পিছনে রেখে। এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে তারার ঝিকিমিকি আলো দেখা গেলেও স্থায়ী কোন রেখাপাত হয় নাই। আবার সূর্য উঠি উঠি করছে—কতদিনে উঠবে কে জানে ?

সমাপ্ত

সূচী—বর্ণানুক্রমে